যক্ষিণী

যক্ষিণী

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০ ০০৯

শ্রীপ্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পূজনীয়েষু

শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী

শ্রীচরণকমলেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই—

বহুরূপে দেবতা তুমি
তান্ত্রিকসাধনা ও তন্ত্রকাহিনী
সম্মোহন
অশরীরী
অবিশ্বাস্য
সে আসে
আবার আমি
জন্মান্তর রহস্য
আজও যা ঘটে
অজানার আঙিনায়
জীবনের ওপার থেকে
নীলসায়রে
কে ডাকে আমায়
সে কি এলো ফিরে
অচিন পরশ
সীমান্তের সুর
যোগীনী (আসন্ন প্রকাশ)

মানুষের চাওয়া-পাওয়ার শেষ নেই যেমন, তেমনি অভিজ্ঞতারও বুঝি বা শেষ নেই। আমার সন্ন্যাসজীবনে, পরিব্রাজক অবস্থায় নানা সাধক-সাধিকার জীবন এসে উপস্থিত হয়েছে সামনে। কত রোমাঞ্চকর ঘটনা কত গোপনসাধনার বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ ধ্যানধারণা। এঁরা সাধনরাজ্যের এক একজন সোনার খনি হীরের খনি। এমন খনির সন্ধান পেয়েছি আমি যক্ষিণীর মধ্যেও। কামাখ্যা-তিব্বতের সাধনা ক্রিয়াকলাপ মানুষের কাছে অজানা, কিন্তু অফুরন্ত। এসব সাধনায় মানুষ নিজেকে যেমন জয় করতে পারে, তেমনি অন্যকেও জয় করতে পারে। সাধনা সমাজের মঙ্গলের জন্যে—সমাজ ছাড়া নয় মানুষ ছাড়া নয়, সংসার ছাড়া নয়। বিজ্ঞানভিত্তিক মনস্তাত্ত্বিক সাধনায় মানুষ নিজে যেমন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি অন্যকেও পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হয়। এই হয়ে ওঠা আর অন্যকে সক্ষম করে তোলার সংযোগই মিলনযোগ—মহাযোগ। মহাযোগে মানুষ মানুষের কাছে, সমাজের কাছে বিবেক আনন্দ শান্তি। আর অন্ধকার রাজ্যের আলো। তাই বুঝি শিবসংহিতা বলেছেন, নিজের দেহের ভেতরের দুর্দান্ত মনকে আগে জানো, শান্ত করো, অপরের সান্ত্বনা হয়ে ওঠো। তুমি শান্ত হলে অন্যকে শান্ত করার ক্ষমতা, জয় করার ক্ষমতা, সান্ত্বনা দেবার ক্ষমতা তোমাব আসবে, তুমি যোগী হবে।—জানাতি যঃ সর্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়ঃ। আমার শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকার কাছে কামাখ্যা-তিব্বতের গোপন-সাধনার বিষয় এ-বইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পরিবেশন করেছি।

কেবল চড়াই আর চড়াই।

বরফঠাণ্ডা হাওয়া বইছে ফুর-ফুর করে, তবু ঘাম ঝরছে আমার সারা অঙ্গ বেয়ে। সময় সময় মনে হচ্ছে পা দুটো অসাড়—আমার নয়। কিন্তু এমনই জায়গায় এসে পড়েছি, চলতে আমায় হবেই। গন্তব্যস্থলে না পৌঁছুতে পারলে, এখানে জমে গিয়ে মৃত্যু অনিবার্য।

যেদিকে তাকাচ্ছি—কোথাও একটা বসতির চিহ্ন বলে কিছু নেই। জনমানবশূন্য জায়গা। অনেকক্ষণ ধরে একা-একা চলেছি, চলছিও, একটা গরুবাছুর অবধি নজরে পড়ছে না। নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করছি বড্ড। যে-কোন একটা জন্তু-জানোয়ার পশু-পক্ষী বা একটা মানুষ না দেখলে আমি নিষ্প্রাণ হয়ে যাব বুঝি।

খাড়াই ভেঙে ভেঙে, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। চীরগাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, পাহাড়ের গায়ে সরুপথ ধরে সন্তর্পণে এগুচ্ছি। একবিন্দু জল কোথাও নেই। পথ ভুল করিনি তো? বার বার প্রশ্ন জাগছে মনে। নিজের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। মণিমহেশ তো স্বপ্নকথা—ভরমুরেও পৌঁছুতে পারব না হয়তো।

এই একটি রাস্তা ছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা আর খুঁজে পাচ্ছি না যে, সেটা ধরি। নিদারুণ অসহায় অবস্থা আমার। এখন চলা বন্ধ। আমি দাঁড়িয়ে চুপচাপ। পথ ভুল করি আর যাই করি—উপস্থিত জলের জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আকণ্ঠ পিপাসা—ওষ্ঠাগত প্রাণ যাকে বলে।

সামনের দিকে একভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার দৃষ্টি কেমন ঝাপসা হয়ে এলো। ঝাপসা-ঝাপসা একটা কিছু দেখছি যেন। ছায়া-

ছায়া একটা বস্তু। অনেক দূর থেকে খুব আস্তে-আস্তে ভেসে আসছে—বেশ খানিক জায়গা জুড়ে জলের ঢেউয়ে।

মাথাটা বিগড়লো নাকি! মরুভূমিতেই পিপাসা-কাতর মানুষ এরকম দৃশ্য দেখে—মরীচিকা। বরফঢাকা পাহাড়ের দেশে এ দৃশ্য কেন? অবিশ্যি শোনা যায়, পাহাড়ের দেশেও অমন ঘটনা ঘটে, যেটা পাবার আশা নেই, যেটা না পেয়ে মানুষ ক্লান্ত—হতাশায় ভেঙে পড়ছে, সেই সব ছবি দেখে পাহাড়ের গায়ে ফুটে উঠতে। মিথ্যে স্বপ্ন দেখা জেগে জেগে।

মনে মনে খুব সতর্ক হয়ে উঠেছি আমি। আর এক পা-ও এগুবো না। বরাতে যা-আছে হোক। এগুলে মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে তাড়াতাড়ি। আশ্চর্য, আমায় এগুতে হল না, দৃশ্যটাই এগিয়ে আসছে ক্রমে আমার চোখে। একেবারে সামনা-সামনি হতে আরো একটু বাকি। যে বস্তুটাকে এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, দেখলাম, একটি সাদা ধবধবে তুষারজমা প্রতিমা। ভারী সুন্দর লাগছে।

একজন সুমুখে এসে দাঁড়াতে, আমি অবাক। মাঝবয়সী স্ত্রীলোক। জলভর্তি মাটির কলসী কাঁখে। একগাল হেসে, কলসী নামাল। মাটির গেলাসে জল ঢেলে, আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি জল নেব কি—কেমন সম্মোহিত হয়ে গেছি। হতভম্ব হতবাক। যা ঘটছে —সত্যি না মিথ্যে?

স্ত্রীলোকের ডাকে সংবিৎ ফিরে পেলুম।—জলটায় গলা ভিজিয়ে নাও আগে বাবা, তারপর ভেবো যা দেখছ, সত্যি কিনা!

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। জল খেলুম বুকের ভেতরটা ভিজিয়ে-ভিজিয়ে। তবু বিস্ময় গেল না আমার। আমার দেশের ভাষায় কথা বলল, কে এ? যেখানে পুরুষের আসতে ভয়, জলবিহনে প্রাণান্ত হবার ব্যাপার, সেখানে স্ত্রীলোক! এই নিরালা-নির্জনে! আমার মনের সংশয় শুনতে পেয়েছি আমি ওর কণ্ঠস্বরে। শুনেছি আমি স্পষ্ট বাইরের কানে। মনের ভুলে মনের কানে নয়।

কে এ? আগেকার দিনে যা শোনা যেত—কেউ বিশ্বাস করত,

কেউ করত না—সেই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কি সত্যি রূপ এটা? একালে-এযুগেও কি ঘটে? দেবদেবীরা আছেন তাহলে! নিছক কল্পনা নয়। ভক্তের অভাব-অভিযোগ ব্যথা বুঝে সশরীরে আসেন। তার দুঃখ-কষ্ট মোচন করেন স্নেহ-মমতা উজাড় করে দিয়ে।

স্ত্রীলোকটির কথা শুনলুম আবার আমি।—আমি কোন দেব-দেবী নই বাবা, সাধারণ মানুষ।

ভাবার সঙ্গে-সঙ্গে যে মনের কথা বলে দিতে পারে, তার উত্তরও দিতে পারে—হোক মানুষ - কিন্তু সাধারণ নয়, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। স্ত্রীলোকটির সম্বন্ধে জানার কৌতূহল আমার বেড়ে উঠল। কেন এখানে, কিসের প্রয়োজন হয়েছিল—প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, করা আর হল না।

ওর নিজের মুখ থেকেই শুনলুম।—কেন এখানে, কিসের প্রয়োজন? সে অনেক কথা। এমনিতেই তোমার অনেক দেরী হয়ে গেছে। এগোও, আমি একটু এগিয়ে দিচ্ছি। এইটাই ঠিক রাস্তা।

এগুচ্ছি দুজনে। মনে প্রশ্নের তোলপাড়। জানতে পারলুম না তো কোন কথা?

স্ত্রীলোকটি হেসে উঠল।

—আজকের মতন সেদিন হাসতে পারিনি বাবা আমি! আমার হাসি বন্ধ, কথা বন্ধ, স্বাধীন চিন্তা করাও বন্ধ। কিচ্ছু করার উপায় ছিল না। কেবল কড়া চোখের শাসন আর কর্কশ গলার দাবড়ানি। পীড়নে-পীড়নে আমি আর আমাতে ছিলুম না। আমার সকল সত্ত্বা হারিয়ে ফেলেছিলুম।

পঙ্কিলপথে নামতে হয়েছে। নেমেই চলেছি দিনের পর দিন। পথের শেষ কোথায়, ভেবে কোন কিনারা পাইনি। বন্ধ দরজায় মাথা কুটে-কুটে রক্তগঙ্গা বয়েছে। ফল হয়নি কিছু। যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকেছি। একলা ঘরে চিৎকার করে পাগলের মতন ডেকেছি, কেউ কি নেই? আমাকে মুক্তি দিতে পারে না কেউ? এই জাহান্নমের মহল থেকে উদ্ধার করতে পারে না কি কেউ?

কেউ শুনতে পায়নি। না পেয়েছে দেবতা, না পেয়েছে মানুষজন। দেয়ালভর্তি ছবি—দেব-দেবীর হলেও সে তো শুধু ছবিই। মুখ নাড়েনি, কথা কয়নি, সান্ত্বনার বাণী শোনায়নি। শোনা যায় ওরা মুশকিল আসান। এক-একটি দেবতার ছবি। আমার বেলায় ওরা নিষ্ক্রিয়। হয়তো ডাকার মতন ডাকতে পারিনি তখন, তাই ডাক শুনে সাড়া দেয়নি কেউ।

ছ'বির ঠাকুরের কথাই বা বলব কেন—নিজের প্রত্যক্ষ দেবতা জ্যান্ত দেবতা—তিনিই বা আমার কি করলেন ? আমার অন্যায় কর্মের মুলে তিনিই একমাত্র মানুষ, যিনি প্রধান। ছোটবেলা থেকে—মন যখন থেকে তৈরী হতে শুরু করেছে, আমার মা প্রতিমুহূর্তে আদেশ করেছে এমন কথা বলে-বলে, যা আমার মনের গহনে বদ্ধমুল সংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। সংস্কারের শক্তি এত প্রবল, সেখানে দুনিয়া তুচ্ছ।

বড় হবার সঙ্গে-সঙ্গে আমি একটি আস্ত সংস্কারের মানুষ হয়ে গড়ে উঠলুম। বিয়ের আগেই পতিপরমগুরু হয়ে বসেছিল হৃদয়ে, পরে তো ধ্যানে জ্ঞানে শয়নে স্বপনে জাগরণে জপমালা হয়ে উঠল। কোনদিন কখনো কোন দোষই চোখে পড়েনি। গুণই পড়েছে কেবল।

ন'বছরে সিঁথিতে সিঁদুর টানলেন উনি। পনেরোয় সৌরভ এলো কোলে। আঠারোয় মৌরীগ্রামের সর্বস্ব খুইয়ে—ভিটেমাটি পর্যন্ত—কলকাতায় যেতে হল স্বামীর হাত ধরে। যেখানে এনে তুললেন, ভাড়া বাড়ি। নড়বড়ে, বহুদিনের জীর্ণদশা।

দু'বছরের ভাড়া বাকি পড়ায় সে-বাড়ি থেকেও বিদেয় নিতে হল অপমান-লাঞ্ছনা সয়ে। সবেতেই উনি নির্বিকার—একটি জিনিস ছাড়া। সেটা ঘোড়ার স্বপ্ন দেখা। প্রথম-প্রথম বুঝতে পারিনি, কিসে সর্বস্বান্ত হলুম আমরা। পরে বুঝেছি, ঘোড়ার ছবি ছাপা বই বুকে নিয়ে, ঘোড়ার পেটেই সমস্ত পুরেছেন উনি। বলব না বলব না করেও বলেছি, ছেলেটার মুখ চেয়ে একটু হুঁশিয়ার হও না। হুঁশ থাকলে তো হুঁশিয়ার হবে। কানে কথা ঢোকেনি। যে-কে সে-ই।

নিজের কথা বলতে আমার মুখে বাধে। বস্তীতে থাকার সময় পোড়া পেটের জন্য দাসীবৃত্তিও করতে হয়েছে। একদিন মনিববাড়ি এমন কাণ্ড ঘটল যে, মনে হল, ধরিত্রী তুমি দ্বিধাবিভক্ত হও, সীতার মতন পাতালে প্রবেশ করে ভবজ্বালা জুড়োই।

সকলের এঁটোপাতের ভাত বাইরে জঞ্জালের গাদায় না ফেলে, আঁচল ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে নিয়ে আসছিলুম সৌরভের জন্য। পাঁচে পড়েছে, খিদেও বেড়েছে। বিকেলে এমন খাই-খাই যে, ও-ও যত কাঁদে, আমিও তত কাঁদি। এই ভাতে বিকেলের পেটের জ্বালাটা ঠাণ্ডা হবে তবু ওর। তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরুতে গিয়ে উঠোনের শ্যাওলায় পা হড়কালো। হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলুম। হেনস্থা তো ছিল ভালো, চাকরিটা যেতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে।

স্বামী অভয় দিলেন, কোন ভয় নেই। প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হবার পথ খুঁজে পেয়েছেন—শুধু একটি সাধনা। বই পড়ে আর এক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে সব জেনে-দেখে এসেছেন। এ-সাধনায় রাশি-রাশি টাকা উড়ে এসে ঘর বোঝাই করে ফেলবে।

হ্যাঁ, রাশি-রাশি টাকা এসেছে। তার জন্য মিথ্যের বেসাতি মাথায় নিয়ে প্রতিরাতে এক-একটি লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে আমায়। প্রথমে সাধনা আরম্ভ হল যখন, ভয়ে কারো সামনে যেতে পা কেঁপেছে। উনি বলেছেন, ভয় কি? ওরা ভার্যারূপে চাইবে তোমায়—এটা সাধনার অঙ্গ। তুমি বলবে, আমি যক্ষিণী মনোহারিণী এসেছি। ধনসম্পত্তি দেব, তোমার স্ত্রী হয়ে কাছে আসব রোজ রাতে।

আমি শিউরে উঠেছি, কানে হাতচাপা দিয়েছি। উনি বলেছেন, আমি সঙ্গে থাকবো। তোমার কোন অঙ্গ স্পর্শ করবে না কেউ। সুরার সমুদ্রে ডুবে ওরা অচেতন থাকবে। ধুনুচির ধোঁয়ায় পাতলা কুয়াশায় এপারের তোমাকে মনে করবে কাছে। তারপর তোমাকে সরিয়ে নিয়ে আসব ঘরে।

সাতটা ধুনুচির ধোঁয়ায় যখন কুয়াশা নামত পাশের ঘরে, তখন

উনি এসে আমায় নিয়ে যেতেন। আমি দেখতুম, গোল হয়ে বসে অনেক তরুণ-বৃদ্ধ। ওরা সমস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে, ওঁ হ্রীঁ গচ্ছাগচ্ছ যক্ষিণী মনোহারিণী ওঁ হ্রৌঁ স্বাহা। ওদের কাছে গিয়ে উনি সুরা ঢালছেন মড়ার খুলিতে। এক-একজনের মুখের কাছে তুলে ধরছেন। ওরা গিলছে ঢক ঢক করে। যতক্ষণ না ওরা অচৈতন্য হয়ে পড়ছে, ততক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন উনি বিধকে অমৃত বলে।

বলছেন, তোমাদের কাছে এসে গেছে মনোহারিণী যক্ষিণী। ওরা একজন একজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। জড়ানো কথায় 'পেয়েছি-পেয়েছি' বলে চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ছে যে যার আসনে।

ঘরে এসে দড়াম করে দারজায় খিল বন্ধ করেছি। লাল চেলীর শাড়িটা শতবিছের হুল হয়ে ফুটেছে সারা দেহে। খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। মা-কালীর ছবির পায়ে মাথা খুঁড়ে কেঁদে বলেছি, সর্বনাশী, আমায় খাবার বেলায় চোখের মাথা খেয়ে বসে আছিস। প্রবঞ্চনার পাপের বোঝা চাপছে মাথায়—দেখতে পাচ্ছিস না?

কেঁদে কেঁদে দু'চোখ ফুলে উঠেছে আমার। কেউ মোছায় নি।

একদিন মরিয়া হয়ে উঠলুম আমি। চক্রে যক্ষিণী সেজে যাব না কিছুতেই। নতুন যে যুবকটি এসেছে, ওর মুখখানা অনেকটা সৌরভের আদল। দেখলেই বুকের ভেতর মোচড় দেয়। সদ্য ফুলের মতন ফোটা ছেলেটার জীবন নষ্ট করতে বসেছেন উনি। কারণবারি খাওয়ানো শেখাচ্ছেন। ওই জ্বলন্ত গলা আগুন পেটে পড়তে থাকলে কদিন বাঁচবে ও।

এ ব্যবসায় চিরদিনের মতন ছেদ টানতে চাইলুম আমি। পুজোর খাঁড়াটাই একমাত্র শান্তি দিতে পারে আমায়। রাত্তিরে ওঘরে যাবার আগেই জীবনের শেষ অধ্যায় শেষ করে ফেলব।

খাঁড়াটা হাতে করে তুলেছি সবে, সৌরভের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম, শুনলুম মা-মা ডাক, শুনলুম আকুল কান্না। হাতের খাঁড়া খসে পড়ে গেল মেঝেয়। মায়ের ছবির সামনে নিজেকে বলি দেওয়া আর হল না। ওসময় সৌরভ অঘোরে ঘুমোয়। কেমন করে জেগে

উঠল ওদিন, জানি না।

উনি দরজায় ধাক্কা মেরে-মেরে খিল খোলালেন আমায়। শরীরটা অল্প-অল্প কাঁপছে। আমি টলতে-টলতে বেরিয়ে এলুম। দালানে আয়নার সামনে আসতেই থমকালুম, আমার জায়গায় আমাকে দেখছি না, দেখছি ছবির কালী দাঁড়িয়ে। উনি হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন ওঘরে।

আমি কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি। কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। কে ডাকছে আমায়। বলছে, চলে আয়, চলে আয়। ছবির কালী কি? হবেও বা। আমি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছি। সকলের ডাক শুনছি। স্বামীর, সৌরভের, চক্রের মানুষদের। স্বামী ডাকছে, তুষারকণা। সৌরভ ডাকছে, মা, ও-মা। চক্রের লোকেরা ডাকছে মনোহারিণী যক্ষিণী। সব ডাক ছাপিয়ে আমার কানে বেজে উঠছে —'চলে আয়' ডাক।

সে-সময় আমার মধ্যে কে কি দেখেছে জানি না। কেউ সাহস করে আমায় আটকাতে কাছে আসে নি।

এরপর নানা জায়গায় ঘুরেছি আমি।

ক্যামাখ্যার কথাই বলি। ভীষণ দর্শন লোকের কি ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর। আমাকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দেবার উপক্রম।

মাঝরাত হলেই ওই একটা স্বর কানে এসে ভেসেছে আমার। ঘুম ভেঙেছে তখুনি। তন্দ্রার ঘোর ছুটে গেছে দু'চোখের দৃষ্টি থেকে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছি আমি বিছানায়। হাল্কা চৌকিটা মচমচ শব্দ তুলে নড়ে উঠেছে। এই মচমচ শব্দেও ওই মানুষের স্বর। একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেছি। এ-আকর্ষণ রোধা আমার পক্ষে অসম্ভব। মনে হয়েছে, এক লাফে চৌকি থেকে লাফিয়ে পড়ে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে যাই দৌড়ে, বাইরে।

মনে পড়ে সেই বীভৎস দর্শন মানুষকে। ঠোঁটের বাইরে দাঁত, ঘোলাটে লাল দু'চোখ। চোখের কোণে কালো কালি ঢালা, দু'পাশের গালের হাড় বিচ্ছিরি রকমের উঁচু, কপাল-মাথা তিন কোণা। মাথা বেয়ে পিঠ বেয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে খয়েরী রঙের বিশাল জটা। ধূসর দাড়ি-গোঁফ, পরনে স্রেফ একটা কৌপিন। নীরস কণ্ঠস্বরে প্রথম কথা বলেছিল যখন, বাজ পড়ারই আওয়াজ শুনেছিলুম আমি। নিজেকে একটু সংযমে রাখার চেষ্টা করেছিলুম। সামলে নেবার প্রয়াসে বোধহয় কিছু দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। তা না হলে ওই বিদ্‌ঘুটে সূর্পনখ নামের লোকটা আকাশ-বাতাস কাঁপানো অমন অট্টহাসি হেসে উঠল কেন?

বলল, আমার নাম ধরেই, হঠাৎ অত ভয় পেয়ে গেলি কেন? কান্তা আর পূর্ণা এরা তো তোকে আর বলি দিতে নিয়ে আসেনি এখানে। কি দেখে ভয় পেলি? আমাকে দেখে, না এই খাঁড়ায় মাখানো রক্ত দেখে? চুপ করে রইলি কেন?

মুহূর্তে আমার স্থানত্যাগ করতে ইচ্ছে করছে। জায়গাটা মোটে ভাল লাগছে না। চতুর্দিকে খোলামেলা, আকাশের নীচে বসে আছি পাহাড়ের ওপরে। তবুও ভাল লাগছে না আমার। জঙ্গল পেরিয়ে এসেছি যখন, তখনও মনটা বেশ অস্থির ছিল। তখন বেলা ছিল, সূর্য ডোবার মুখোমুখি, তবুও জায়গাটায় ঘন ছমছমে ভাব জেঁকে বসেছে। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। মনে হয়েছিল, মানুষের রাজ্য থেকে সত্যি সত্যি কোন প্রেতপুরীর অন্দর-মহলে প্রবেশ করছি বুঝি-বা।

কান্তা-পূর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। ওরা নির্বিকার। এপাহাড়ে মানুষ যে আসে না একদম তা নয়। আসে তো অনেকেই।

অনেকেই কেন, যারা এখানে আছে, তারা প্রায় সকলেই। ভুবনেশ্বরী পাহাড়। দিনের আলোয় পাহাড়ের চুড়ো থেকে শহরের ঘর-বাড়ির দৃশ্য যেন পর-পর ছবি আঁকা। ব্রহ্মপুত্রের ওপর উমানন্দ ভৈরবের মন্দিরের কি সুন্দর দৃশ্য। মন ভরে যায়, ফিরে আসতে ইচ্ছে করে না।

এরকম একদিন আমার হয়েছিল।

তীর্থনাথ আমাকে সঙ্গে করে এনেছিলেন এই সব দৃশ্য দেখাতে। সেদিনও ছিল পূর্ণা-কান্তা। সূর্য ডোবার আগে ওরা ফিরে যাবে। আমায় অনেক ডাকাডাকি করে ভাবের ঘোর কাটিয়েছে বাপ আর দুই মেয়ে—তিনজনে মিলে। শোনা যায়, যতক্ষণ না আমার দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছে পূর্ণা, ততক্ষণ আত্মহারা হয়েই ছিলুম। দৃশ্য দেখতে-দেখতে দৃশ্য ভুলে ছিলুম। ভুলে ছিলুম নিজেকে।

তীর্থনাথ আমাকে সেদিন আগের চেয়েও আবার নতুন করে কি দেখলেন। আমার মধ্যে আবার নতুন করে কি আবিষ্কার করলেন, তিনিই জানেন। তাঁর দিকে তাকাতেই আমি দেখেছি তাঁর যুগল দৃষ্টি আমার মুখের ওপর স্থির হয়ে রয়েছে। এতটুকু চঞ্চল নয়।

পূর্ণা তো আমার ধ্যান ভাঙালো, কান্তা বাবার। বাবার হাত ধরে টানাটানি করে তুলেছে ও, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছে। পূর্ণার চোখে কৌতুকের হাসি উপ্‌চে পড়েছে, কান্তার ঠোঁটের ফাঁকে। মনের ভাব চেপে না রাখতে পেরে পূর্ণা বলেই ফেলল, তুষারকণাদির না হয় উমানন্দ ভৈরবের মন্দির দেখে ওই দশা হয়েছিল। তোমার এ যে অদ্ভুত ব্যাপার। তুষারকণাদিকে দেখে—

দুই বোনে হেসে লুটিয়ে পড়েছিল পাহাড়-মাটিতে। তীর্থনাথ মুখ খোলেনি একদম। আরও গম্ভীর হয়ে গেছে। আমি নিজেকে খুব বিব্রত বোধ করেছি। ওদের বিদ্রূপবাণে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। পূর্ণা বলছে, তুষারকণাদি, তুমি ভাই সেনাপতি হিসেবে আমাদের সবার আগে এগিয়ে চল। আমরা তোমার পেছু-পেছু যাই। কান্তা একটা কৃত্রিম বুক ভাঙা নিশ্বাস ফেলে বলছে,

হ্যাঁ ভাই, পূর্ণাদি ঠিকই বলেছে। তোমার চোখে চোখ পড়লে, বাবার মতন অবস্থা হলেই তো গেছি।

একটু জোরেই বলে উঠল, বাবা, তুমি কিন্তু সবার পেছনে-পেছনে এসো। তুষারকণাদির মুখ দেখতে পাবে না তাহলে আর। আহা, মা এলে আজ বড় মজাই হত। যাক, বাড়ি গিয়ে মাকে সব বলব' খন। মা একটা মস্ত জিনিস দেখার সুযোগ হারাল।

কামাখ্যায় যে মন নিয়ে তীর্থনাথদের সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছি আমি, সে মন যেন হঠাৎ করে এক অচেনা জগতে এসে পড়েছিল ওদের দু'বোনের আচার-ব্যবহারে। কিন্তু মনে কোন ভয় ধরেনি, মন ভেঙে পড়েনি। কোন অস্বস্তি অসুস্থ করে তোলেনি। আজ যেমন হচ্ছে। পাহাড় পাল্টায়নি, সেই পাহাড় সেই জায়গা। শুধু পাল্টেছে পরিবেশ আর এই পরিবেশের কেন্দ্রমণি একটা মানুষ। সূর্পনখ।

—কই, কোন কথার উত্তর দিলিনা তুষারকণা? ভেতরের কথা জানার কি অভদ্র উদ্ধত আচরণ-প্রশ্ন সূর্পনখের।

আচমকা একটু আগের সমস্ত স্নায়ু শিথিল হওয়া ভাবটা কেটে গেল আমার। আগের মতোই ক্ষয়বয়হীন শক্তির জোয়ার বয়ে যেতে লাগল ভেতরে। আমি উঠে দাঁড়ালুম। গলার উত্তেজনা মুখ ঠেলে বেরিয়ে এলো স্পষ্ট ভাষায়। বললুম, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। আজ আমার আসা আপনাকেই প্রশ্ন করতে। কেন আপনার এত ইচ্ছে আমাকে দেখার? কান্তাকে দিয়ে পূর্ণাকে দিয়ে কেন বারে বারে ডেকে পাঠান আমায়? কি উদ্দেশ্য?

আগুনে ঘি পড়ে দপ করে জ্বলে উঠল যেন। রাগে অগ্নিশর্মা সূর্পনখ! ঘোলাটে-লাল চোখের তারায় ধারাল রক্তমাখা খাঁড়াটা নেচে উঠল যেন।

গর্জে উঠল সূর্পনখ, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার মুখের সামনে আজ পর্যন্ত এমন ভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে সাহস করেনি কেউ। তোর এত দম্ভ কিসের, তীর্থনাথের জন্য? দেখা

যাবে তীর্থনাথ কি ভাবে বাঁচায়। কেন ডাকি, কেন আসতে বলি নিজেই বুঝতে পারবি একদিন। যখন বুঝবি, তখন দেখবি তোর জিভ অসাড় হয়ে গেছে। বাকরোধ হয়ে যাবে তোর। সেসময় প্রাণে বেঁচে থাকবি কিনা সন্দেহ।

সেদিন ভুবনেশ্বরী পাহাড় থেকে ভয়ে নয়, বিষণ্ণ মনে নেমে এসেছিলুম আমি। মানুষকে প্রশ্ন করারও তো একটা ধারা আছে। সেটা অভব্য-অভদ্র ব্যবহার নয়। ভয় ধরে ভালো না লাগে, যাব না। আমায় তো ধরে-বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না সূর্পনখ। কিছু না বলেও তো চলে আসতে পারতুম। উত্তেজনা-মুহূর্তে অপ্রীতিকর ব্যাওার ঘটান একেবারেই যুক্তিসঙ্গত হয়নি।

পাহাড় থেকে ফিরে আসার পর একা ঘরে চুপচাপ বসে আছি। মনটা ভালো নয়। তীর্থনাথ এসে দাঁড়ালেন। বললেন, মুখখানা শুকনো কেন? কি এত ভাবছ?

আমি সব কথাই খুলে বললুম। উনি বললেন, কিছু ভেব না। কাপালিকদের ভদ্র-অভদ্র কোন জ্ঞানের বালাই নেই। চতুর্দিকে চনমন করে চাইলেন একবার। ঘরটার তাকের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর কিছু না বলে-কয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

একটু পরেই ফিরে এসেছেন আবার। হাতে একখানা বই—মৈত্রী উপনিষদ। পাতা খুলে লাইনটা পড়ে শোনালেন। কাপালিকদের সম্বন্ধে কি বলেছে শোন। সাধনা বলতে কিছুই জানে না ওরা। নিজের আত্মসুখের জন্য পাগল। কামনা মেটাবার জন্য মতিভ্রষ্ট। নির্বাণ মুক্তি মোক্ষ কিছুই মানে না ওরা। যে যেমন তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করাই ধর্ম। যা করেছ ঠিক করেছ। আপসোস-অনুশোচনার কোন প্রয়োজন দেখি না। পড়। ··তস্করাঃ অস্বর্গ্যাঃ ইতি। ·ওদের ব্যবসা ভোজবাজী দেখিয়ে পয়সা কামানো, লোকের অনিষ্ট করা, অনিষ্ট চিন্তা। যাকে বলে, প্রকাশ্যে চৌর্যবৃত্তি।

তীর্থনাথের কথা আমি মনে প্রাণে মেনে নিয়েছি। কিন্তু সেই থেকে রাতের ঘুমে ব্যাঘাত আমার। সূর্পনখের কণ্ঠস্বর শুনি আমি।

সে ডাকে আমার নাম ধরে। বলে, কেন দেখতে চেয়েছিলাম কেন ডেকেছিলাম তোকে, জানতে চাস তো চলে আয় এখুনি। চলে আয়, চলে আয়।

কেন এমন হয়—জানিয়েছিলুম আমি তীর্থনাথকে। তীর্থনাথ শিশুসুলভ মুখে হেসে বলেছিলেন, তোমার মনের কোণে তার কথায় নিশ্চয় একটা ভয়ের কণা জন্মেছিল। সেই পোষা ভয়ই মাথা তুলে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ঘুমের মধ্যে স্নায়ুগুলো অবশ থাকে তো, ভয়ের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সুবিধে হয়। ওসব কিছু নয়, ওসব কিছু নয়।

কিছু নয় বললেও ওঁর সতর্কদৃষ্টি আমাকে সদাসর্বদা পাহারা দিয়ে রাখত। এটা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। রাতে ঘুম ভাঙার পর যখুনি আমি বিছানায় উঠে বসেছি, সূর্পনখের কাছে যাবার জন্য অজ্ঞাত আকর্ষণ অনুভব করেছি। তখুনিই দরজার বাইরে থেকে অভয়বাণী ভেসে এসেছে তীর্থনাথের। উনি বলেছেন, শুয়ে পড়, আমি রয়েছি। রাজ্যের ঘুম নেমে এসেছে আমার চোখে। ঘুম ভেঙেছে পরদিন ভোরের আলো চোখে পড়ার পর।

মনে পড়ে কৃষ্ণপক্ষের মঙ্গলবারের রাত থেকে আমার জীবনে এ এক অন্ধকার রাতের হাতছানি শুরু। একই ভাবে কাটছে দিন পনের ধরে। জানি না এ ঘুম ভাঙানো স্বর আমাকে এভাবে উৎপীড়ন করে চলবে আর কতদিন!
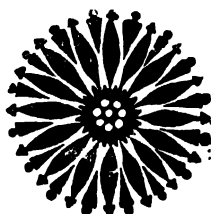
যত কিছু ঘটনা তীর্থনাথকে কেন্দ্র করে।

কেন যে সেই মুহূর্তে আমাকে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়েছিলেন, তাও জানি না। মানুষকে বুঝি বা বিধাতার লিখন অনুসারে জীবনের সব

অধ্যায়ই ভোগ করে যেতে হয়। তাই একজন উপলক্ষ্য হয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে। কি বা দুর্যোগের দিনে, কি বা সুখের দিনে। ভবিষ্যতে যা আসছে, তারই সূত্রপাতের পথ প্রদর্শক হিসেবে।

আমারও তাই হয়েছিল।

স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। যক্ষিণী সেজে ধর্মের ব্যবসা করতে মন চাইছিল না বলে। স্বামী প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছে, কিন্তু আমি দেউলিয়া হতে বসেছিলুম। কেবল কপটতা ছলনা। পবিত্র ভাবটাই মন থেকে উবে যেতে বসেছিল। অন্যায় ব্যবসা থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছি। আত্মঘাতী হতে গেছি, সেইক্ষণে কেমন হয়ে গেছি আমি। ছবির কালী আর আমি এক। তখনও ডেকেছে আমাকে, তখনও শুনেছি একটা স্বর। যেন মা কালী ডেকেছে—চলে আয় আমার কাছে।

আচ্ছন্নের মতন বেরিয়ে গেছি আমি বাড়ি থেকে। সব বুঝতে পারছি সব দেখতে পাচ্ছি। কিছুই আমার মনে দাগ কাটতে পারছে না। আমায় থামিয়ে রাখতে পারছে না। শুনেছি পাঁচ বছরের সৌরভের 'মা-মা' ডাক। শুনেছি ভক্তদের যক্ষিণী মনোহারিণী ডাক। পথ পেরিয়ে চলেছি, চলছি তো চলছিই। কোন প্রশ্ন উঁকি মারেনি মনের কোণে।

একটা 'গেল গেল' শব্দে চমক ভাঙল। জ্ঞান ফিরে এলো আমার। চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য। আমার হাত ধরে রয়েছেন দু'পাশে দু'জন। তাঁদের একজন তীর্থনাথ। অপরজন তীর্থনাথের স্ত্রী কিরণশশী। একপলকের মামলা, আমি নাকি গাড়ির তলায় পড়ছিলুম।

চারদিক থেকে অনেক রকমের অনেক বর্ষণই হতে লাগল। কেউ ক্ষোভে রোষে ফেটে পড়ছে।—মরণদশা আর কি! সাজগোজে তো বেশ পরিপাটি। রাস্তা চলার বাহার দেখ, খালি লোক আকর্ষণ করার মতলব। মরবে কেন, এসব মেয়ে যমের অরুচি। অনেক কায়দাকানুন জানে এসব মেয়ে। মরতে গিয়ে মলো!
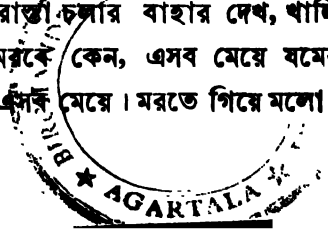
অনেকের গলায় সহানুভূতি।--দেখে তো মনে হয় বোবা-কালা। আহা, বেচারা। এমন নিষ্ঠুরও বাড়ির লোকেরা হয়। লক্ষ্য রাখে না। কেউ আবার বলল, থামুন মশাই। যার ঘরে ওই ধরনের পাগল থাকে, তার কত জ্বলুনি বাইরের লোকে কি বুঝবে! আমার মেয়ে পাগল, আমি বুঝি। এই তো দৌড়ুতে হচ্ছে। মেয়েটার চাউনি দেখছেন না, আস্ত পাগল একটা।

অতিবর্ষণের অথৈ জলে আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। আমাকে জল থেকে টেনে তুললেন এঁরা। তীর্থনাথ আর কিরণশশী। মায়ের মমতা দিয়ে কিরণশশী বুকে টেনে নিয়েছেন। লোকের ভীড় থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। বলেছি, ঘরে ফেরা আর আমার হবে না। আমি চাইও না। আপনারা আমাকে যেতে দিন।

কিরণশশী প্রশ্ন করেছেন, কোথায় যাবে, কিছু কি ঠিক করেছ? কেউ কি আছে তোমার কোথাও? আমরা না হয় তোমায় পৌছে দেব।

বলেছি, না, কেউ নেই। দুঃসময়ে তো কেউ কাছে এসে দাঁড়ায়নি। না হলে কি আর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওই ব্যবসায় নামতে হয়।

কিরণশশী বলেছেন, কান্তা-পূর্ণা আমার দুই মেয়ে। তুমি আমার আর একজন। মহামায়া তোমাকে ঘর থেকে বার করেছেন যেমন, তেমনি তিনি তাঁর নিজের ঘরেই নিয়ে যাবেন। আমার ওখানে গেলেই সব দেখতে পারবে বুঝতে পারবে জানতে পারবে।

কিরণশশীকে দেখে, তখন যা আমার মনের অবস্থা, মনে হয়েছিল —সাক্ষাৎ দেবী এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এসেছিল আমার। দু'পায়ে হাত দিয়ে আমি প্রণাম করেছিলুম। ইশারায় দেখিয়ে দিয়েছিলেন উনি তীর্থনাথকে প্রণাম করতে।

প্রণাম করতে যাচ্ছি, উনি প্রণাম নিলেন না। একটু তফাতে

সরে গিয়ে বললেন, তুমি যে আমার পুজোর ঘরের জগদম্বা।

ওঁদের সঙ্গে এলুম আমি কামাখ্যায়। কামাখ্যা পাহাড়ের আশ্রমে। অশান্ত মন-প্রাণ সমস্ত জুড়িয়ে গেছে আমার। এঁরা যেন কতদিনের আমার আপনার জন। মেয়েদের চেয়েও স্নেহ-ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন আমাকে। কান্তা-পূর্ণাও দিদি বলতে অজ্ঞান। ভালোই ছিলুম খুব। তন্ত্রসাধনার এক একটা আচারের আসল তত্ত্ব বোঝাতেন বসে-বসে তীর্থনাথ।

বলেছেন, দেখ মা! মানুষকে মাতাল করে দিয়ে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে যক্ষিণী দেখান যায় না। ধুনুচির ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি করে একটা নকল কুয়াশা তৈরী করলেও, না। সুরাকে বলা হয়েছে মহামায়ার শক্তি আর মাংসকে বলা হয়েছে শিব। প্রত্যেক মানুষের মাংস অর্থাৎ দেহ, শিব অংশ! আর প্রত্যেক মানুষের মনের অনুভূতি সুখ-দুখ মত্ততা প্রাণশক্তি সুরা। যক্ষিণীসাধনা নিজের মধ্যেই অনুভব করা। দেহ শিব ভেতরের শক্তি দেবী। এই দেবী-শিব মিলে সৎবুদ্ধির প্রকাশ। সেখানেই মানুষ দেবতা। সব কাজে সিদ্ধির অধিকারী। নিজের ভেতরের শক্তিতে সকলকে সম্মোহিত করে সকলের শুদ্ধ চিত্তকে জাগিয়ে তোলার অধিকারী।

আমার মুখের দিকে খানিক চেয়ে হাসতে হাসতে বলেছেন, মনে হচ্ছে খুব শক্ত? মোটেই নয়। সহজ মনে করলে, যত কঠিন জিনিসই হোক, তা সহজ হয়ে যায়। তোমার অনেক কাজ বাকি, আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তোমার ছেলে শুধু সৌরভ একা নয়, আসবে আরও অনেকে। অনেকের মা তুমি।

এসব কথা শোনার সময় আমার মন যে কি অজানা আনন্দে ভরে উঠত, সে কথা আমি বলে বোঝাতে পারব না কাউকে।

আমি ভুলে গেছি আগের জীবন। ভুলে গেছি সৌরভ স্বামীর কাছে পড়ে আছে। মনে হয়েছে সৌরভ আসছে আরও অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে। মুখে কথা বেরোয় নি আমার। আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমি মনে মনে চিৎকার করেছি, তোদের কোন ভয়

নেই, তোরা এগিয়ে আয়। আমি তোদের মা। যখন সচেতন হয়েছি, তখন ভেবেছি মনে মনে—কেন এমন হয়? এ-ভাবটা হারিয়ে যাবে না তো?

তীর্থনাথ বলেছেন, না, পৃথিবীতে আসে এক-একজন এক-এক কাজের ধাতুতে তৈরী হয়ে। যে কাজের জন্যে আসা, সে সেই প্রকৃতির শেকলে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। সেখানে সে নিজে বন্দী। তাই তার প্রকৃতির লোক না পেলে মনের খাপ খায় না। এক সঙ্গে বসবাস করা তো দূরের কথা। সে স্বামীই হোক যেই হোক। তুমি মায়ের জাতের মেয়ে।

সাধনার সময় নিশাসন্ধ্যায় মাঝের আসনে বসেছেন তীর্থনাথ। কপালে চন্দনের তিনটি রেখার মধ্যে সিঁদুরের তিলক। ঘাড় অবধি কালো কুচকুচে চুল ফুলফুরে হাওয়ায় উড়ছে। পরনে লাল চেলি গায়ে লাল চাদর জড়ানো। সৌম্যসুন্দর মুখে টানা টানা আয়ত দু'চোখ যেন কোন্ সুদূরের আনন্দময়ীকে কাছে পেয়ে আনন্দে ভরে উঠেছে। সদানন্দময় পুরুষ। টিকলো নাকে নিশ্বাস টানা-ছাড়া করলেন বার কতক। আমরা বসে আছি দু'জনে ওঁর দু'পাশে, বাঁ দিকে কিরণশশী ডান দিকে আমি।

ঘটের জল নিয়ে উনি আমার মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। দুর্বো-বেলপাতার জল মাথায় পড়তে আমি যেন অন্য জগতের মানুষ হয়ে গেলুম। উনি আমায় অভিষিক্ত করলেন। মায়াবীজ 'হ্রীং' মন্ত্র কানে-কানে শোনালেন। আমার দীক্ষা হল। সাধনার সঙ্গিনী শক্তিকে এই ভাবেই দীক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

আমায় দীক্ষা দেওয়া আমায় সাধন-সঙ্গিনী করে নেওয়া—এতে আপত্তি তো দূরের কথা, সম্পূর্ণ সম্মতি জানিয়েছেন কিরণশশী। বলতে গেলে তাঁরই ইচ্ছেয় তাঁরই প্রেরণায় তীর্থনাথ এগিয়েছেন।

তন্ত্রসাধনার দু'টি ক্রম আছে। চীনক্রম আর নীলক্রম। নীলক্রমের সাধনা শক্তি ছাড়াই করা যায়। কিন্তু চীনক্রমপন্থীদের অবশ্যই পাশে শক্তি থাকবে। শক্তি সম্বন্ধে কড়া নিয়মও খুব। স্ত্রী

ছাড়া বাঁ দিকে অন্য কোন শক্তিকে বসান চলবে না। ডান দিকে যে শক্তি থাকবে, সে পূজ্যা সে মহামায়া।

তীর্থনাথের মতে স্ত্রীর মধ্যে মাতৃভাব জাগিয়ে তুলে তাকেও মাতৃরূপে পুজো করা বিধেয়। কিন্তু এই ভাবের পর স্ত্রী হিসেবে স্পর্শ করা অনুচিত।

আমার চোখে তীর্থনাথ সংযমে-ব্যবহারে শিব। ভেতরে শক্তিসম্পন্ন শাক্ত। ব্যবহারে সকলের সঙ্গে বৈষ্ণব! প্রকৃত তান্ত্রিকের যে যে গুণ থাকা দরকার, আমি তাঁর মধ্যে পেয়েছি। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর চোখে অসংযমী পুরুষের দৃষ্টি খুঁজে পাইনি।

এমন পুরুষকেও অপবাদের কলঙ্কের কাঁটার মুকুট মাথায় পরতে হয়েছে। পরিয়েছে তাঁর প্রিয়জনেরা। হৃদয়ের পুতুলী আদরের দুলালী দু'টি মেয়ে। কান্তা আর পূর্ণা। অবিশ্যি কান্তা-পূর্ণাকে ঠিক দোষ দেওয়া যায় না। এর মূলে পুরনো ঝি মানদার ভূমিকাই প্রধান। মানদার স্বামী গোকুলের অংশগ্রহণ আরও জোরদার হয়ে উঠেছে।

তীর্থনাথ বলেছেন, দেহ আর আকারের ওপর দৃষ্টি থাকে না ব্রহ্মজ্ঞানীদের—যারা বুঝেছে ব্রহ্ম-ব্রহ্মময়ী এক। শিব-পার্বতী এক। তারা জেনেছে পৃথিবীর যা কিছু, জল বাতাস মানুষ জন্তু, সবই ব্রহ্ম। অর্থাৎ দেবীই শিব, শিবই দেবী। এটা উনি বলেছেন ব্রহ্মের বীজ যখন কানে শোনান—ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম।

যখন স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই, তখন ব্রহ্মজ্ঞানী নারী তো পুরুষের সমতুল্য। তার পৈতে নিতে, ব্রাহ্মণপদে ব্রাহ্মণের আসনে বসতে কোন বাধা নেই। পেট থেকে কেউ পৈতে নিয়ে বেরোয় না। নেয় পরে। আবার পৈতে পুড়িয়ে বিরজা হোম করে সন্ন্যাস-ব্রত। ভেতরের কথা যেমন শুনিয়েছেন তীর্থনাথ, কাজেও করেছেন! পৈতে পরিয়েছেন, নিয়ম পালন করিয়েছেন, সন্ন্যাস-ব্রত দিয়েছেন। তাঁর সাধনা অকৃপণ ভাবে অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন আমায়। এতে কিরণশশী মহাখুশী। একজনও অন্তত মানুষ হয়ে উঠুক। যে এই

সাধনা সবার কাছে প্রচার করতে পারে।

কিরণশশীর কানে বিষ ঢালতে লাগল মানদা। —আহাম্মুক আর কাকে বলে! নিজের পায়ে এমন করে নিজেই কেউ কুড়ুল মারে? রাস্তার মেয়েকে ঘরে নিয়ে এসে, একেবারে নিজের আসনে, স্বামীর পাশে। মেয়ে ছুটো নাকি সাধিকা হবার উপযুক্ত নয়! যজমান-শিষ্য সকলেই 'মা-মা' করে তুষারকণার পায়ে পড়ছে। এ আবার কোন্ দেশী ব্যাপার! নিজের ঘরে পরবাসী নিজের স্ত্রী-কন্যা। খাল কেটে কুমীর আনা যাকে বলে! নিজের ভাগ্য অপরের হাতে তুলে দেওয়া। ধনী-আমীর যজমান-শিষ্যেরাও তুষারকণার হাতের মুঠোয় চলে যাবে! অবাক কাণ্ড।

অতি শক্ত-মনের মানুষকেও দেখা গেছে এক কথা বারবার শোনার পর মনোবল হারিয়ে ফেলতে, ভেঙে পড়তে। বিশ্বাসীকেও অবিশ্বাস করতে হয়েছে।

এক্ষেত্রেও সেই পুরনো ধারার পুনরাবির্ভাব ঘটল।

মানদা তো তুষের আগুন জ্বালিয়েই রেখেছিল। তার ওপর যোগ হল ভুবনেশ্বরী পাহাড়ের দৃশ্যটা। কান্তা-পূর্ণা এসে বাড়ীর বাতাস বিষাক্ত করে তুলল। তাদের দিকে বাবার কোন লক্ষ্য নেই। বাবা তুষারকণাদিকে দেখছে তো দেখছেই। কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন একেবারে। মানদার সাক্ষী মানদার যুক্তি জোরালো হয়ে উঠল আরও।

কান্তা-পূর্ণাকে দেখলেই চাপা নিশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে মানদার। দু'চোখের কোণ বেয়ে জল গড়াতে থাকে। আঁচলের খুঁট দিয়ে জল মুছে, খনখনে ভাঙা গলায় বলে, দিদুরা, সোমত্ত বয়েসে এই বাড়িতে এসেছি। তখন তীর্থনাথের বাবার বাবা বেঁচে। নতুন বৌ হয়ে যখন তোমার মা এলো এই ঘরে, আমার কত্তা তখন এতো থুত্থুড়ে নয়, জোয়ান মরদ। আজকের মতো আমিও তখন এমন পিঠ বাঁকা বুড়ি ছিলুম না। তোমাদের ঠাকুমা তার বড়ছেলেকে নিয়েই উন্মত্ত। বড়ছেলের খুশীর জন্য বড়বৌয়ের পায়েই সব। দে চন্দন গোপালের গায়। অন্যায়-অবিচার দেখতে পারতুম

না। তোমার মা তো কেঁদেকেটে সারা। ওই হিংসুটে শাশুড়ির সেবা ছেড়ে অন্য কোথাও নড়বেন না। তোমার বাবাকে বলে বলে আলাদা করে দিয়ে তবে আমি নিষ্কৃতি পেয়েছি। ওপক্ষকেও আমার কাজের তারিফ করতে হয়েছে। আমার নাম দিয়েছে মন্থরা মানদা।

কান্না ভুলে এবারে ফোকলা কয়লা কালো মাড়ি বের করে পেত্নীর নাকি সুরে 'হিঁ-হিঁ' করে হেসে উঠল। বলল, আমার কত্তা এ-নামে খুব খুশী। বলে, তুমি কৈকেয়ীর দাসী! একি কম পুণ্যির নাম। রামের বাবার বৌয়ের দাসী।

কান্তা-পূর্ণার চিবুক ধরে মানদা বলল, এই মন্থরা-মানদা বেঁচে থাকতে ওই তুষারকণা-টনাকে আমি গেরাহ্যি করি না।

রামায়ণের কাহিনী সত্যি হোক, কি কবির কল্পনা যাই হোক না কেন, সেখানকার সমস্ত চরিত্র চিরকালের চরিত্র। এদের মৃত্যু নেই কখনও। এরা বেঁচে ছিল বেঁচে আছে বেঁচে থাকবে। যে মানুষটা আমার সঙ্গে এক সময় অত ভাল ব্যবহার করেছিল, আচমকা এত পাল্টে যেতে পারে, ভাবাই যায় না। আমি ওর ভেতরটা দেখতে অনেক চেষ্টা করেছি। হদিস খুঁজে পাইনি।

আমাকে আলাদা ডেকে ডেকে বলে মানদা, বলি, ভালোমানুষের ঝি, এরকম করে একটা ঘর ভাঙানো কি ভালো হচ্ছে তোমার! তোমায় নিয়ে যখন এত গণ্ডগোল, তুমি সরে পড়লেই তো সব ল্যাটা চুকে যায়।

আমায় নিয়ে যত গণ্ডগোল! মনে মনেই ওর কথাটা রোমন্থন করেছি বারবার। একদিন এই মানদার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল, 'দেবী'। তুমি আসার পর থেকে এদের স্বচ্ছল অবস্থা। যেও না কোনদিন এদের ছেড়ে।

কামাখ্যা মন্দিরে পুজো করতে যান তীর্থনাথ। আমি যেতে চাইনি, আমি যাব না—জোর করে মানদা পাঠিয়ে দিয়েছে। আজ ও যাই বলুক, তীর্থনাথের সঙ্গে না গেলে, কামাখ্যাদেবীর কিংবদন্তী ইতিহাস দর্শন আমার কাছে হয়ত বা অজানাই থেকে যেত। অন্য

কারুর সঙ্গে গেলে, কিছু জানলেও জানতে পারতুম। তবে, তীর্থনাথের কাছে যা জেনেছি, এমন নিশ্চয় না।

নরকাসুরের গড়া পথ—পাথরের ধাপ বেয়ে ওপরে উঠছি যখন, তখন তীর্থনাথ বলেছেন, পুরাণের অসুর যত দিন দেবভাবে ছিল, ততদিন তার অসুর প্রবৃত্তি জেগে ওঠেনি। যখন অন্য অসুর বাণাসুরের সঙ্গে মিলন ঘটল, তখনই তার অসুর-প্রবৃত্তি জেগে উঠল। পুরাণের রূপক কাহিনী হলেও, সঙ্গী আর পরিবেশের আকর্ষণ মানুষ অস্বীকার করতে পারে না।

কথাটা আমার কাছে কেমন হেঁয়ালি হেঁয়ালি মনে হল। আমি তাকিয়ে আছি জিজ্ঞাসা নিয়ে দু'চোখে।

শান্ত স্বরে বললেন উনি, যার ভেতরে লোভ ক্রোধ বা হিংস্র ভাবের প্রবৃত্তি একটু বেশী ধরনের—সেই সব মানুষদেরই অসুর ভাবের সঙ্গে তুলনা করা হয়। পবিত্র মনের মানুষদের সংস্পর্শে প্রভাব কিছু পরিবর্তন হতে পারে, সম্পূর্ণ নয়। দুষ্টু-প্রবৃত্তিটা চাপা থাকে কেবল। যেই কুৎসিৎ মনোভাবের লোকের সঙ্গে কুৎসিৎ পরিবেশে পড়ে, আবার আগের মূর্তি—পশুর। নরকাসুর তার জাজ্বল্যপ্রমাণ।

কথা কইতে কইতে ওপরে উঠে এসেছি আমরা দু'জনে। কামাখ্যাদেবীর করুণা পেয়েছিল নরকাসুর।

হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়লেন তীর্থনাথ। ওই অবস্থাতেই বসলেন মাটিতে। আমি সামনে বসে দেখছি ওঁকে। শুনছি ওঁর কণ্ঠস্বর থেকে কোন্ সুদূরের বাণী বেরিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

—অহোমরাজের সঙ্গে যুদ্ধে নাস্তানাবুদ কোচরাজ বিশ্ব সিংহ। পথভ্রষ্ট হয়ে পড়লেন উনি রাত্তিরবেলা। কোথায় সৈন্য কোথায় তিনি! সঙ্গে ছোট ভাই শিব সিংহ। অচেনা কে এসে ওঁদের নিয়ে এলো এই পাহাড়ে এই জায়গায়। ওঁরা সম্মোহিতের মতন চলে এসেছেন এখানে! আজকের পীঠস্থান সেদিনের পীঠস্তূপ। চাপা পড়ে গেছে মন্দির। চাপা পড়ে গেছে বিশ্বজননীর প্রসবিনী শক্তির প্রতিমূর্তি।

প্রায় পাঁচ-ছ'শো বছর আগের কথা।

অতীত নিজেকে ভেঙেচুরে দাঁড়িয়ে থাকে কখনও সাক্ষী হিসেবে, কখনও অদৃশ্য, সাক্ষী লোপ একেবারে। এক্ষেত্রে অদৃশ্য হয়ে গেছে একটি বিশাল বটগাছ। সে সময় ছিল অনেকের আশ্রয়।

বিশ্ব সিংহ দেখলেন ওই গাছের তলায় এক বৃদ্ধা পুজো করছেন। কাছে এগিয়ে আসতে বৃদ্ধা বললেন, বাবা, তোমাদের তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। সামনের ঝরনা থেকে জল খেয়ে এসো আগে।

বিশ্ব সিংহ আর শিব সিংহের মনে হল, বৃদ্ধা তাদের কত আপনজন। জন্ম-জন্মান্তরের মা বুঝি। স্বচ্ছ-মিঠে জলে ভেতর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দু'জনের। পথের ক্লান্তিও দূর হয়ে গেছে।

বৃদ্ধা বলেছেন, এই স্তূপের কাছে প্রার্থনা মহামাতা স্বকর্ণে শোনেন।

আশ্চর্যভাবে মিলেছে বৃদ্ধার কথা। মহারাজের দিশেহারা অন্য পথে চলে যাওয়া সৈন্যসামন্তরাও মহারাজকে খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়েছে ওখানে।

আমি শুনছি আর দেখছি তীর্থনাথকে। তীর্থনাথের চোখের কোণে জলের কণা টল্‌টল করছে। মুখে পরম তৃপ্তির হাসি। বলা শুরু করলেন আবার।

—বিশ্ব সিংহই কামাখ্যাদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করেন। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। রাজা নরনারায়ণ তাঁর সেনাপতি মেঘামকদ্দুমকে নির্দেশ দেন মন্দির সংস্কার করতে। দশ বছর ধরে মন্দিরের কাজ চলে। পনেরশো পঞ্চান্নয় শুরু, শেষ পঁয়ষট্টিতে।

বলতে বলতে তীর্থনাথ থেমে গেলেন।

বেলা গড়িয়ে গেছে, নেমেছে সন্ধ্যে।

সন্ধ্যারতির ঘন্টার ধ্বনি আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলে বেড়াচ্ছে।

তীর্থনাথ সচেতন হয়ে উঠলেন। উঠে দাঁড়ালেন। মায়ের আরতি দর্শনে যাবেন মন্দিরে। যাচ্ছেন, আমি সঙ্গে। বলছেন সুন্দর একটি

কাহিনী, যা এই আরতির ঘণ্টার বাজনায় মিশে গিয়ে এক হয়ে রয়েছে।

যে কথা শুনলুম আমি তীর্থনাথের মুখে, একটা পূর্ণ ছবি এঁকে গেল আমার ভেতরে।

মন্দিরে এসে বারো থামের ভেতর চলন্তামূর্তি দেখলুম। ছোট, অষ্টধাতুর। কামেশ্বরী আর কামেশ্বর। সিংহের ওপর শব। শবের নাভিপদ্মে দেবী। ছ'মুখ বারো হাত। পাশে বৃষের ওপর কামেশ্বর। পাঁচ মুখ দশ হাত।

দেখলুম চলন্তা-মন্দিরের শিলালিপিতে লেখা রয়েছে, রাজা নরনারায়ণ আর তাঁর ভাই চিলা রায়ের নাম। লিপি পনেরশো পঁয়ষট্টি খ্রীষ্টাব্দের······দেবী ভক্তিমতাম্বরো রচিতবান্ শ্রীশুক্লপূর্ব ধ্বজঃ।

ঘণ্টাধ্বনির তালে তালে পুরোহিতের সর্বাঙ্গ নাচছে যেন। চামরের আরতিতে মনে হচ্ছে বিশ্বের সমস্ত বাতাস ওই একটি জায়গায় এসে জমা হয়েছে। দেবীও যেন দুলছেন!

শুনেছি, সাধক কেন্দুকলাই আরতির ঘণ্টা বাজাতেন যখনঃ দেবীও নৃত্য করতেন। আমার শিরা-উপশিরায় রক্তকণিকায় একটা নৃত্যের আভাস পাচ্ছি। আমার বুকের বাঁ দিকটায় যেখানে ধুক ধুক করছে সেখানে নূপুরের আওয়াজ পাচ্ছি আমি। দেবী নৃত্য করছেন আমার কপালে ভুরুর মাঝখানে। দেবী নৃত্য করছেন আমার সর্বশরীরে—প্রতি অঙ্গে অঙ্গে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, সারা দেহ আমার টলছে। চামরের হাওয়ায় আমি দুলছি। দেহটা এত হাল্কা, পালকের বাতাসে নামছি উঠছি, নামছি উঠছি।

একসময় মনে হল, দেবী আমি অভিন্ন। তারপর আর কোনো জ্ঞান নেই। জ্ঞান হতে চেয়ে দেখেছি, আমার শিয়রে তীর্থনাথ। তাঁর কোলে মাথা, তিনি মাথায় হাত বুলোচ্ছেন আর মুখে দেবীস্তোত্র পাঠ করে চলেছেন এক ভাবে। ঘিরে রয়েছেন ভক্তরা পুরোহিত-ঠাকুর, প্রত্যেকেই তীর্থনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে, উচ্চারণ মিলিয়ে স্তোত্রগানে মুখর করে তুলেছেন মন্দির। 'জয় সর্বগতে দেবী, কামেশ্বরী নমোহস্তুতে'। সকলে আমার মধ্যে কি দেখছেন, আমি

কিছু বুঝতে পারছি না। আমি হকচকিয়ে গেছি।

আমার মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যি আমিই কি শুয়ে আছি, না আমার মৃতদেহ ? শুনেছি, দেহ ছেড়ে আত্মা বেরিয়ে গেলে দেহেরই চারপাশে ঘুরে মরে নাকি ! একি আমার নিজেকেই নিজে দর্শন তাহলে—মৃত্যুর পরে ?

যাঁরা চলে গেছেন—ঠাকুরদা-ঠাকুরমা জ্যাঠামশাই দিদি—সকল আপনজনকে দেখার কি চেষ্টা ! শুনেছিলুম, মরার পরে ওদের সঙ্গে নাকি দেখা হয়। যারা কাছে বসে আছে, তারাই কি এরা ! আমি কি ভুল দেখছি—তীর্থনাথ পুরোহিত ঠাকুর !

দেবীর চরণামৃত আমার মুখে ঢেলে দিলেন কুশি করে তীর্থনাথ। ভেতর গলে নরম কাদার মতন হয়ে গেল। আমার মনের ঘোর চোখের ঘোর চিন্তার ঘোর মুছে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

আমি উঠে বসলুম। দৃষ্টিতে আমার বিস্ময়। জিজ্ঞেস করলুম, আমি কোথায় ? আমার কি হয়েছে ?

তীর্থনাথ সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তুমি যেখানকার, তুমি সেখানেই।

এরপর বাড়ি ফিরিয়ে এনেছেন তীর্থনাথ আমায়। সব কথা শুনে মেয়েদের সঙ্গে মানদা ছুটে এসেছে। পায়ের ধুলো নিয়ে নিজের মাথায় মাখিয়েছে। বলেছে, আশীর্বাদ কর গো মা। এ জন্মে অন্যের বাড়ি কেবল খেটে খেটে মলুম। পরের জন্মে যেন রানী হয়ে জন্মাই।

কিরণশশী এসেছেন। তিনি আমার পা ছুঁতে গেলে, আমি চমকে উঠে সরে দাঁড়িয়েছি।—একি করছেন ? আমি যে আপনাকে মায়ের মতন দেখি।

পা ছুঁতে দিই নি কিরণশশীকে। তবুও তিনি প্রণাম করতে ছাড়েন নি আমায়। প্রণাম করেছেন, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত যাকে বলে। মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সর্বাঙ্গ মিশিয়ে দিলেন মাটির সঙ্গে। কপাল বুক পেট হাঁটু পা পায়ের পাতা।

আমি বিব্রত বোধ করছি খুব। এরকম আচার-ব্যবহার—আমি

হাঁপিয়ে উঠছি। ছুটে পালিয়ে গেলুম ঘরের ভেতরে। যেটা আমার সাধনার ঘর, শোবার ঘর। আয়নায় দেখলুম, যেমন মুখ তেমনি। এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। বরং কলকাতার বাড়িতে আয়নায় নিজেকে দেখিনি, তার জায়গায় দেখেছিলুম, মা কালীর ছবি।

তীর্থনাথের মুখে শুনেছি, দেবদেবীর পুজো করতে গেলে তাঁদের চিন্তা ভাবনায় এমন বিভোর হয়ে যেতে হয় যে, পূজারী আর দেবতা একই চেহারার হয়ে যাবে। পুজোর প্রধান অঙ্গ এই শ্বাস-সাধনা।

তীর্থনাথকে বললুম আমি. কই আমি তো সেরকম কিছু চিন্তা করি নি! তীর্থনাথ বলেছেন, অনেক কাজ অনেককে শিখিয়ে-পড়িয়েও তার মগজে ঢোকানো যায় না। সারাজীবনের চেষ্টায়ও কিছু হয় না। আবার অনেকের দেখা গেছে, অনেক কাজের জন্যে কেউ কেউ তৈরী হয়ে আসে। কিছু না শেখালেও সে সব কিছু করে নেয় ঠিক ঠিক। তোমারও তাই। সব কিছু হয়ে রয়েছে, জীবনের এক এক অধ্যায়ে সেই সেই ক্ষণে প্রকাশের অপেক্ষা শুধু।

—আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে পারবার দিন এলেই বুঝবে।

মন্দিরের ঘটনার পর, এবাড়ির সকলেই মাঝে মাঝে মহামায়া বলে ডাকতে শুরু করে দিল আমায়। কথাটা শুনলে মনে খটকা লাগত একটু। কিন্তু ভালোও লাগত চতুর্গুণ। আমি সবার আরাধনার বস্তু, সবার ওপরে, সবার পূজনীয়া।

যখন একা একা ঝরনার ধারে গেছি, পাহাড়ের তলায় বসেছি, বড় কাঠ গোলাপের গুঁড়িটায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছি, পায়ের তলায় নীলাচলের পাহাড় অনুভব করেছি, দেখেছি ব্রহ্মপুত্রের স্রোত, দেখেছি দূরে দূরে নীল পাহাড়। আকাশের দিকে মন চলে গেছে। মহাশূন্যে মন ঘুরে ঘুরে মনের কানে এসে বলেছে, এই সমস্ত আর সূর্য নক্ষত্র যাঁর চালাবার কথা, তাঁকেই তো মহামায়া বলা হয়েছে। যাঁর শক্তিতে চলছে স্থিতি হয়ে রয়েছে—তিনিই তো মহামায়া। সেখানে তো তুমি কিছুই নয়—একটা ছোট্ট ধূলিকণাও নয়।

তোমাকে তো তুমি হারিয়ে ফেলবে—এত চিন্তা করলে।

তবে আমি কে ?

আর একটা মন আমায় বলল, যত ছোটই হওনা কেন তুমি, এই বিশাল শক্তির সঙ্গে এক বাঁধনে বাঁধা। তাই তোমার যখন আত্মতন্ময়, তখন ওই বিশালের ছবি উঁকি মারে তোমার স্বচ্ছ হৃদয়ের মধ্য দিয়ে। সেটাকেই মানুষ মানুষের মধ্যে মহামায়ার প্রকাশ ভেবে নেয়। যার মধ্যে এভাবের প্রকাশ, সে ধন্য। যারা এই প্রকাশের ভাব চোখে দেখে, তারাও ধন্য। শুধু একটা কথা মাথায় রাখবে, অহংকারের মিথ্যে ছায়া যেন কোনরকমে তোমার মধ্যে প্রবেশ না করে। সদা সতর্ক সদা সচেতন থাকতে হবে এই একটি ব্যাপারে।

একথাও জানিয়েছি তীর্থনাথকে। তীর্থনাথ বললেন, ঠিক কথাই তো। ধর্মের প্রধান অঙ্গ আত্মবিশ্লেষণ। আত্মবিশ্লেষণই আত্মদর্শনে বিশ্ব-দর্শন। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে নিজেকে নিজের মধ্যে তাঁকে দেখা। নিজের মধ্যে তাঁকে দেখতে পারলেই সবার মধ্যে দেখা যাবে।

সবার মধ্যেই আমি আমার অন্তরাত্মাকে দেখার চেষ্টা করেছি, অনেকের কাছ থেকেই ফিরে এসেছে আমার মন নিজের মধ্যে। অনেকের ভেতরই তো নিজেকে খুঁজে পাইনি আমি।

প্রসূনের মধ্যে আমার দ্বিতীয় আমিকে কোনদিনই দেখিনি। বহু চেষ্টা করেও না। তার জায়গায় দেখেছি, একটা তরুণের করুণ চাউনি। দেখছি তার আকণ্ঠ পিপাসা, আকাঙ্ক্ষার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। একটি ছায়া প্রেম। এ ছায়ার কায়া নেই। নেই রক্তমাংসের শরীর। নেই ওই তরুণের প্রেমকে স্বাগত জানাবার কোন মন। তরুণ তীর্থনাথের অতি আদরের একমাত্র পুত্র—প্রসূন।

যখুনি নিরালায় একা বসে থেকেছি, প্রসূন এসেছে কাছে। ও দুরন্ত দুর্বৃত্ত নয়, ও শান্ত প্রেমিক। ভুল পথের পথিক। কোনদিন আমাকে মহামায়া বলে আহ্বান করেনি। কোনদিন আমাকে প্রণাম করেনি পায়ে হাত দিয়ে অন্যের মতো। না ডাকুক না করুক,

আমার কিন্তু তাতে কোন ক্ষোভ-দুঃখের বালাই ছিল না। বরং এটাই পছন্দ করেছি বেশি। ও কাছে এলে, ভারী পোশাকের চেয়ে খানিকটা হাল্কা পোশাক পড়তুম যেন। আমি তো চেয়েছি, মানুষ হিসেবে দেখুক আমায় লোকে। দেবী হিসেবে দেখলে বড় আড়ষ্ট হয়ে যাই।

প্রসূন আমায় বলেছে, তোমার কাছে আমি আসি বাবা-মায়ের মতো ভক্তি নিয়ে নয়। বোনদের মতো প্রার্থনা নিয়ে নয়—ভালো বিয়ে হবে বলে।

প্রশ্ন করেছি আমি, তবে কিসের জন্য আসো তুমি? যদিও আমার অজানা নয়, কেন আসো।

প্রসূন বলেছে, তোমাকে ভালো লাগে।

আমি নাকি তুষার দিয়ে গড়া! বাপ-মার তুষারকণা নাম রাখা সার্থক। তুষারের ওপর সূর্যের আলো পড়লে যেমন সোনালী রূপোলী নানা রঙ খেলে যায়, আমার সাদা রঙে সূর্যের আলো পড়লেও নাকি সে রকম হয়! অপূর্ব মোহ ছড়ানো রঙের খেলা নাকি ওর চোখে পড়ে!

আমি কথা না বলে চুপ করে বসে থাকলে নাকি আরও সুন্দর দেখায় আমায়। আমার মৌন-ভাবই ওকে অনেক কথা বলে। আমি বলেছি, এ কেমনতরো কথা? আমি কি বললুম, আমি জানি না—তুমি সব জানতে পারছ। আশ্চর্য! মাথাটাথা বিগড়োয় নি তো?

প্রসূন মৃদু হেসে বলেছে, তোমার মন বলে যদি কিছু থাকত, তাহলে তুমিও আমার মনের কথা বুঝতে পারতে। শুনতে পেতে। তোমার পাথুরে হৃদয়। কেমন করে সকলে মহামায়ার মমতা দেখছে জানি না।

ওকে এড়ানোর জন্য, আমার কাছ থেকে সরানোর জন্য আমি উঠে পড়েছি। যাবার সময় বলে গেছি, অমন সাধক বাপের ছেলে তুমি। আজেবাজে ব্যাপারে মাথা ঘামানো একদম উচিত নয়। সাধনায় মন দাও, বাবার মন রাখো।

চাপা গলায় গর্জে উঠেছে ও।—তুমি আমার সাধনা-ভজনা। রক্তমাংসের শরীরের প্রেমকে অস্বীকার করতে পার তুমি? মাটির পাথরের মূর্তি নিয়ে প্রেম করলে সে প্রেম কি ছলনা নয়? সেটা কি আত্মপ্রবঞ্চনা নয়, সেটা কি অন্যায় নয়? নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করে ছাখো তুমি।

শাসন করবার জন্যে ঘরে প্রবেশ করতে গিয়েও আমি আবার ফিরে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। যত কাল হয়েছে আমার প্রতিবাদ না করা। চুপ করে বসে থাকা। আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে ওর সঙ্গে।

গম্ভীর গলায় রূঢ় স্বর বজায় রেখে আমি বললুম. তুমি সবই জানো আমার কথা। আমার স্বামী, আমার সৌরভ। পৃথিবীতে এসে আমি আত্মবঞ্চনা করছি, এধারণা কেমন করে তোমার মাথায় এলো? তোমার বেলায় যা হতে পারে, আমার বেলায় সে জিনিস খাটে না। অন্য মেয়ের মতন আমাকে দেখলে জীবনে মস্ত বড় ভুল করবে। ভালো চাও তো আমার চিন্তা-ভাবনা মনের কোণ থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেল।

—না, তা আর কিছুতেই হয় না। প্রসূনের গলার রোষে উন্মত্ত বাঘের গর্জন। 'মৌনং সম্মতিং লক্ষণং' জানিয়ে এতদিন পর তুমি সরে যেতে চাইলেও, আমি যেতে দেব না।

—আমি দেখতে চাই কি করে আটকাও তুমি।

—আমি কি আটকাবো তোমায়। তুমি নিজেই আটকে আছো। নিজের মনকে জিজ্ঞেস করে ছাখো! সাহস থাকে তো সত্যি কথা বলবে। আমি যা বলেছি—[illegible] কি না!

আপাদমস্তক ঘেমে উঠছে আমার। কপাল-মাথায় থিকথিকে ঘাম জমেছে। প্রসূনের চোখে চোখ মেলাতে পারছি না। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। এই মুহূর্তে ওর সামনে থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে কোথাও।

আমি নিরুত্তর। উত্তর দেবার কিই বা আছে। ওর কথা অস্বীকার

করার ক্ষমতা কোথায় আমার? নিজের মনকে ফাঁকি দেব কেমন করে? মুখে 'না' বললেও সত্যি বলা হবে না তো। আমার নিঃসঙ্গ মনের একমাত্র প্রধান সঙ্গী হয়ে উঠেছে প্রসূন এখানে আসার পর।

আমি রূপসী কিনা জানি না। আমার রূপে বিধাতার অপূর্ব সৌন্দর্য-সৃষ্টির নমুনা নাকি পেয়েছে ও। রোজ এসে এসে সৌন্দর্য-স্তুতি করেছে। শুনতে খারাপ লাগে নি। বলতে গেলে বেশ ভালো লেগেছে।

ও এলে সময়টা খুব তাড়াতাড়ি কেটে যেত। হ্যাঁ, ওকে প্রশ্রয় দিয়েছি। প্রথমেই চোখ রাঙানিতে ওর প্রথম প্রেমের চারাগাছকে নির্মূল করে দিলে, আজকের মতন শক্ত শেকড় গেড়ে বসতে পারত না।

আমি জানতুম প্রসূন ঠিক অন্য মানুষের মতন নয়। হিংস্র পশুর থাবা নিয়ে ধারালো নখ বার করে কখনও ঝাঁপিয়ে পড়বে না আমার ওপর। সুযোগ বুঝে আক্রমণ করে বসবে না কখনও আমায়। ও-জাতের পুরুষ ও নয়। চোখের পিপাসা মেটাতে পাগল কেবল।

ফুলদানির ফুলের রূপ-রঙ দেখবে শুধু দু'চোখ ভরে। কাছে এসে পাপড়ি ছিঁড়ে নষ্ট করবে না। একটু জোরে নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে ভয় পাবে। পাছে সৌন্দর্যের হানি হয়। কোন পাপড়ি খসে পড়ে যায় যদি। পড়ে গেলে, ওর হৃৎপিণ্ডও বুঝি খসে পড়ে যাবে বুকের ভেতর।

এমনতর নিরাপদ মানুষ বলেই তো আমি ওর সামনে বসে-বসে নিজের স্তুতিগান শুনেছি।

প্রতিদিন বিকেলে এসেছে প্রসূন। শরীর খারাপে ঘরে পড়ে থাকলে, আমি থাকতে পারিনি। ছুটে চলে গেছি ওর ঘরে। জ্বরে মাথায় রক্ত ওঠা নেমে গেছে ওর তড়িঘড়ি। হাসিমুখে বলেছে, এত দেরী করলে, কখন থেকে ভাবছি আমি তোমার কথা। আমি জানতাম কেউ না আসুক তুমি আসবেই। বলতে বলতে দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গেছি, বিছানায় বসতে যাচ্ছি—হাত

নেড়ে নিষেধ করেছে প্রসূন। বলেছে, তুমি সামনের চৌকিটায় চুপ করে বসে থাকো। তোমাকে দেখলেই আমি সুস্থ হয়ে উঠবো। দেখতে পাচ্ছো তো ঘাম হচ্ছে। জ্বর ছেড়ে গেছে।

আমি প্রসূনকে দেখেছি আর ভেবেছি। কল্পলোকের রাজপুত্তুর। এরকম মানুষ দেখিনি। দেখেছি, আমায় দেখে তাদের দু'চোখ ঝলসে উঠেছে কামনাবাসনার জ্বলন্ত আগুনে। পালাতে পথ পাইনি আমি সেখান থেকে।

আমার জীবনে এই প্রথম পুরুষ—যার দৃষ্টি পবিত্র স্বচ্ছ কামগন্ধহীন। বৈষ্ণব কবির কথা মতন এ-প্রেম নিকষিত হেমের সমান।

এক্ষেত্রে শাসন যদি করতে হয়, আমার নিজেকেই করা উচিত। প্রসূনকে নয়।

আমি প্রসূনের কথার কোন জবাব না দিয়ে মুখ নীচু করে ঘরের ভেতর চলে গেছি। আমি অপরাধী, আমার অন্যায়। মাথায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। মেঝেয় পাতা কম্বলের ওপর শুয়ে পড়লুম। এসেছেন অন্তর্যামী তীর্থনাথ। বলেছেন সামনে বসে, তন্ত্রের দিব্যভাবটা কি জান? বলি বলি করেও তোমায় বলা হয়নি। এখন হঠাৎ বলার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠল। তাই ছুটে এসেছি।

—দিব্যভাবের লোকরা সব সময় দেবতার মতন পবিত্র থাকবে। সুখ-দুঃখ শীত-গ্রীষ্ম সবই সমান, সবই তার সহ্য। রাগ-দ্বেষ থাকবে না একদম। সকলেই তার কাছে সমান—এক অদ্বৈতবাদী। সদাসর্বদা ক্ষমাসুন্দর মূর্তি।

আমার মনে হল, আমার অবস্থা বুঝেই ওঁর আগমন। মাথার বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। অনুশোচনায় দগ্ধে মরছি। নিজের ভুল নিজে সংশোধন করব—নিজেকে পীড়ন করে। তাই বুঝি উনি নিজে এসে উপদেশের ছলে বুঝিয়ে দিচ্ছেন দিব্যভাবের সাধক-সাধিকাদের এভাবে পীড়ন করা ঠিক হবে না।

আমার অশান্ত মনকে শান্ত করার জন্য অভিষেকের পর পূর্ণাহুতির

ধ্যানটা করতে বললেন।

—এখন তো হোমকুণ্ড জ্বলছে না। মনে কর, তোমার নিজের নাভিতে আগুন জ্বলছে। তোমার ইষ্টবীজ ক্রীং আর কামিনী বীজ ক্রোং এই দুটি বীজে পঁচিশ বার করে আহুতি দেবে। তারপর সেই অগ্নিতে দেবী এলেন। অগ্নি থেকে দেবী তোমার হৃদয়ে আসছেন। তোমার হৃদয় থেকে দেবী অগ্নিতে যাচ্ছেন। দেবীর আসা আগমন, যাওয়া বিসর্জন।

এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুয়ে শুয়েই শুনছিলুম আমি। উনি ঘরে প্রবেশ করতে, ওঠার ইচ্ছে সত্ত্বেও উঠে বসতে পারি নি। খুব ভারী হয়ে উঠেছিল দেহটা। সেই ভাবটা কেটেছে এখন। আমি উঠে ওঁকে প্রণাম করতে যাচ্ছি। প্রণাম নিলেন না উনি। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন হাসতে হাসতে।

প্রসূনের ব্যাপার বাড়ির সকলেই জানত। কেউ বিষ নজরে আমায় দেখেনি। এ বাড়ির ধারণা, তান্ত্রিকের আশ্রম এটা। সাত পুরুষ ধরে তন্ত্রসাধনার পীঠই হয়ে গেছে। বংশের ধারা চলছে ঠাকুরদা থেকে বাপ, বাপ থেকে ছেলে। তীর্থনাথের পর প্রসূন। সাধনায় শক্তির প্রয়োজন! শক্তি হিসেবে ভালো আধার তুষারকণা। ছেলের অত অন্তরঙ্গ, ভবিষ্যতে সঙ্গিনী হিসেবে ওকে বেছে নিয়েছে হয়তো।

কান্তা-পূর্ণা ভাইকে নিয়ে আর আমাকে নিয়ে কোন বিরূপ সমালোচনা করেনি। বছর ছয়েক ধরে একই জায়গায় রয়েছি। কোনদিন কারও মনে কিছু সন্দেহের আঁচড় পড়েনি। পড়ল ওই ভুবনেশ্বরী পাহাড়ে গিয়ে! আমাকে দেখে কেমন হয়ে গেলেন তীর্থনাথ। মেয়েদের চোখে সংশয়ের মেঘ জমে উঠল। বাড়িতে সেই মেঘ ছড়িয়ে পড়ল। মানদা সেই মেঘ আরও ঘন করল কিরণশশীর মনের আকাশে। বাড়িময় ঘোঁট। মানদার লাফালাফি।

মানদার তর্জনে-গর্জনে কান পাতা দায়।—বাবাকে হাত করলে দাদাকে হাত করলে, তবু রাক্ষুসীকে এখনও রেখে দিয়েছে সবাই!

বাড়ির দুটো মরদ দুটোই তো ওর খপ্‌পরে। তুষার নয় তো তুষের আগুন! আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে ভেতরে ভেতরে। লজ্জা-ঘেন্নাও তো নেই। চলে যেতে বললে যায় না।

চলে যেতে চেয়েছি আমি। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে প্রসূন।—লোকের কথা শুনে অভিমান ক্ষোভ আসে যদি, সাধনা নিষ্ফল। ওসব ভুলে যেতে হবে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি। তীর্থনাথ এসেছেন। বলেছেন, কোন কথায় ভ্রূক্ষেপ নেই যার, সেই প্রকৃত সন্ন্যাসী। মান-অপমান তো তুচ্ছ, সন্ন্যাসিনীকে অকাতর ক্ষমা বিলিয়ে চলতে হবে সারাজীবন। ভাবতে হবে তার শত্রু নেই, সবাই মিত্র। তাকে অভিজ্ঞ করে তোলার জন্য সকলেই তার গুরু। ছোট বড় সবাই।

আমি ঘরে প্রবেশ করেছি। আসেনি কাছে কান্তা-পূর্ণা। আসেনি ওদের দু'জন ভাবী-স্বামী, বহুদিন ধরেই ওদের পূর্বরাগ চলছে, বিপিন আর অবনী।

মেয়েদুটো কি বোকা! বিপিন-অবনীর মন বোঝেনি। আমি জানি, ওরা কেন এখানে আসে। ওদের দু'জনের চাউনিতে ভবঘুরে জোয়ানের আদিম লিপ্সা। যখুনি আমার চোখে চোখ পড়েছে, তখুনি আমি সে চেহারা স্পষ্ট দেখেছি। কান্তা-পূর্ণার চেয়েও আমার ওপর আকর্ষণটা যেন অতিমাত্রায়। তীর্থনাথকে জানিয়েছি। তীর্থনাথ বলেছেন, প্রার্থনায় কিনা হয়। তোমার কাজ লোকের শুভ প্রার্থনা করা। মনটাকে আস্তাকুঁড় থেকে টেনে নিয়ে আসা। জঞ্জালের ভেতর নিজের মনকে যেতে দেবে না। কড়া লাগাম ধরে টেনে আনবে। সব রকম লোকের সঙ্গেই মিশতে হবে। সব রকম লোকের ভেতর থেকেই নিজের পথ বেছে নিতে হবে। ভয় পেলে চলবে না। দুর্বল হয়ে পড়লে চলবে না।

চক্রের শক্তিসাধনায় ওরা অনেকবার আমাকে নিয়ে বসতে চেয়েছে। আমি রাজী হইনি। তীর্থনাথও মত দেননি। আক্রোশে ফুলে-ফুলে উঠেছে ওরা। 'আমার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র শুরু করল।

আমাকে এখান থেকে তাড়ানোর জন্যে। ওদের সঙ্গী হল কান্তা-পূর্ণা-মানদা। আর ওদের অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবেরাও।

কী ভীষণ হয়ে উঠতে পারে মানুষ, নিজের স্থূল স্বার্থসিদ্ধিতে বাধা পেলে।
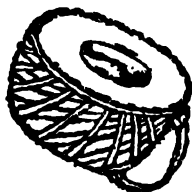
দেওধ্বনি।

প্রচলিত বিখ্যাত উৎসব। কি নিষ্ঠাকাষ্ঠা! ভাদ্রমাসের পয়লা-দোসরা দু'দিন ধরে উৎসব। পঞ্চরত্ন মন্দিরে নাগ-ফণা আর ঘটে মা-মনসার পুজো। সারাদিন-রাত প্রাচীন কবি দুর্গাবর মনকরের লেখা পদ্মপুরাণের বেহুলা-লখিন্দরের গান পুজোপাঠ আনন্দ। স্বর্গের দেবতা মর্তে নেমে আসে বুঝি মানুষের আনন্দের সেতু ধরে।

ঢাক-ঢোল কাঁসরঘণ্টা করতালের ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠছে। নাচতে নাচতে তন্ময় হয়ে পড়ছে দেওধ্বনির ব্রতীরা। ওদের ভৈরব বেশ। আমি দেখেছি ওদের সে নাচ। চোখকে বিশ্বাস করা যায় না, মনে হয় স্বপ্ন দেখছি। ধারালো তলোয়ারের ওপর দিয়ে নেচে নেচে যাচ্ছে। পায়ের তলা কেটে গিয়ে রক্ত বেরোনো তো দূরের কথা, একটুও আঁচড় কাটেনি। ওই অবস্থায় ওদের মধ্যে দেবতার আবেশ হয়। ওরা নিজেদের সেই দেবতাই ভেবে নিয়ে যা ভবিষ্যদ্বাণী করে—সেই ভবিষ্যৎ ওরা দিব্যচোখে ঘটতে দেখে বলেই হয়তো, তাই মিলে যায় হুবহু।

উৎসব-পুজো আরম্ভের মাসখানেক আগে থেকে সন্ন্যাসীর সাধনা চলে এদের। হবিষ্যি-নিরামিষ, সংযম। সবার অধিকার নেই এ ব্রতে ব্রতী হবার। যারা স্বপ্নে দেখে দেবী কুমারীকে, দেখে বিভীষিকা, তাদেরই অধিকার শুধু। এই ব্রতীরাই প্রত্যেকে

দেওধ্বনি উৎসবের দেওধা। যার যে ইষ্টদেবতা, সেই দেব-মন্দিরের কাছে গিয়ে মাসাবধিকাল ওরা কৃচ্ছ্রসাধনা করে।

প্রতি বছর তীর্থনাথ আমাকে নিয়ে গেছেন পঞ্চরত্ন মন্দিরে। দু'দিন ধরে পুজোপাঠ আর শেষরাতে ঘট-নাগফণার বিসর্জন দেখে ফিরে এসেছি আশ্রমে। স্বর্গীয়ভাবে মন-প্রাণ ভরে নিয়ে।

মানুষের এমনও মতিভ্রম হয়, মানুষ এমনও কুটিল হয়ে ওঠে! একজনকে অপদস্থ করার জন্যে, তার চরিত্রে পাপ ছড়িয়ে দেবার জন্যে এই পবিত্র উৎসবের অনুকরণ করতেও দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। মানুষের কোন্ স্তরে পড়ে এরা, আমার জ্ঞানের অগম্য। আমি বিস্মিত হয়ে পড়েছি। আমি শিউরে উঠেছি, যখন জানতে পারলুম্। ভয়-ডরের বালাই কি নেই কোন এদের?

জানবার আগে—আমার কাছে এদের মুখোশ খুলে পড়ার আগে আমরা কেউ ভাবতে পারিনি—আমাকে জাহান্নমের পথে পাঠানোর জন্যে এরা জাহান্নমে যেতে বসেছে।

এলো সেই দিন। জাহান্নমে যাবার মহামুহূর্ত। ভৈরব বেশে এক দঙ্গল তরুণ এলোমেলো পা ফেলে আসছে। এমন নাচ দেখিনি জীবনে। না তাণ্ডব, না উপাসক। ঢাক-ঢোল বাঁশী-কাঁসর ঘণ্টা-করতাল—সব বেসুরো ঠেকছে। ভক্তির স্রোতে হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসছে না এ'ধ্বনি। ধ্বনি আর বিশৃঙ্খল্ নাচ এগিয়ে এলো আশ্রমের আঙিনায়।

আগের দিনে শেষ শ্রাবণের বৃষ্টি ঝরেছে অঝোরে। ভাদ্রের প্রথম দিনের আকাশ নির্মেঘ ছিল সকাল থেকে। দুপুরের আমেজ আসতেই মেঘ জমতে শুরু করে দিয়েছে। এখনও সূর্য ঢাকেনি। নীলকান্তমণি জ্বলছে ওখানে। যেভাবে এগোচ্ছে মেঘ, বেশীক্ষণ আর জ্বলতে দেবে না।

আঙিনা কাঁপিয়ে নৃত্য চলছে। কোথায় পঞ্চরত্ন মন্দিরে যাবো, দেওধ্বনির উৎসব পুজোপাঠ দেখবো, দেওধার মধ্যে দেবতার আবির্ভাব—ভর দেখে ধন্য হব, তা নয় ভূতুড়ে কাণ্ড দেখতে হচ্ছে

বেরোবার মুখে। এ যেন অনিচ্ছায় তেতো গেলা।

দু'দিন ধরে কত না প্রস্তুতি চলছে আমাদের, এই দিনটি পবিত্র মনে উদ্‌যাপন করবো। সেটা বুঝি পণ্ডশ্রম হতে বসেছে। আমার ভেতরে একটা অশুভ আঁচ পাচ্ছি। এরা যদি সত্যি সত্যি দেওধা হত, এখানে কেন—পঞ্চরত্ন মন্দিরে তো যাবে।

আজে-বাজে নাচ দেখে দরকার নেই, বেরিয়ে পড়া যাক। বললুম তীর্থনাথকে। উনি বললেন, একটু অপেক্ষা কর। এখানে যখন এসেছে ওরা, বেরিয়ে যাওয়াটা মোটেই সমীচিন হবে না, সবই বুঝতে পারছি আমি। তোমার আজ ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষা। খুব সচেতন থাকবে। নিজেকে বিবেকের শক্ত লাগামে সংযত রাখবে।

আমি বললুম, উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে পরীক্ষায় যথেষ্ট তৃপ্তি। ভণ্ডদের কাছে আবার কিসের পরীক্ষা ? আপনার যত সব—আমার দ্বারা পরীক্ষা-টরীক্ষা দেওয়া চলবে না।

আমার কথাবার্তার ধরন-ধারণে ফিক করে হেসে ফেলে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, মা, তন্ত্রের শ্রেষ্ঠ সাধনা চরম সাধনা কুলাচার। কুলাচারী হতে গেলে জীবনে অনেক পরীক্ষা এসে হাজির হবে। হাসিমুখে মাথা পেতে নিয়ে নিজেকে তৈরী করে তুলতে হবে অভিজ্ঞতার মানুষ হিসেবে।

তীর্থনাথ ফিরে তাকালেন আমার দিকে। দেখছেন। কথাটা আমার মনে ধরেছে কিনা। আবার বললেন, তলোয়ারের ওপর নাচা আর বাঘের গলা জড়িয়ে ধরে খেলা করা তো সহজ কুলাচারের পরীক্ষার কাছে। তন্ত্রে শিবের উক্তি এটা।

আমার ভেতর গুনগুন করে গেয়ে উঠল। ছোটবেলায় শেখা অতুলপ্রসাদের গান। মা বড় শুনতে ভালোবাসতো আমার মুখে। বাবাও। মা-বাবার দু'জনেরই খুব প্রিয়।—'আমারে ভেঙে ভেঙে কর হে তোমার তরী, যাতে হয় মনোমত তেমনি করে লওহে গড়ি।'

গানের ভাষার সঙ্গে আমি একাত্মা হয়ে যাচ্ছি, তন্ময় হয়ে যাচ্ছি। সহসা বাজ পড়ার আওয়াজ শুনলুম যেন। আমার

সর্বশরীর কেঁপে উঠে দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। কি কষ্ট! স্বর্গ থেকে পাতালে আছড়ে পড়লুম বুঝি। নাচিয়েদের মাঝখানের লোকটি থরথর করে কাঁপছে অসম্ভব। অনবরত বুক-পিঠ-মাথা ঘোরাচ্ছে দুলে দুলে। মুখ ভর্তি থুথু। দু'কষ বেয়ে গড়াচ্ছেও। লাল চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

ওদের দলের দু'জন শক্তসমর্থ জোয়ান-মরদ চীৎকার করে বলে উঠল, 'সকলে সাবধান। ভর হয়েছে।' কেন জানি না এসময়টায় আমি বড় অসহায় বোধ করছি নিজেকে। এমন আমার সবসময় হয় না কিন্তু।

তীর্থনাথ এসে পাশে দাঁড়ালেন। ওঁর চোখে ভবসাব ছোঁয়া। মাঝের লোকটি কর্কশ গলায় আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বীভৎস মুখে বলল, বেহুলার লোহার বাসব-ঘরে যে কালনাগিনী ঢুকে লখিন্দরকে শেষ করেছিল, ওই—ওই মেয়েই সেই। ও এবাড়ির সকলকে শেষ কববার জন্য এসেছে। তীর্থনাথকে আর প্রণবকে—বাপ ছেলেকে আগে, পরে অন্যদের। ওর চেহারায় কেউ ভুল করিস না। আমি পরিষ্কার দেখছি সোনার ঘড়ায় বিষ ও। ও বিষ, বিষ বিষ·· ।

আমি দু'কানে হাত চাপা দিয়ে বসে পড়লুম। মাথা ঝিমঝিম করছে, চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসছে। দুটো কানে তালা লাগছে বাড়িসুদ্ধ লোকের 'বিষে'র আওয়াজে।—আমি কি সত্যি-সত্যিই বিষ—কালনাগিনী? কানের কাছে মুখ এনে মিষ্টি সুরে কে যেন বললেন, না, না। তুমি তা হবে কেন? এত ছোট করে দেখছো কেন? ওরা নকল, ওরা আসল দেওধা নয়। মহামায়া এরকম দুষ্টু আধারের মধ্যে—পবিত্র আধার ছাড়া ভর করেন না।

যিনি এসে দাঁড়ান পাশে—আমার সকল দুঃখ বেদনায়, সেই তীর্থনাথই সান্ত্বনার বাণী শোনালেন আমাকে। মনকে উঁচুতে রাখতে নির্দেশ দিলেন, নীচে নামাতে নিষেধ।

এর পর আশ্রমে আমাকে নিয়ে ভুলকালাম। তীর্থনাথ মোহমুগ্ধ

হয়েছেন আমার রূপে। আমি ডাইনীবিদ্যা জানি, আমি বশীকরণ করেছি বাপ-ছেলেকে। সবটাতেই বাপ-ছেলে আমার পক্ষ নিচ্ছে। স্ত্রীর দিকে দেখে না মার দিকে দেখে না। মেয়ের দিকে লক্ষ্য নেই, বোনের দিকে নজর নেই। আমার নির্যাতন তবু ছিল ভালো। অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল তীর্থনাথ আর প্রসূনের ওপর উৎপীড়ন দেখে। ওদের সঙ্গে কথা বন্ধ করেছে সকলে। চতুর্দিকে ভক্ত-শিষ্যদের কাছে কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। এই রটনার পালের গোদা যারা, তারা পূর্ণা-কান্তা অবনী-বিপিন মানদা-গোকুল। এরা করলেও করতে পারে। সবচেয়ে আমার কাছে অসম্ভব লেগেছে কিরণশশীকে ওদের সমর্থন করতে দেখে।

সারাক্ষণ তাঁর চোখের পাতা ভিজেই রয়েছে। মনঃকষ্টে কালিবর্ণ। দিনরাত হা-হুতাশ—তুষারকণার খপ্পরে স্বামী-ছেলে। আমার চরিত্রে কলঙ্কের দাগ দিতেও কসুর করেনি কেউ। কিরণশশীর স্বামী কেড়ে নিয়েছি ছেলে কেড়ে নিয়েছি—আমি নষ্ট মেয়ে।

শিরে বজ্রাঘাত হয়েছে আমার। তীর্থনাথের পায়ে ধরে অনুরোধ করেছি, আর আমার সাধন-ভজনে প্রয়োজন নেই। আপনি আমার পিতা আপনি আমার ইষ্টদেব আপনি আমার বিপদের কাণ্ডারী। আমার নাম জড়িয়ে আপনার দুর্নাম—অসহ্য। অদৃষ্টের হাতে দয়া করে এবার আমায় ছেড়ে দিন। অদৃষ্টেই আপনাকে পেয়েছিলুম, অদৃষ্টেই হারালুম! আমার ওপর আপনার অনেক আশা ছিল, আমি সবার মা হব। সকলের মঙ্গলের জন্যে অনেক কিছু করে যাব। আমার নিজেরও তো তাই ইচ্ছে ছিল। ভাগ্য বিরূপ।

প্রসূনকে বলেছি, সৌন্দর্যের পিপাসার স্তর থেকে তুমি স্বর্গের সুষমাস্তরে এসে পৌঁছেছ। নিজেকে সংযত করে, আমার মন বুঝে তোমার নিজের মনোভাব ত্যাগ করেছ। ইষ্টদেবী আর আমাকে অভিন্ন চোখে দেখেছ। তীর্থনাথ আর তুমি মায়ের আসনে আমাকে বসিয়ে মা বলে ডেকেছ। তবু যাদের মন নোংরায় ভর্তি, তারা এই পবিত্রভাবকে নিজের মনের মতো করে দেখছে কেবল। তোমাদের

যশ মান বংশের গৌরব বজায় রাখার জন্যে জিদ না ধরে আমায় যেতে দাও।

বিদায় নেবার কথায় নিরুত্তর থেকেছেন যেমন তীর্থনাথ, তেমনি নির্বাক মুখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকেছে প্রসূন। এই দু'জন ছাড়া আমার যাবার কথায় সকলেই খুশী। যাবার দিনে বাধ সাধলেন প্রথমে তীর্থনাথ, পরে প্রসূন। তীর্থনাথ বলেছেন, আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে শ্রীঅর লামার কাছে রেখে আসি। নিরাপদ আশ্রয়. নির্বিঘ্নে তোমার সাধনার সিদ্ধিলাভ হবে। লামা আমার চেয়ে অনেক গুণী অনেক অভিজ্ঞ। যা হয় ভালোর জন্যে। এখানকার এই অশান্তি তোমাকে ভবিষ্যতে অনেক বড় করে তুলবে। এটার প্রয়োজন ছিল। মহামায়ার দান হিসেবেই এটাকে তুমি গ্রহণ করবে।

প্রসূনও একা ছাড়তে রাজী নয়। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আচমকা বাড়ির আবহাওয়া পাল্টে গেল। ওদের আমার সঙ্গে যাবার যাদু মাখানো কথায়।

কিরণশশী এলেন। আমাকে যেতে দেবেন না। কান্তা-পূর্ণা এসেও আমার হাত ধরে কি কান্না! —ছেড়ে যাওয়া মোটে চলবে না। মানদা-গোকুল এসে আছড়ে পড়ল পায়ে। এ-পায়ে একজন ও-পায়ে একজন। —জননী কেমন করে সন্তানকে ছেড়ে যায় একবার দেখি।

এতদিন ছিলুম এখানে, প্রায় বছর দুয়েক। এদের ভালোবেসেছি, আপন ভেবেছি, ন্যায়-অন্যায় ভুল বোঝাবুঝি এ তো হয়েই থাকে। তা'বলে ভালোবাসায় ঘাটতি পড়বে কেন? মনে পড়েছে আমার আগেকার কথা, কিরণশশীর বুকে টেনে নেওয়া। কৃতজ্ঞতায় আমার দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে। প্রথম দিনের মতো, দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার পর যে ভাবে আমি ওঁকে পেয়েছিলুম, সেই ভাবে যেন আবার ফিরে পেলুম। শুনেছি, কান্নার জলে ভেতরের ময়লা ধুয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে বেরিয়ে যায়। আমি জানি আমারও বেরিয়ে গেছল। অতীত ভুলে গেছলুম সম্পূর্ণ। কি হয়েছে, কি না হয়েছে। কিন্তু কারও যে

ময়লা ধুয়ে যায়নি, প্রমাণ হয়ে গেল পরে।

মাস দেড়েক কেটে গেছে। শরতের আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। শুক্লপক্ষের আধখানা চাঁদে মিঠে জোছনা। সকলের মনে একটা পুজোর আমেজ। বছর ঘুরে আসবার পর দেবী দুর্গা আসছেন আবার। ছেলে বুড়ো সকলেরই চোখে মুখে একটা নিবিড় আনন্দের পরশ। প্রতি বছরই পুজো দেখি আমি। মূর্তি নয়। কামাখ্যা দেবীর চলন্তা মন্দিরে দেবী দুর্গার পটে আঁকা ছবি। দশমী পুজো শেষে এই মূর্তিরই বিসর্জন হয় ব্রহ্মপুত্রে।

বিসর্জনের পর মনে হয়, প্রকৃতই জননীহারা হয়ে গেলুম। তীর্থনাথ বলেছেন. নিজের ভেতরের শক্তিই দেবী। ভেতরের নিশ্বাস ফুলে এসে পড়েছে যখন, সেই ফুলেই দেবী এসেছেন ঘটে জীবন্ত হয়ে। আবার বিজয়ায় সেই ফুলের আঘ্রাণে অন্তরের দেবী অন্তরেই প্রবেশ করেছেন। দেবী হারিয়েছেন ...? তিনি সবার মধ্যে। জলে স্থলে শূন্যে তেজে বাতাসে—অনু-পরমাণুতে পর্যন্ত। যা কিছু দৃশ্য যা কিছু অদৃশ্য সবেতে।

পুজোর সময় এলে সৌরভ আমাকে বেশী করে ডাকে যেন আরও। এতদূর থেকেও সে ডাক আমি শুনি। প্রবল দেখার ইচ্ছে। তীর্থনাথ বলেছেন, সাধনমার্গে পৌঁছেও তোমার ওই আশাটাই মাঝে মাঝে চঞ্চল করে তোলে। কিছু ভেব না, দেখার আশা নিশ্চয় মিটবে। মন স্থির কর। ওর সঙ্গে দেখা না হলে তোমার সাধনা সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে না। দেখেছিলুম তীর্থনাথকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে।

পুজোর অষ্টমী। অষ্টমী পুজোয় দেবীর উদ্দেশ্যে জ্যান্ত রুই মাছ বলি দেওয়া হল কামাখ্যা দেবীর বলিঘরে। দিনের বেলায় গেছি,

দেখেও এসেছি। কান্তা-পূর্ণা ওরাই উদ্যোগী হয়ে আমায় নিয়ে গেছে। ওদের বলির রক্ত দেখতে ভালো লাগে। আমি কিন্তু নিজের প্রবৃত্তির সঙ্গে মেলাই, এক একটা পশুবৃত্তিকে বলি দিতে দেখি।

অষ্টমীর শেষ রাত্তিরে—ব্রাহ্ম মুহূর্তে আবার আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে বলিঘরের সামনে। বলিরঘর কাপড় দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। ভেতরে একা পুরোহিত ঠাকুর ত্রিশূলিনী পুজো করছেন। অন্যের দেখা প্রবেশ নিষেধ।

·· পুরোহিত ঠাকুর দেবীর প্রসাদী ফুল দেবার পর কপালে ছুঁইয়ে আশ্রমে ফেরার পথে পা বাড়িয়েছি, হাত ধরে অন্যপথে টেনে নিয়ে গেল কান্তা। এক নতুন বড় সাধু এসেছে নাকি। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সকলের সব কিছু বলে দিচ্ছে। অদ্ভুত ক্ষমতা।

আমি হেসে ফেলেছিলুম। গুণীবাপের এমন বোকা মেয়েও হয়। কথায় বলে, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। এও ঠিক তাই। বললুম, তীর্থনাথের চেয়েও বড় ?

পূর্ণা হেসে বলল, তুমি বাবার অন্ধভক্ত। বাবার বাবা কি থাকতে নেই ? দেখতে দোষ কি ?

হ্যাঁ, দেখতে দোষ কি। আমি বিশ্বাস করি না করি, দেখার কৌতূহলটা আমার বরাবরের। ওদের সঙ্গে আমিও গেছি ভুবনেশ্বরী পাহাড়ে। দেখেছি বীভৎস দর্শন পুরুষ। ওখানকার হাওয়াটাও কেমন ভারী ভারী। কথাবার্তার ছিরিছাঁদ নেই, অসংলগ্ন। দাঁতে সাত পুরু শ্যাওলা। আমার গা ঘিনঘিন করে উঠল, শাড়ির আঁচল নাকে চাপতে বাধ্য হলুম। পেটগুলিয়ে বমি আসছে। মাথার মধ্যে কেমন অস্বস্তি। লোকটার নিশ্বাসে উগ্র তরল-গরলের দুর্গন্ধ। আমার নাম ধরে ডেকে বলেছিল, সাধন ভজন তুই উঁচু মার্গে উঠতে চাস ? অনেক জিনিস তুই পাবি আমার কাছে, তুই আসবি। কোন কথা কইনি আমি। আমার মন চায়নি প্রণাম করতে, করিনি, উঠে এসেছি। পূর্ণা-কান্তা ভক্তিতে গদ গদ। পাঁচ-ছ'বার পায়ের বুড়ো আঙুলে কপাল ঘষেছে। আসবার সময় দু'জনে দু'কানের গোড়ায়

ফিস ফিস করে কি বলেছে। ও মানুষ হেসে উঠেছে হো-হো করে। আস্তে আস্তে বলেছে, ভাবছিস কেন? আমি তো আছি।

বুঝলুম না কান্তা-পূর্ণার কিসের এত ভাবনা! যাক, ও নিয়ে আমি অত মাথা ঘামাই নি ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে। পথে কান্তা হেসে কুটি কুটি। নিজেই বলল, তুষারকণাদি, ভাবতে বারণ করেছে কেন? তোমার কি মনে হয় বল দিকিনি?

আমি রহস্য করে বলেছি, মনই নেই যার, তার কি মনে হয়— জানবে কেমন করে?

পূর্ণা হেসে ঢলে পড়ল কান্তার গায়ে। বলল, তুষারকণাদি আমাদের কি সুরসিকা! তামাশার মধ্যে ছাখ কান্তা কত উঁচুস্তরের কথা! কত আধ্যাত্মিকতার কথা! কি জ্ঞানের শিক্ষার কথা বল!

কান্তা বলল, এ দুনিয়ার থেকেও তুষারকণাদি অন্য দুনিয়ার মানুষ হয়ে রইল। আমাদের হেঁয়ালি-প্রশ্ন ও বুঝবে না রে, খুলেই বল না বাপু!

কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বলল· তুমি তো বুঝতেই পারছ—কান্তার ব্যাপারটা। অবনীটা 'বিয়ে করব বিয়ে করব' বলে বড্ড সময় নিচ্ছে।

কানপেতে শুনে, আঁচলটা কোমরে পাক দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে নীচু হয়ে হাত নেড়ে বলে উঠল কান্তা, আ—হা—হা—হা, বেশ তো বলা হচ্ছে আমার কথাটি। নিজের বেলায়! তবে বলি শোন, আমার চেয়ে উনিই বেশী অস্থির হচ্ছেন। যত দেরী অবনীদাই বুঝি করছে? যত দোষ নন্দ ঘোষ! বিপিনদা করছে না? তুই বলিস নি পূর্ণাদি?

আশ্রম বাড়িতে ফিরতে একটু বেলা হয়েছে। রোদ্দুরের তেজও বেড়েছে। বাইরের দরজায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রসূন। আমাকে দেখেই শশব্যস্ত হয়ে উঠল। ওর মুখখানাও বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। গলার স্বরটা বেশ ভারী। বলল, তুমি কি ভেবেছ বল দেখি? আমাকে না ভাবিয়ে কি তোমার শান্তি-সুখ নেই? এতক্ষণ ধরে গেছলে কোথায়

না বলে কয়ে ?

আমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, তুমিও শয়তানী ছুটোর সঙ্গে গেছ ! আমি দৌড়তে দৌড়তে আসছি তোমাকে সব বলার জন্য। আমি খবর পেয়েছি, ভুবনেশ্বরী পাহাড়ে শূর্পনখ কাপালিক এসেছে। আমি আর বাবা নাকি মোহমুগ্ধ। তোমার মোহ থেকে মুক্ত করবার জন্য কান্তা-পূর্ণা বিপিন অবনী মা সবাই ধন্না দিচ্ছে কাপালিকের কাছে। যাতে তোমার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ হয়। আর ওদের সঙ্গেই তোমার এত বন্ধুত্ব !

কাপালিক কথা দিয়েছে, সে চেষ্টা করবে। কাপালিক-সাধনায় যত ক্রিয়াকলাপ আছে, তা দিয়ে সে চেষ্টা করবে তোমার হাত থেকে এ-সংসারকে বাঁচাতে। প্রয়োজন হলে সে আরও চরম ক্রিয়াও করতে পেছপা হবে না নাকি। মারণ। পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে তোমায়। এক নিশ্বাসে সব কথা বলে একটু দম নিয়েছে প্রসূন।

অসহায় চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আপসোসের সুরে বলেছে, আচ্ছা তুষারকণা তুমি কি ? যোগসাধন ধ্যানধারণা—সবই যে তোমার ব্যর্থ। মানুষের ভেতর চিনতে এখনও পারলে না !

আস্তে আস্তে বলেছি আমি, তুমি স্থির হও, তুমি ঠাণ্ডা হও। তীর্থনাথই তো আমাকে বারবার বলেছেন, মানুষের খারাপ দিকে নজর দিতে দিতে ভাল মানুষও খারাপ হয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের খারাপ দিকটা দেখতে আমার ইচ্ছে করে না। মারণ করুক না। তোমরাই তো বল আত্মার মৃত্যু নেই। দেহ মরে গেলে আমি তো আর মরে যাবো না।

চটে উঠেছে প্রসূন। বলেছে, থামো ! অত বড় বড় কথা কইতে হবে না। বিপদ উপস্থিত, সাবধান হওয়া এটা ধর্ম, তোমায় মানতেই হবে। ভবিষ্যতে ওদের কোন কথায় ভিজবে না, কোথাও যাবে না। আমি বলেছি, লজ্জায় তোমার কাছে, বাবার কাছে বলতে পারে না ওরা। ওদের বিয়ের—। প্রসূন বলেছে, এ সব বানানো কথা। দুরাত্মার নানা ছল, চেনা ভার !

বলতে গেলে রোজই কানে মন্ত্র পড়ার মতো আমাকে সূর্পনখের কথা শুনিয়েছে, কখনও কান্তা কখনও পূর্ণা। তীর্থনাথের মতো সূর্পনখও নাকি আমার মধ্যে অনেক কিছু দেখেছে। তার গুরুদত্ত জিনিস আমাকে না দিয়ে মরেও শান্তি নেই। ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে এসেছে কামাখ্যায়। এ ঋণ জন্মান্তরের। ঋণমুক্ত না হয়ে স্বস্তি নেই। রোজ অন্তত একবারটি করে আমি যেন যাই তার কাছে। আমার পাওনাগণ্ডা যাতে বুঝে নিই, অযাচিত এই উপদেশ দিতেও ছাড়েনি দুই বোন।

তীর্থনাথ বকেছেন মেয়েদের। সূর্পনখের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন! সূর্পনখের কোন কথা আমার কানে তুলতে মানা করেছেন। প্রসূনও ধমকের সুরে, আমার ঘরে যাতে না আসে ওরা—কড়া হুকুম-জারী করেছে। কিছুতেই কিছু হয় নি। ওরা আসবেই, আমাকে শোনাবেই। সূর্পনখের কাছে যেতে বলবেই। প্রতিদিন শুনতে শুনতে আমার জিদ বেড়ে উঠেছে। মানুষটাকে গিয়ে আচ্ছা করে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে আসব। জিদের বশে আমি সমস্ত সাবধানবাণী ভেঙে চলে গেছি।

কান্তা-পূর্ণার সঙ্গে এসেছি ভুবনেশ্বরী পাহাড়ে। পরিবেশ ভালো লাগে নি, মানুষটাকেও ভালো লাগে নি। আগের চেয়ে আরও বিকট চেহারা। মরতে কেন এলুম! চলে যেতে ইচ্ছে করছে। আশ্চর্য, আমার স্নায়ু অবশ হয়ে আসছে। সূর্পনখের প্রথম প্রশ্ন-হঠাৎ এত ভয় পেয়ে গেলি কেন? এরা তো তোকে আর বলি দিতে নিয়ে আসে নি। কি দেখে ভয় পেলি? আমাকে দেখে, না এই খাঁড়ায় মাখানো রক্ত দেখে? চুপ করে রইলি কেন?

আমি মৌনমুখে বসে আছি। নীরব-নিস্পন্দ।

সূর্পনখ বলে উঠল, কই, কোন কথার উত্তর দিলি না তুষারকণা? প্রশ্ন করা, মানুষের ভেতরের কথা জানার একটা ধারা আছে। এরকম উদ্ধত অভদ্রতা সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল।

শিথিল স্নায়ু সবল হয়ে উঠেছে আবার। দুঃসাহসী অফুরন্ত শক্তি জেগে উঠেছে। ধমকের সুরে আমি বলেছি, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।···কেন বারে বারে ডেকে পাঠান? কি উদ্দেশ্য?

ক্ষেপে উঠেছে সূর্পনখ।

আমাকে শাসিয়েছে,···জিভ অসাড় হয়ে যাবে। বাকরোধ হয়ে যাবে। প্রাণে না বাঁচতেও পারি—সে ভয় দেখাতেও ছাড়েনি, ওর শক্তিতে তীর্থনাথ নাকি কিছু না। ওর রোষ থেকে তীর্থনাথের রক্ষে করার ক্ষমতা নেই কোন।

সমস্ত শুনে তীর্থনাথ সান্ত্বনা দিয়েছেন আমায়। শাস্ত্রের শ্লোক তুলে দেখিয়েছেন—কাপালিকদের অসার তর্জন-গর্জন। সদা-সর্বদা তীর্থনাথ নিজের মন দিয়ে আমার মনকে আগলে রেখেছেন। নিজের সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে আমার চলার গতি লক্ষ্য রেখেছেন।

মাঝ রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে ঘুম ভেঙেছে আমার। শুনেছি, সূর্পনখের পিশাচে ভর করা কণ্ঠস্বর—আমায় ডাকছে। অতদূর থেকেও কেমন করে বাতাসে ভেসে আসছে, বুঝতে পারি নি।—কেন দেখতে চেয়েছিলাম কেন ডেকেছিলাম তোকে, জানতে চাস তো চলে আয় এখুনি। চলে আয়, চলে আয়। কি দুর্বার আকর্ষণ!

ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছি আমি বিছানায়। এ আকর্ষণ আমাকে ভুবনেশ্বরী পাহাড়ে নিয়ে যাবেই। আমি শুয়ে পড়েছি ফের, দু'চোখে ঘুম নেমেছে। পরের সকালে নতুন সূর্যের আলোয় ঘুম ভেঙেছে। এ-সমস্তই একটি লোকের প্রাণঢালা করুণার স্পর্শে। বলেছেন তীর্থনাথ, আমি আছি। তীর্থনাথ একাধারে আমার মা, একাধারে আমার বাবা!

জ্বর-বিকারে, তখন ন-দশ বছর বয়স। আমি নাকি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যেতুম। মা-বাবা এভাবেই আমাকে ঘর থেকে বেরোতে দিত না। আসলে ধরে রাখত। মা তো বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকত। মায়ের ধাত আমাতে বর্তে ছিল। সৌরভের

অসুখে আমিও মাকে অনুকরণ করেছি, জ্বরেতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে নি। বুকে চেপে ধরে শুইয়ে রেখেছি।

শুক্লপক্ষের অষ্টমীর শেষে ত্রিশূলিনী পুজো দেখে ভুবনেশ্বরী পাহাড়ে গেছি আমি কান্তাদের সঙ্গে। তারপরেও গেছি আর একবার। সেটা কৃষ্ণপক্ষ, বোধহয় সোমবার। মঙ্গলবার থেকে সূর্পনখের নিশিব ডাক শুরু হয়ে গেল। প্রসূন বলেছে, সূর্পনখ তোমায় আকর্ষণ-মারণ করেছে।

যাই করুক, তীর্থনাথের কষ্ট আমি আর সইতে পারছি না। আজ দিন পনেরো ধরে ওঁর চোখে ঘুম নেই। উনি আমার রাতের প্রহরী। এইভাবে আর ক'টা দিন চলতে থাকলে একটা মহাপ্রাণ খোয়াব কি শেষে! আমার প্রাণ থাকলেই বা কি গেলেই বা কি! তীর্থনাথের চোখে আমি ওঁর চেয়ে উঁচুরও উঁচুতে। ভবিষ্যতের কথা তুলে রেখে বর্তমানের সমস্যার সমাধান করাই যুক্তিযুক্ত।

রাতের ঘুম ভাঙানো ডাক পনেরো দিন হতে চলল। আর কত দিন আমি এ যন্ত্রণা সহ্য করব? কত দিনই বা কেন, তীর্থনাথের সঙ্গে এর একটা ব্যবস্থা করে ফেলা উচিত আজই। তীর্থনাথের আদেশ অমান্য করি নি। উনি বাইরে থেকে ঘুমোতে বললে, আমি ঘুমোই। আজও বলেছেন। কিন্তু আজ ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। একই অধ্যায় রোজ চলতে দিতে পারি না আমি।

কামাখ্যা পাহাড় ঘুমে অচেতন। চতুর্দিক নিস্তব্ধ-নিঝঝুম। আমাদের আশ্রমে জেগে আছে দু'টি প্রাণী। ঘরের ভেতর আমি আর বাইরে তীর্থনাথ। চৌকি থেকে আস্তে আস্তে নামলুম। সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়েছি, তীর্থনাথের মুখোমুখি, উনি অবাক।

—বেরিয়ে এলে যে?

—মরণ যদি থাকে কপালে আর একজন মরবে কেন আমার

জন্যে? যাঁর জীবন বাঁচলে অনেক জীবন বাঁচবে, তাঁকে আমি যেতে দিতে পারি না কিছুতেই।

তীর্থনাথ হাসলেন একটু। বললেন, রাত্তিরটা ঘুমিয়ে নাও তো, ঘরে যাও।

—আমি তো রোজই ঘুমোই। একনাগাড়ে জেগে চলেছেন আপনি। আজ নাই বা ঘুম হল। আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারেন? নিজে নিজে বাঁচবার কোন উপায় কি নেই? সেরকম কিছু থাকলে, এ কষ্টের লাঘব হবে আপনার। আমি সেটাই চাই।

খানিক দাঁড়িয়ে উনি কি ভাবলেন। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন পুজোর ঘরে। যেখানে ওঁর ইষ্টদেবী ষোড়শীযন্ত্র রূপোর সিংহাসনের ওপর তামার পাতে খোদাই করা রয়েছে।

যন্ত্রের সামনে যজ্ঞের আগুন জ্বলে উঠল। সামনে বসিয়ে বললেন, কাপালিক কি ক্রিয়াকর্ম করছে দেখে নাও আগে। তারপর নিজের আত্মরক্ষার ক্রিয়াকাণ্ড শিখে নেবে।

আমি বিস্ময়ের চোখে দেখছি, আগুনের লকলকে শিখার ভেতর ফুটে উঠেছে একটা স্পষ্ট ছবি। ভুবনেশ্বরী পাহাড়ের সেই জায়গা। মড়ার ওপর বসে, সূর্পনখ। ওর সামনে হোমের আগুন জ্বলছে। নতুন মাটির সরায় কালীযন্ত্র আঁকা। তারই ওপরে এক একটা জ্যান্ত পায়রার গলা ধরে ছিঁড়ে ফেলছে। সেই রক্ত যন্ত্রের ওপর টপ টপ করে পড়ছে। রক্ত খাচ্ছে নিজে, চারধারে ছুঁড়ছে। পরপর তিনটে পায়রা এভাবে বলি হল। কুকুরের দাঁতের মালাটা হাতে করে ঘোরাচ্ছে। দু'কষ বেয়ে রক্ত ঝরছে। নরক থেকে নরখাদক উঠে এসেছে যেন। দু'হাত থরথর করে কেঁপে উঠেছে। আর সেই কাঁপা হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে আমার নাম ধরে ডাকছে। আমি দু'চোখে হাত চাপা দিয়েছি। আমার মাথাটা কেমন করে উঠল। আর দেখতে পারছি না।

বেশ বুঝতে পারলুম, ঠাণ্ডা হাতের পরশ লাগছে মাথার মাঝখানে—ব্রহ্মতালুতে। সমস্ত শরীর শান্ত-স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

চোখ খুললুম আমি। তীর্থনাথ বললেন, কালীযন্ত্র মঙ্গলময়ী, সেখানে মঙ্গল প্রার্থনাই নিয়ম। সূর্পনখ অন্যের মৃত্যু প্রার্থনা করে মস্ত ভুল করছে। নিজের ক্ষতি নিজেই ডেকে আনছে। এরপর ঘরে রাখা কামেশ্বরী দেবীর ছবির দিকে তাকিয়ে তীর্থনাথ বললেন আমায়, ছবিটি মাথায় বুকে আর নাভিতে ধ্যান কর। ছবির মূর্তির মর্ম বুঝে নাও, বলছি আমি।—সিংহ পালনী শক্তির প্রতীক—স্থিতির রক্ষক বিষ্ণু। তার ওপর শিবমূর্তি—লয়ের প্রতীক। তাঁর নাভিপদ্মে লাল পদ্ম, লয়ের পর সৃষ্টির বিকাশ—ব্রহ্মা। তার ওপরে দেবী কামেশ্বরী। তিনি নিজেই সৃষ্টি স্থিতি লয়, আবার সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ওপর তিনি আত্মশক্তি। সকলের ভেতরের আত্মা পৃথিবীর আত্মা—মহাশূন্যের আত্মা। আত্মার কেউ কখনও অনিষ্ট করতে পারে না। আত্মাকে কোন কিছু স্পর্শ করে না। আত্মা জলে ডোবে না আগুনে পোড়ে না। আত্মাসাধনায় তুমি একমাত্র কাপালিকের হাত থেকে নিজেকে রক্ষে করতে পার। তোমার আত্মাসাধনায় সূর্পনখের মারণক্রিয়া সূর্পনখের কাছেই ফিরে যাবে।

বলতে বলতে চুপ করে গেলেন তীর্থনাথ। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি, শক্ত লাগছে?

আমি বলেছি, খুব ভালো লাগছে। আপনি থামবেন না, আপনি বলে যান।

তীর্থনাথ বলেছেন, ধ্যানের চোখে দেখবে মহাশ্মশানে তুমি একা। হলুদ রঙের চতুষ্কোণের ওপর ত্রিশূল পোঁতা। খানিক তফাতে নীলরঙের গোলের মধ্যে দ্বিতীয় ত্রিশূল। তৃতীয়টি লাল ত্রিকোণের ওপর। ত্রিশূলের ওপর তোমার দেহ। এটা তোমার স্থূল শরীর। যেখানে ইচ্ছা তার ক্রিয়া আর জ্ঞানের প্রকাশ চলছে অবিরাম। এটি স্থূলদেহের প্রকাশ। তাই ত্রিশূলের ওপরে তোমার স্থূল দেহ। তার নাভির দেহপ্রমাণ লাল পদ্মের ওপরে তোমারই আর একটি দেহ শুয়ে আছে। এটি তোমার স্থূল দেহের ওপর সূক্ষ্ম দেহ। এ-দেহের মানুষ-প্রমাণ নীলরঙের নাভিপদ্মের ওপর আর এক তুমি। এটি তোমার

কারণ দেহ। কারণ দেহে শ্বেত নাভিপদ্মের ওপর চতুর্থ তুমি। তোমার মহাকারণদেহ। এ দেহ জ্যোতির্ময়। এর বুকের কাছে অদৃশ্যলোকের জ্যোতি এসে ঝরে পড়ছে। দেহের জ্যোতি আর অদৃশ্যলোকের জ্যোতি ছুটি মিলেমিশে মহাজ্যোতির সৃষ্টি হচ্ছে। এখানে তোমার শরীর-রিপুর সমস্ত ক্রিয়াকলাপ নিষ্ক্রিয়। শরীর-রিপুর তুমি উর্ধ্বে। তুমি আত্মা।

আত্মাসাধনার নির্দেশ পাবার পর, আমি একাগ্রতা নিয়ে এই সাধনায় নেমেছি। এই ধ্যান করতে করতেই রাতে ঘুমিয়ে পড়েছি, আর কোন ডাক শুনি নি। ঘুমও ভাঙেনি মাঝরাতে আর।

দিন সাতেক পর সূর্পনখের অবস্থা জানিয়েছে এসে কান্তা। সূর্পনখ দারুণ অসুস্থ। অবোল হয়ে গেছে। কথা বলতে পারছে না। দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। ইশারায় দেখাচ্ছে কেবল, এযাত্রা রক্ষে পাবে না সে আর কোন রকমে। তোমার উদ্দেশ্যে জোড়হাত করে বার বার ক্ষমা চাইছে।

তীর্থনাথকে বলেছি আমি। গম্ভীর মুখে বলেছেন উনি, এ তো জানা কথা। নিজের খোঁড়া গর্তে নিজেকেই পড়তে হয় শেষে। মানুষটা মরে যাবে তার হেতু আমি। বিবেকের দংশনে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। দেখতে গেছি সূর্পনখকে, চোখের জল চাপতে পারিনি কষ্ট দেখে। বলেছি, মা আপনাকে সারিয়ে তুলুন। বধির হয়ে গেছে কিনা জানিনা সূর্পনখ, তবে শুনতে পেয়েছে মনে হল। দু'হাত জোড় করল দেবীর উদ্দেশ্যে। হয়তো বা ক্ষমা চাইল।

এই ঘটনার পর বাড়ির সবাই আমাকে আর বিষ নজরে দেখেনি। জানি না আত্মাসাধনার গুণে কি কোন্ পরশ পাথরের স্পর্শে হঠাৎ ওদের মন সোনা হয়ে উঠেছে। [illegible]র ওপর থেকে বিপিন-অবনীরও আগের দৃষ্টি পাল্টাচ্ছে। ভক্তিনম্র চিত্তে এসে ওরা প্রণাম করেছে। কান্তা-পূর্ণা মানদা-গোকুলেরও অনুরূপ।

প্রথম বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলুম যখন, শুনেছিলুম কে যেন ডাকছে।

—চলে আয় চলে আয়। বুঝি বা মা কালীরই সেই ডাক আবার

শুনছি আমি। তীর্থনাথকে বললুম। তীর্থনাথ চোখ বুজে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর চোখ খুললেন। যেন কোন্ সুদূর থেকে ঘুরে এসেছেন, চোখের কোণ লাল, কিংবা ঘুম থেকে উঠেছেন সহসা।

আমার সম্বন্ধে কি যেন কি দেখলেন উনি, কি যেন কি বুঝলেন উনি। মৃদু হাসছেন। হাসতে হাসতেই বললেন, তোমাকে যেতে হবে তিব্বতে শ্রীঅর লামার কাছে। এখনও তোমার জন্যে অনেক অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছে। মানুষকে গড়ে তুলতে গেলে, নানান মনোভাবকে তৈরী করতে গেলে শিক্ষকের সব দিকটাই শিখতে হবে, জানতে হবে। নিজের সাধনায় নিজে ডুবে থাকাটা বড় কথা নয়, বড় কথা—অন্যকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে এগিয়ে দেওয়া।

এক সময় তীর্থনাথ আমাকে ছেড়ে দিতে চান নি। তখনও তিব্বতে যাবার কথা বলেছিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টি তাঁকে বলিয়ে ছিল। তিনি সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। পৌঁছে দিয়ে আসতে চেয়েছিল প্রসূনও। সেই প্রসূনও এসে বলেছে, এবার তোমায় একলা চলার পথে পা বাড়াতে হবে, মহামায়ার তাই ইচ্ছে। দেবী বিসর্জনের মতো হাসিমুখে সজলচোখে এরা সবাই আমাকে বিদায় জানিয়েছে। বিদায় জানালেও সবাই মন-প্রাণ থেকে আমায় বিদায় দিতে পারেনি। পথে নেমেও আমি শুনেছি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ। পেছু ফিরে দেখিনি আর। তবু মনে হয়েছে, পেছনের মানুষরা আমার সামনে এগিয়ে চলেছে। আমায় পথ দেখাচ্ছে।

…তীর্থনাথের নির্দেশ দেওয়া পথে আমি এগিয়ে চলেছি ধীরে ধীরে…। চলেছি। চলেছি। চলেছি।

একটা অদৃশ্য আকর্ষণ তিব্বতের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমায়। একটা অজ্ঞাত আনন্দ পথের দিশারী আমার। আচমকা থমকাল এ দিশারী, সারা শরীরে নেমে এলো রাজ্যের ক্লান্তি।

হাড়কনকনানি ঠাণ্ডা, তবু ঘাম ঝরছে, এমন ক্লান্তি। ক'জন যাত্রী সঙ্গে রয়েছে আমার। তীর্থযাত্রী হিসেবে পথে পরিচয়। ওরাও পথ চলার পরিশ্রমে খুব কাতর, আমারই মতো। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, পথ ভুল করলুম কিনা। আমরা ক'জন ছাড়া এ পথে আর একটা অজানা-অচেনা মুখ দেখতে পাচ্ছি না, তাতেই ভয়। যে জায়গাটায় মানুষের প্রাণ যায় অর্থ যায়, সত্যি সত্যি কি সেখানে এসে পড়লুম ?

মৃত্যু যদি আসে, যতখানি পথ এসেছি, ফিরলেও রেহাই পাব না। আর এগোলেও যে, সেই মানুষের কাছে—গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে পারব, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায় ? অথচ এগোবো না পেছুবো না—'ন যযৌ ন তস্থৌ'র মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকব বা বসে পড়ব—যে জায়গায় এসেছি সেটা আহাম্মুকি। একেবারে সম্ভব নয়। মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার পেতে পারব না এতেও।

চলছি।

টলে, বেহুঁশ হয়ে না পড়া পর্যন্ত চলতেই হবে। আর একটু সামনের দিকে আসতেই কি যেন পায়ে ঠেকলো। বিস্ময়ে ত্রাসে বুকের রক্ত হিম। একটা তরতাজা মানুষের নিষ্প্রাণ দেহ, পুরুষ। ভেতরের জাঙিয়া ছাড়া অঙ্গে একটা সুতো বলতে নেই। দেহে একটা নয়, অনেক আঘাতেরই চিহ্ন।

তীর্থনাথকে আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে। কামাখ্যার তীর্থনাথ। যিনি আমার জন্যে অনেক লাঞ্ছনা-অপমান সয়েও নির্বিকার-নির্লিপ্ত ছিলেন। এতটুকু বিচলিত হতে দেখিনি আমি এক মুহূর্তের জন্যে।

রাগ সংযম করতে গিয়ে আমি সময় সময় রাগেরই বশবর্তী হয়ে পড়েছি। মৃদু হেসে তিনি বলেছেন, উঁহু, অন্যের সাজলেও সাজতে পারে, তোমার এটা সাজে না একদম। কতবার বলেছি, ঘুমের আগে নিজেকে নির্দেশ দেবে—আত্ম-সম্মোহন—আমি ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হব, রাগ-দ্বেষের অধীনে থাকবে না আমার মন। নিশ্চয় না নিশ্চয় না।

মাথার মধ্যে এমন অনেক কিছুরই জ্ঞানের ভাঁড়ার পরিপূর্ণ। তবু কার্যগতিকে দেখেছি, আমি নিঃস্ব আমি ভিখিরী। তীর্থনাথের কথা নিলুম কই! তিনি আদেশ করেছিলেন আমায় তিব্বতে আসতে। তিনিই আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি মন্ত্র পড়ানোর মতো পাখি পড়ানোর মতো বার বার বলেছেন, অতি অবিশ্যি রাস্তা দেখে-শুনে চলবে বুঝেশুনে চলবে। ওখানে বরফের তলায় পাহাড়ের পেছনে গাছের পেছনে অনেক ভয়াবহ বিপদই লুকিয়ে আছে।

বোঝানোর পর আমার দু'চোখের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন খানিক তীর্থনাথ। তারপর ঘাড় নেড়ে বলেছেন, আমার পণ্ডশ্রম দেখছি। এমন ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছ কি? সেখানে থাকব না জেনো।

আমি বলেছি, আপনি থাকবেন না সত্যি। কিন্তু আপনার কথা আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে।

কই, সঙ্গে সঙ্গে তো থাকেনি। থাকেনি কেন—আমিই রাখিনি।

গার্বিয়াং দিয়ে আসছিলুম যখন, সকলকেই তো ভুলেছি। অমন চোখ কেড়ে নেয়া মন কেড়ে নেয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যে জানিনা কার কি হয়, তবে আমি নিজেকে হারিয়েছি। চতুর্দিকে যেন ফুলের শয্যা বিছানো। স্বর্গের নন্দন কানন। নানা রঙের নানা ফুলের একটা পবিত্র মিষ্টি সুবাস বাতাসে। এসেছে আমার ঘুমের ঘোর। ঘুমিয়েও পড়েছিলুম কিছুক্ষণ।

ঘুম ভেঙেছে সঙ্গের যাত্রীদের চেঁচামেচি আর হাসি হুল্লোড়ে। বয়েসের ভারে ভারী মহিলাটি হুল্লোড়ের প্রধানা। তিনি সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন, চোখের আঙুলের ইশারায় আমাকে দেখিয়ে,

ওমা এ আবার কি গো, এ যে ঘুমিয়ে পড়ল দেখছি! তোরা যাই বলিস না কেন, তুষারকণা মেয়েটি সত্যিই ফুলের মতো সুন্দরী। তবে ভয় করে কি জানিস, এদেশে আবার শুনছি তো রামবং বলে একটা ক্লাব আছে। ছেলেমেয়ের আড্ডা। পছন্দ করাকরি তারপর বিয়ে-থা। ওখানে আবার ধরে নিয়ে না যায়, তাহলেই তো গেছি। অল্প বয়সী মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল।

বলল, দিদিমা নিজের মতো জগৎ দেখছ কেন? তুমি যে আমাদের সবার চেয়ে সুন্দরী, একথা আমরা সবাই ভালো রকম জানি। তোমাকেই না তুলে নিয়ে যায় কেউ ওই রামবং-এর ক্লাবে। দেখছি তোমাকে সামলাতেই প্রাণান্ত হবে শেষে।

দিদিমা আনন্দে গদগদ হয়ে বলল, তা যা বলেছিস। তুষারকণা ফুলের বাগান দেখে ঘুমিয়েছে। কর্তা আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। আমার কদর আর কে বোঝে বল্! গলা ধরে এলো দিদিমার, চোখের কোণে জল টলমল করে উঠল। সে মানুষ আর নেই, আসবেও না। চিতাভস্ম ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে চলেছি মানস সরোবরে দেব বলে। সারা জীবন যে মানুষ আমাকে মর্যাদা সম্মান দিয়ে গেছে, আমার রূপগুণের মাহাত্ম্য প্রচার করে গেছে— আমার মোহে তার আত্মা আমার পেছু পেছু ঘুরুক, আমি চাই না। তার মুক্তি হোক।

একদিকে আনন্দ একদিকে দুঃখ মিলেমিশে একাকার হয়ে দিদিমার দু'চোখে মানস সরোবরের প্রবাহ, ঢেউ তুলে উঠতে দেখলুম আমি—মানস সরোবরে না গিয়েও।

লিপুপাশের আগে যখন এসেছি, তখন মরণাপন্ন অবস্থা হয় সবার। কি ঠাণ্ডা! ভাবলুম, মানস সরোবরে যাওয়া আর হল না। অনেক আশা ছিল অনেক কিছু পাব সেখানে, তা আর এ জীবনে হল না। মনে পড়ল কালপানির কথা। কালী নদী বয়ে চলেছে তলা দিয়ে। পা পিছলে পড়লে সেখানেও মরনের কোলে লুটিয়ে পড়তে হত। দূরের গুহাতে বরফের কতো মানুষ এখনো শুয়ে

রয়েছে। আমাদের মতো তারাও তো একসময় যাত্রী ছিল। বরফ বৃষ্টিতে আজ তারা বরফের মানুষ।

নির্পানিতে যখন এলুম, হাড়ে হাড়ে জেনেছি নামের মানে। ছিটেফোঁটা জল নেই কোথাও। নেই কোন বসতি, নেই কোন প্রাণের চিহ্ন কোন দিকে। খালি বরফ বরফ বরফ। পায়ের তলায় মচ মচ করছে বরফ। বরফে ডুবে অতলে তলিয়ে যেতে পারতুম, তলাইনি কেউ।

আসার পথে কখনও আনন্দ কখনও যন্ত্রণা দুটোই পরপর অনুভূতিকে নাড়া দিয়েছে আমায়। কিন্তু স্নায়ু সতেজ সক্রিয় ছিল। অসাড়-অবশ হয়ে যায় নি। এটা হচ্ছে মৃতদেহতে ঠোক্কর খাবার পর। মনে পড়ছে তীর্থনাথের কথা, এতক্ষণে যা পড়ে নি। নিরুপায় অবস্থায় বুঝি এরকমই হয়। মনকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। দলের সকলের মনে ভয় ধরলেও সাহস দিচ্ছি—আমরা এসে পড়লুম বলে, আর একটু জোরে আর একটু জোরে।

সকলের শুকনো মুখে ভয়-সংশয়।

আরও ভয়, আরও ভয় যে অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে তার প্রমাণ পেয়ে গেলুম, বেশী দেরীতে নয়। খানিক যেতেই, আর একটা মৃতদেহ। আগের চেয়ে এর ক্ষতস্থানের রক্ত আরও তাজা—লাল টকটকে। এ দেহ মহিলার।

আমি বুঝতে পারছি যে, বিপদের রাজ্যের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। মৃত্যুর রাজ্যের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। জানি না মহাকালের বিধানে আমাদের ভাগ্যের লিখন কি। যারা এই বরফের বুকে নিজেদের বুকের স্পন্দন হারিয়েছে, হয়তো বা আমাদের মতো তারাও যাত্রী হিসেবে পথ ভুল করেছিল। যেটা আমি এখন অনুভব করছি পরিষ্কার।

কাকে আর কি বলবো আমি! রকমসকম দেখে আমিই কেমন হয়ে গেছি। কোন উৎসাহ নেই—নিজেরই যখন নেই, অন্য কাউকে উৎসাহ দেব আমি কেমন করে। নিস্পন্দের মতো আমরা দাঁড়িয়ে।

কেউ কেউ বরফে পা আটকে বরফের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে যেন। কারও বা সর্বশরীর টলছে, পড়ে যাবে এখুনি।

এই দুর্দিনে এই অসময়ে নির্বান্ধবপুরীতে ক'জন মিলেও আমরা প্রত্যেকে একা। নিজের মনকে সবল করার জন্যে আমি কোন আদেশ করতে পারছি না। এমন অবস্থাতে এমনি হয় বুঝি সবার। সব ভুলে যাচ্ছি, মাথাটাও গুলিয়ে যাচ্ছে।

তন্ত্র নিয়ে কত ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। ধর্মের আধ্যাত্মিকতত্ত্ব-দর্শনতত্ত্বের কত ব্যাখ্যা শুনেছি। মনকে অন্য চিন্তায় নিয়ে গেলে দেহের কষ্টের কোন অনুভূতি থাকে না। মানুষ শান্তি পায়। দেহের আঘাতকে আঘাত বলে মনে হয় না। তাই বুঝি বলা হয়েছে আত্মা জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না। অস্ত্রের আঘাতও আত্মাকে স্পর্শ করে না। আত্মার মৃত্যু নেই।

এত সব জানা সত্ত্বেও মন তো তৈরী হয় নি। এই মুহূর্তে একবারও ভাবতে পারছি না, আত্মার মৃত্যু নেই, আত্মা দেহ ছাড়া। আমার কাছে দেহ-আত্মা এখন এক হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারছি, আমার আশেপাশে আমার দৃষ্টির অগোচরে কারা না কারা ঘাপটি মেরে লুকিয়ে বসে রয়েছে, অপেক্ষা করছে। শিকার ধরার আগে শিকারীর প্রস্তুতিপর্ব চলেছে।

দু' দুটো মৃতদেহকে চোখের সামনে দেখে এ ছাড়া কি আর ভাবা যেতে পারে! এখানে আধ্যাত্মিক দার্শনিক কিছুই কোন প্রলেপ দিতে পারে না। অন্তত আমার মনের অবস্থা তো তাই।

মনে হচ্ছে, সাধন-ভজন দেব দেবী সমস্তই কল্পনার সৃষ্টি। নিজের সাময়িক সান্ত্বনা এইভাবেই তৈরী করে নেয় বুঝি লোকে! বাস্তবক্ষেত্রে মহাকালের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে খড়কুটোর মতো ডুবে-ভেসে এসব কোথায় হারিয়ে যায় কে জানে!

জানিনা আমার এসব ভাবনার জন্যে কিনা—ঈশ্বর বলে যদি কেউ থেকে থাকেন, বিপদভঞ্জন বলে যদি কেউ থাকেন, তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে তাঁর আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্যে বুঝিবা আমার কথা

স্বকর্ণে শুনেছেন, হৃদয়ে অনুভব করেছেন। তা না হলে আচমকা সবাইকে বিস্ময়-বিমূঢ় করে দিয়ে এমন দৃশ্য চোখের সুমুখে কেমন করে এসে হাজির হয়! কেমন করে?

সকলের দু'চোখ বিস্ফারিত।

দেখছি সুন্দরী-সুবেশা রমণীরা আমাদের সামনের পথ দিয়ে আমাদের দিকেই আসছে।

ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলুম, আমি একা নই—সকলের মুখ দেখে মনে হল, সকলেই। দেহে বল মনে বল। ওরা হাসতে হাসতেই এগিয়ে আসছে। ওদের দেশীয় পোশাক পরনে। মাথায় ত্রিকোণ মুকুট, মুক্তো পলা ফিরোজা পাথরে সাজানো। গলায় ফিরোজা পাথরের তাবিজ। তাবিজের দু'পাশে মুক্তোর ঝুরি ঝুলছে। হাত আর দেহের অন্য অংশ কালো আলখাল্লায় ঢাকা। পায়ে শোম্পা জুতো। হাসি হাসি মুখ।

ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। ওরা আসছে একসঙ্গে দশ-বারো জন। এবার ঠিক পথ পাব, আর ভয় নেই। ভয়ের মেঘ কেটে গেছে। ঈশ্বরকে ইষ্টদেবীকে আকাশকে বাতাসকে পাহাড়কে বরফকে জানাচ্ছি। তোমরা আছ, আমি নাস্তিক হতে চলেছিলুম, তোমরা আমায় আস্তিক করেছ। তোমরা আমায় ক্ষমা কর।

আনন্দে আমার কান্না আসছে কেবল। দু'চোখের কোণ ছাপিয়ে জল গড়াচ্ছে। চোখের জল ঠোঁটে এসে মিশছে। নোনতা স্বাদ নয়, শুনেছি দুঃখের জলের স্বাদ নোনতা, আনন্দের মিষ্টি। আমার মিষ্টিই লাগছে।

ওরা এক এক জন স্বর্গের দেবী যেন এগিয়ে আসছে।

কাছাকাছি হতে হাসতে হাসতে আমি বললুম, ভাঙা ভাঙা ভোট ভাষায়, গার্বিয়াং-এ থাকার সময় কিছু কিছু শিখেছিলুম। —আমরা পথ হারিয়েছি, আমাদের পথ দেখিয়ে দিন। আপনাদের পেয়ে আমাদের মনে হচ্ছে ঈশ্বরই পাঠিয়েছেন।

ওরা কেউ মুখে কোন কথা বলল না। মুচকে হাসল কেবল।

হাতের ইঙ্গিতে ওদের নির্ভয়ে অনুসরণ করতে বলল।

আমরা অনুসরণ করে চলেছি। চলেছি তো চলেছিই।

খানিক যাওয়ার পর দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা পেছু ফিরে, অর্থাৎ আমাদের সামনা সামনি। প্রত্যেকের মুখ নিদারুণ কঠিন হয়ে উঠেছে। রমণীর কমনীয় মুখ থেকে বীভৎস পিশাচের মুখ বেরিয়ে আসছে। আমরা সকলেই নিস্পন্দ-নিথর। এ-দৃশ্য দেখার জন্যে, এ-মুখ দেখার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিলুম না।

নিমেষে নেমে এলো বিভীষিকার রাজ্য। মাথার মুকুট খুলে ফেলল ওরা, আলখাল্লার তলা থেকে ধারালো তলোয়ার বার করে বজ্রের স্বরে একসঙ্গে সকলে বলে উঠল, সিউ মারী। কেউ নেই, কেউ নেই তোমাদের রক্ষে করতে পারে।

বুঝতে আর বাকি রইল না আমাদের, রমণীর বেশে প্রাণঘাতী পুরুষ দুর্বৃত্ত এরা। যে দুটি মৃতদেহ দেখা গেছে, এরাই তাদের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে। আমাদের সুমুখেও সাক্ষাৎ যমদূতেরা দাঁড়িয়ে, প্রাণ ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে প্রস্তুত।

কোন প্রার্থনা এলো না মাথায়, কারও মুখ ভেসে উঠল না চোখে প্রাণ রক্ষের জন্যে ভেতরে আকুলি-বিকুলিও করে উঠল না। শুধু একটা কথাই ক্ষণেকের জন্যে বুক থেকে মাথায় উঠে গেল। ভুল-ভুলই। জেনেই ভুল করুক বা অজান্তেই হয়ে যাক, বা পরিবেশ বাধ্য করেই করাক—কোন ক্ষমা নেই কোন দয়া নেই কোন মায়া নেই—সাজা পেতে হবেই। সে শিশুই হোক নির্বোধই হোক সরলই হোক।

সমস্ত ভয় আমার ভেতর থেকে চলে গেল। হঠাৎ আমি খুব সাহসী হয়ে উঠলুম। আমি মরতে প্রস্তুত।

বেশ মনে আছে, আমার দেহ কাঁপেনি পা কাঁপেনি বুক কাঁপেনি; কিন্তু পায়ের তলা থরথর করে কাঁপছে। ওদের দিকে কাঁপছিল কিনা জানি না, তবে ওরাও খুব আনমনা হয়ে পড়ল; আমার মনের ভুল কিনা বুঝতে পারছি না। তবে ভুল যে নয়, চাক্ষুষ দেখলুম। ওদের-আমাদের মাঝখানে বরফের ওপর একটা রেখা ফুটে উঠল।

চোখের পলকে মাঝখানটা ধসে পড়ল। ওরা ওপারে আমরা এপারে। ওরা দৌড়ে পালিয়ে গেল।

জীবনে অনেক অজানা রহস্যরাজ্যের একটার পর একটা দরজা খুলে অভিজ্ঞতার ঘরে পৌঁছুতে হবে বলেই বোধহয় এ যাত্রা ওই ভাবে বেঁচে গেলুম।

ওপথ ছেড়ে আমরা ঘোরা পথ ধরলুম। ঘোরা পথে এগোচ্ছি। মাঝে মাঝে তাঁবু ফেলেছি, লোকালয়ে এসে পৌঁছে দেখেছি, খালের জল বয়ে যাচ্ছে জমি বেয়ে। মটর শুঁটির চাষ হচ্ছে—সবুজে ভরে উঠেছে চারিদিক। লোকের সাড়া পেলুম, বসতি দেখলুম।

আমার কাছে সব চেয়ে বেশী মজার ব্যাপার এখানকার মেয়েদের সমবেত কণ্ঠের গান। গলায় গলা মিলিয়ে রোজ সন্ধ্যেয় গান গায় ওরা। আমি তাঁবুর ভেতর বসে বসে শুনি।—মানস সরোবরে চান করলে দেহের ময়লা যায়, কিন্তু মনের ময়লা তো যায় না।

আমার খুব ভালো লাগে। আমিও গান গাই, কখনও গুনগুন করে কখনও গলা ছেড়ে। আমার আশপাশের লোকেরা সচকিত চোখে তাকায় আমার দিকে। হয়ত বা পাগলও ভাবে কেউ কেউ। যে যা ভাবুক গে। আমি যা, আমি তাই-ই!

সত্যিই তো, যদিও এখনও পর্যন্ত মানস সরোবরে ডুব দিইনি, তবুও দেহের ময়লার চেয়ে মনের ময়লাই বেশী। আসার পথে কত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের চাকায় ঘুরে ঘুরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি। সে সব ভোলার নয় সহজে।

ওদের সঙ্গে ভাব করবার বড় ইচ্ছে হল। গাঁয়ের মেয়ে এরা। কোন্ সুদূরের বাসিন্দা তবুও কত উঁচুদরের প্রকৃত সত্যজ্ঞানের কথা এদের সাধারণ গানের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। আমি নিজেই গেলুম একজনকে সঙ্গে নিয়ে।

পাথরের বাড়ি পাথরের ছাদ। ঘরের জানলায় কাগজের পর্দা দেয়ালে রঙীন আলপনা। চৌকিতে বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন মূর্তি। অন্ত

আর এক চৌকিতে কাঠের চায়ের পেয়ালা। ঘরের ভেতর লম্বা চৌকিতে কম্বল পাতা। দরজার বাইরে ফুলের টব। বাড়ির গিন্নী একগাল হেসে ভেতরে নিয়ে এসে চৌকিতে বসালেন। আদর-আপ্যায়নের তুলনা হয় না। চমরীর দুধের মাখন মেশানো চা কাঠের পেয়ালায় ভর্তি করে বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

বাড়ির সকলেই আমাকে দেখে খুব খুশী। প্রতিবেশী মেয়েরা হাজির। ওরা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জিভ বের করে মাথা নীচু করে দু'কান ধরে ওদের প্রথায় আমায় শ্রদ্ধা জানাল ভালোবাসা জানাল। আমি দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাত জোড় করে নমস্কার করলুম। আমাকে ঘিরে সকলে মিলে ওই গান শোনাল আবার। আমি শুনতে চেয়েছিলুম।

এরপর গৃহিণী আমাকে নিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরোলেন।

মহল্লার ভেতর থেকে যেন বাঘের গর্জন শুনছি। চমকে উঠে গৃহিণীর মুখের দিকে তাকালুম। উনি মৃদু হেসে বললেন, কুকুর। এরাই তো সব পাহারা দেয়. ভেড়া চমরী সব কিছু। চোর-ডাকাতকেও ঢুকতে দেয়না। যে বাড়িতে নিয়ে গেলেন, সে বাড়িতে চেনে-বাঁধা লম্বা কুকুর। নীল চোখ ঝকঝকে দাঁত লকলকে জিভ যেন নরখাদক বাঘের। গৃহিণী হাত নাড়তেই সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা শান্তশিষ্ট হয়ে গেল।

ওই বাড়ির যে ঘরে উনি আমায় নিয়ে গেলেন, ঢুকেই আমি অবাক। ঘরের দেয়ালে ঝোলানো মানুষপ্রমাণ ঢাকা খোলা কাঠের বাক্সের মধ্যে একটি মৃতদেহ।

গৃহিণী বললেন. আমা[illegible]ড় মেয়ে। ও মারা গেছে দিন সাতেক। দেহটাকে নুন দিয়ে রাখা হয়েছে। লামা এসে বিচার করবেন, কোথায় জন্মাবে ও বলে দেবেন। তারপর শব দাহ করা হবে। ঘরের চারকোণে চারটে প্রদীপ জ্বলছে। আমার মনে হল ওই প্রদীপের আলো হাসছে। ঘরে একটা মরা মানুষকে নিয়ে প্রদীপের আলোর হাসির ছোঁয়া লাগছে গৃহিণীর ঠোঁটে, মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে।

এ সব আশ্চর্য লাগছে আমার কাছে। সাতদিন যার মেয়ে চলে গেছে, সে কেমন করে অতিথির সেবা করতে পারে, কেমন করে হাসতে পারে! শোকের লেশমাত্র চিহ্নও চোখে-মুখে নেই! কেমন-তরো মা এ!

শুনেছি, শুনেছি কেন নিজের জীবনেও তো দেখেছি মায়ের মতো মমতা অন্য কারো নেই। সে পশুপক্ষীর মায়েরও। এখানে এ ব্যতিক্রম কেন? আমার চোখ-মুখে কিছু পরিবর্তনের ছবির আভাস পেয়েছিলেন বোধহয় গৃহিণী।

উনি নিজেই বললেন, মানুষের চলে যাবার শোকটা আমাদের কাছে বড় নয়। যে যায়, সে তো যায় না। সে আবার জন্মায়। অন্যের মেয়ে হয়ে জন্মালে তো আমারই মেয়ে। আমি চুপ। এযে গীতার অমৃতবাণী শুনছি এখানে। গৃহিণী শ্রীকৃষ্ণ আমি অর্জুন। হঠাৎ বাড়ির সকলে একটু সশব্যস্ত হয়ে উঠল। কোন বিশিষ্ট লোক আসবেন। কৌতুহল না চাপতে পেরে আমি জিজ্ঞেস করলুম, কে আসবেন?

গৃহিণী বললেন, শ্রীঅর লামা। মানস সরোবরের কাছে গুম্ফার সেই শ্রীঅর লামা! আমি মনে মনেই প্রশ্ন করলুম। তবুও দেখার খুব ইচ্ছে হল। এমনও অনেক সময় হয়, যা ভাবা যায় না। আমার মন বলল, হতেও পারেন তো ইনি, যাঁর কাছে কামাখ্যার তীর্থনাথ পাঠিয়েছেন আমায়।

দর্শনের ইচ্ছে প্রকাশ করলুম আমি। গৃহিণী মহাখুশী। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। যথা সময়ে উপস্থিত হলেন উনি। শাঁখ ঘণ্টা লম্বা বাঁশী ঢাক বেজে উঠল একসঙ্গে। যেন মন্দিরে ভগবান তথাগতের আরতির মহালগ্নের ক্ষণ জানিয়ে দিল সকলকে।

নিমেষে গোটা বাড়িটার পরিবেশ পাল্টে গেল। গুম্ফার—মঠের পরিবেশ হয়ে উঠল।

যিনি এলেন তিনি দীর্ঘদেহী। মুখে শিশুর সরল হাসি, মুণ্ডিত শির লাল আলখাল্লায় সারা দেহ ঢাকা। হাতে প্রার্থনা চক্র ঘুরছে।

অন্যহাতে জপের মালা। বাড়ির ঘরের সকলে নিশ্বাসে উচ্চারণ করছে, তাদের প্রত্যেকের ভেতরের মানুষ—ওম্ মণিপদ্মে হুম্।

শ্রীঅর লামা এসেছেন মানস সরোবরের গুম্ফা থেকে। যাকে চেয়েছি, সহজেই কাছে পেয়ে গেলুম আমি। পরিচয় হল, প্রণাম করলুম, কপালে মাথায় চক্র ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করলেন উনি। বললেন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। তথাগতের ইচ্ছে তোমার মনের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হোক। অন্যের কল্যাণ তোমার মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হোক।

মৃতের ঘরে প্রবেশ করলেন তিনি। আত্মা কোথায় জন্মগ্রহণ করবে ধ্যানে বলে দেবেন বলে।

অন্ধকারের পরে আলো, দুর্ভাগ্যের পর সৌভাগ্য আসে—এটা একটা প্রবাদ বাক্য। সবার জীবনে সত্যি সত্যি আসে কিনা জানি না। তবে উপস্থিত মনে হচ্ছে আমার—আমার জীবনে সত্যি সত্যি বুঝি বা এলো।

মৃতদেহের ঘরখানা চতুর্দিকে ধুপধুনো গুগগুলের ধোঁয়ায় ভরে উঠল। ঘরের চারকোণে আর মাঝখানে মৃতের পাঁচজন নিকট আত্মীয় বসে। লামার নির্দেশে এরা ধ্যানমগ্ন, মৃতের ধ্যান করছে। প্রত্যেকেই মনে মনে বলছে, তুমি কোন্দিকে কোথায় জন্মগ্রহণ করবে আমাদের এসে বলে দাও।

মৃতের কাছাকাছি মেঝেয় রঙীন খড়ি দিয়ে একটা নকশা আঁকলেন লামা। উত্তর পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম। এক একটা করে দশটা দিক, কোন্দিকে কোন্ জায়গা কোন্ দেশ—তার নাম লিখলেন। এবার উনি একবার করে চক্র ঘোরাচ্ছেন, একবার করে নীচের দিকে তাকাচ্ছেন। ভেতরে ভেতরে আত্মার আকর্ষণী মন্ত্র জপ করছেন। ···মাং স্তং আগচ্ছ···

আমি ওঁর ভেতরের মন্ত্র ওঁর নিশ্বাসে শুনছি। আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, এযে সংস্কৃত মন্ত্র! আমার মনে পড়ে গেল কামরূপের কথা। তীর্থনাথ বলেছিলেন, শ্রীঅর লামা সন্ন্যাসী-বৌদ্ধতান্ত্রিক সংস্কৃত পণ্ডিত। ওঁর নিশ্বাসের মন্ত্র উচ্চারণ এবার সম্পূর্ণ থেমে গেল, আর

শুনতে পাচ্ছি না। এবার আর তাকিয়ে মৃতদেহকে দেখছেন না, দু'চোখ বোজা।

আমরা সকলে বাইরে থেকেই দেখছি। সকলে রুদ্ধশ্বাস, চুপচাপ। উৎকণ্ঠা তো রয়েছেই, কি হয় কি হয়, কার ওপর ভর করে আত্মা কিভাবে এসে ওই ছক আঁকা ঘরে হাত দিয়ে দেখিয়ে দেবে—কোথায় জন্মাবে সে।

এ জিনিস আমি দেখিনি কখনও এর আগে। এটা আমার কাছে একদম নতুন। এমন অনেক জিনিস দেখেছি, যা আগে বিশ্বাস করি নি। পরে চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে বিশ্বাস না করে আর কোন উপায় থাকে নি। অন্যের জেতার প্রমাণে নিজের হারার আনন্দ মস্ত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে আমার সামনে। তাই মনের কোণে সংশয়ের দানা টলটল করে গড়িয়ে বেড়ালেও, এ ব্যাপারটাকে ঠিক মিথ্যে-বুজরুকি বলে এই মুহূর্তে মন আমার মেনে নিতে চাইল না।

সকলের অধীর আগ্রহ। আমার আগ্রহের জলে কৌতুহলের রঙ মেশানো। আমার চতুর্দিকেই চোখ। পাশাপাশি এঘর-ওঘর—সব ঘরের খোলা দরজায়।

আশ্চর্য হয়ে গেলুম। একটি ছ'মাসের ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে পুবের ঘরের দরজা থেকে বেরিয়ে আসছে। অসমতল উঠোন, একটু উঁচুনীচু। ওপাশে বেশ ঢালু। ছেলেটির গড়িয়ে পড়ার ভয় প্রচণ্ড। কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। ছেলেটি যদি হঠাৎ ওপার ঘেঁষে আসতে থাকে, সমূহ বিপদ্। পড়ে যেয়ে কচি মাথা ফেটে ফুটিফাটা হওয়া অসম্ভব নয়। এরকম বয়সে সৌরভও হামাগুড়ি দিয়ে আসত ওইরকম।

সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, নির্লিপ্ত নির্বিকার। মা-বাপেরও। ওকে ধরার বা আটকাবার কারুর কোন স্পৃহাই নেই। আমি থাকতে পারলুম না, যে মরা, তাকে নিয়ে এতো মাতামাতি—ছাইপাঁশ আত্মা আসে কি না আসে কে জানে! অমন ফুটফুটে ছেলেটা মারা যাবে, ধরবার জন্যে এগোতে যাচ্ছি পাশের তিব্বতী

মহিলাটি আমার হাত চেপে ধরলেন। কানের কাছে মুখ এনে খুব আস্তে আস্তে—যাতে আওয়াজে আত্মা আনানোর কোন বিভ্রাট না ঘটে, বললেন, ওই-ই আত্মা। দেখবেন ও পড়বে না, ভয় নেই আপনার কোন।

নিষ্ক্রিয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর ছিল না। বাইরে স্থির-মৌন। কিন্তু ভেতরে নিদারুণ আকুলি-বিকুলি—ছেলেটার কি হয় কি হয়! আসলে মহিলার কথার ওপর আমি এতটুকু আস্থা রাখতে পারি নি।

সবার মতো আমিও অপলক চোখে চেয়ে আছি। ছেলেটি কোন দিকে না তাকিয়েও ঠিক চলে এলো এই ঘরের দরজায়। প্রবেশ করল। পাশের সেই মহিলা আমাকে বললেন, সেই আগের মতো করেই, যে মেয়েটি চলে গেছে, এ তার খুব প্রিয় ভাইপো। একে বুকেপিঠে করে মানুষ করেছে।

আমি ভাবলুম, দুধের শিশু এ, কোন জ্ঞান নেই, মেয়েটি আছে কি গেছে। আগের টানেই আপনা হতে এসে পড়েছে। এদের রকমসকমে ভেতরে হাসির তুফান উঠছে। কিন্তু বাইরে প্রকাশের কোন উপায় নেই। হাসি চাপছি প্রাণপণে। জিভ কামড়াচ্ছি। পাশের মহিলা বড্ড অনুভূতিপ্রবণ। এঁকে নিয়ে আমার হয়েছে এক মহাজ্বালা! মানুষের নিশ্বাস ধরে বোধহয় উনি মনের কথা বোঝেন ভাব বোঝেন। ছোট ছোট চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার দিকে একবার তাকালেন, তারপর পেছন ফিরে দাঁড়ালেন। আমি ওঁর মুখে কোন বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখি নি, তবে ভাবপ্রকাশে মনে হয়েছে, উনি খুব বিরক্ত হয়েছেন।

সবার লক্ষ্য ছেলেটির ওপর, কি করে না করে।

ছেলেটি কোন দিকে তাকাল না। ঘরে ঢুকে মেয়েটির জন্যে কাঁদল না চীৎকার করল না, তাকে খুঁজলও না। ঘরের সকলেই ধ্যানতন্ময়। ওদের চোখের দৃষ্টি বোজা পাতার তলায়—ছকের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি যেন দেখল ছেলেটি খানিক। তারপর

ছকের পশ্চিম কোণে তর্জনীর আঙুল ঠেকিয়ে রইল। ফোকলা মুখে কি হাসি। যেন একটা বড় লোক হাসছে হো-হো করে।

লামার ধ্যান ভাঙল। সেই সঙ্গে অন্যদেরও। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে ছকের জায়গাটার নাম ধরে আনন্দে চীৎকার করে উঠল সবাই। মেয়েটি জন্মাবে পশ্চিম দিকের ওই জায়গায়।

এই দেখা আর চীৎকার করে বলার পর আর একদণ্ডও ঘরের মধ্যে থাকে নি ছেলেটি। যে ভাবে এসেছিল, সে ভাবেই হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল নিজের ঘরে। ওর অদ্ভুত আচরণে আমি বিস্ময়-বিমূঢ়!

লামা কার্য সমাধা করে বেরিয়ে এসে মৃদু হেসে আমাকে বললেন, আমার কিছু বলার আগেই, তীর্থনাথ তোমাকে পাঠিয়েছে আমার কাছে অনেক কিছু শেখার জন্যে—কেমন, তাই না?

আমি মৌনমুখে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছি—হ্যাঁ। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি কতখানি, মানুষের মনের খবর জানার ক্ষমতা কতখানি—ওই একটি মাত্র প্রশ্নেই আমার সমস্ত যাচাই-বাছাই হয়ে গেল। তীর্থনাথ যা বলেছিলেন সবই সত্যি। যোগদৃষ্টিতে দূরের মানুষকে দেখতে পান লামা। স্পষ্ট নিখুঁত। দূরের কথা শুনতে পান পরিষ্কার। আর মনের কথা জানার তো কোন কথাই ওঠে না। ও দুটো যে পারে, এ তো তার কাছে তুচ্ছ।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল। এই শরীরে এক জায়গায় বসে থেকেও অপর জায়গায় গিয়ে সূক্ষ্ম শরীরে দেখে আসতে পারা যায়। যেটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য কল্পনারাজ্য—আমি এতদিন ধরে তাই ভেবেছি। আমার ভাবনাটা ভুল। শ্রীঅর লামাকে মনে হচ্ছে আমার, ইনি স্বয়ং সাধনরহস্যের একটি বড় আকারের গুপ্তখনি।

উনি আমার মাথায় হাত রেখে হাসি মুখে বললেন, মানুষের কতটুকু মাথা! কিন্তু বিরাটের খোঁজে তার মাথা ব্যথা। এ যেন বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন। জোরে প্রাণ খোলা হাসি হেসে বললেন তিনি, তোমাকেও দেখছি সে ব্যামোয় পেয়েছে।

আমার চোখের তারায় কোন হতাশার ভীরু চোখ ওঁর কথা শুনে সহসা উঁকি মেরে বসেছিল কি না কে জানে! তাই দেখে, না নিজের অন্তর্বাণী শুনে বা আমার মন জেনে অভয় দিয়েছিলেন তা জানি না আমি। বলেছেন, এটা আমি কথার কথা বলেছি। তোমার মাথা তুমি তো দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখতে পাচ্ছি। তোমার মাথা অনেক বিরাট, যোগের জিনিস তো কত ছোট! তুমি সব বুঝতে পারবে জানতে পারবে। আমার বিশ্বাস, তুমি অভ্যেসও করতে পারবে ঠিক ঠিক।

…'অভ্যেসও করতে পারবে ঠিক ঠিক'। শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে, আমার মেরুদণ্ডে বিদ্যুতের তরঙ্গ বয়ে গেল একটা। আমার মনে হল, আমি যেন এখুনি আমার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণফল হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেছি। অজ্ঞাত আনন্দে ভেতর আমার নেচে উঠেছে। আমি আমাকেই দেখছি, আমার সামনে দ্বিতীয় আমি নাচছি। সেই পুরনো জায়গা কামরূপে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের কাছে। যেখানে আমি ভুলে যেতুম নিজেকে। নিজে কি হয়ে যেতুম সেটা জানি না। বোধহয় নিজে নিজে বোঝা যায় না। হয়তো বা ভুলে যাওয়াটা স্মৃতিপটে আসতে পারে না।

আমি কি হয়ে যেতুম, কেমন হয়ে যেতুম—শুনেছি তীর্থনাথের মুখে। তীর্থনাথ বলেছেন, তোমাকে আমি দেখি, আমার ধ্যানের দেবী সাক্ষাৎ আসেন তোমার মধ্যে দিয়ে। তোমার মধ্যে দিয়েই তিনি নৃত্য করেন। এ নৃত্য জগতের সকলের—শিবের বুকের স্পন্দনের মতো তাদেরও প্রাণের স্পন্দন—জীবের জীবন।

সম্বিৎ ফিরে পেলুম আমি লামার ডাকে। ওঁর সঙ্গে আমাকে যেতে বললেন।

মানস সরোবরকে দেখে কি বলব জানি না। কোন ভাষা যুগোচ্ছে না মুখে। কাশ্মীরকে লোকে বলে ভূস্বর্গ। মানস সরোবরকে কি দেবস্বর্গের হ্রদ বলব? বলব কেন, হবেও বা তাই। সত্যি সত্যি না হলেও ভাবতে ইচ্ছে করছে কিন্তু। চতুর্দিকে পাহাড় ঘেরা। পাহাড়ের রঙ বরফ জমা শ্বেত পাথরের। আকাশের নীল, মেঘের কালো—কত রঙের খেলাই যে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে খেলে যাচ্ছে, দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। দ্বীপের ওপর চিকচিকে রোদ্দুরে রাজহাঁসের ডিমের মুক্তো ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিক। হ্রদের কোণে কোণে গুম্ফা—বৌদ্ধমঠ। শ্রীঅর লামার মঠ আরও এপাশে। কৈলাস পর্বতের চূড়োয় বরফের শিবমন্দির গড়েছে যেন বিধাতাপুরুষ। ওখানে বরফলিঙ্গও যেন জীবন্ত। ভারী মনোরম দৃশ্য।

সূর্য-উদয়ের সোনালী রূপোলী রঙের কি অপূর্ব ছটা! তার মধ্যে হীরে পান্না মাণিক জ্বল জ্বল করে ওঠে থেকে থেকে। আমি বিমুগ্ধ চোখে দেখি সূর্য-উদয়। দেখি সূর্য-অস্ত। মঠ থেকে বেরিয়ে এসে মানস সরোবরের তীরে দাঁড়াই। সুন্দরের রাজ্যে হঠাৎ কালো মেঘ অসুরের বেশে এসে সমস্ত সৌন্দর্য ঢেকে দেয় চোখের পলকে সময়ে সময়ে। তখন গুম্ফার ভেতরে ফিরে আসি বিষণ্ণ মন নিয়ে।

আমাকে লামা বলেন, যোগ শিখতে এসে তুমি কি রঙের যোগে ব্যস্ত থাকবে? তবে আমার কাছে এসে তোমার লাভ কি হল! তুষারকণা, তুমি সদাসর্বদা মনে রাখবে সময় খুব অল্প। সময় কারও জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকবে না। যে যে-কাজের জন্যে জগতে এসেছে, তার সে-কাজ যতটা শীগ্‌গির সারা সম্ভব, সেরে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। মানুষের মধ্যে তিনটি মানুষ রয়েছে। তারা কে কে জানো?

আমার চোখের নীরব ভাষা বলেছে—কই, জানি না তো।

উনি বলেছেন, অরি মিত্র উদাসীন—মানুষের তিন অংশ। শত্রু

বাইরে কেউ নেই, নিজের প্রধান শত্রু সে নিজেই। সে ভুল করে সে সময় নষ্ট করে, সে মঙ্গল পথে এগোতে চায় না। কারুর শুভ কামনা করতেও তার ঠোঁট কেঁপে ওঠে না। মিত্র-শুভ পথে এগোবার জন্য যেমন দুরন্ত বেগ, সেই বেগেই এগিয়ে চলে সে লোকের দুঃখ-দৈন্য মুছে ফেলার জন্য। উদাসীন যাঁরা সৎ কাজের মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন করে চলেছেন। অন্যের জীবনকেও সঙ্গী করে নেয়ার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন—এই কর্মযোগীদের বিষয়ে যেমন নিস্পৃহ, তেমনি যারা অসৎকর্মে ডুবে আছে দিনরাত, তাদের বেলায়ও। আবার যারা সুখী যারা দুখী, তাদেরও কোন স্পর্শ এদের ছুঁয়ে যায় না।

একটু থেমে আবার তিনি বললেন, পৃথিবীতে কিছু কাজ করতে হলে, মানুষের মন শরীর গড়ে তুলতে গেলে, বুদ্ধিকে পরিপুষ্ট করে তুলতে গেলে আর বিবেককে সদাসর্বদা জাগিয়ে রাখতে হলে, এই উদাসীন ভাবকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। চলবে না অরি ভাবকেও প্রশ্রয় দিলে। একমাত্র ভেতরের মিত্রপুরুষের সাধনায় মগ্ন রাখতে হবে নিজেকে।

আমি বলেছি, আমি বুঝতে পেরেছি আপনার মনের ইচ্ছে কি। আশীর্বাদ করুন, আমি যেন আপনার ইচ্ছে পূর্ণ করে চলতে পারি।

উনি বলেছেন, তোমার মুখে একটাই শুনতে চেয়েছিলুম আমি। ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে থাকলে চলবে না।

ভদ্রতা আর বিনয় এ দুটো আমার বংশের ধারা। উত্তরাধিকার সূত্রে অন্য কিছু পাই নি এ দুটো ছাড়া! এরা আমার গোচরে অগোচরে এসে উপস্থিত হয়। এদের জন্যে আমি অনেক অযাচিত স্নেহ পেয়েছি সহানুভূতি পেয়েছি। সহায়তা পেয়েছি অনেকের কাছ থেকে। কথায় বলে, মনের অগোচর পাপ নেই। অর্থাৎ কিনা—অপরকে ফাঁকি দিতে পারা যায়, অপরের চোখে ধুলো দিতে পারা যায়, কিন্তু আমি যে কি, তা আমি ছাড়া দ্বিতীয় কে জানবে?

দুষ্টুমি বুদ্ধি একটু-আধটু মাথায় যে খেলত না তা নয়। অপরের

অপছন্দ মতো কথা কয়ে, অপছন্দ মতো কাজে দুষ্টুমি করে মজা পেতুম এক সময়। বাবা-মা জ্ঞাতি-সজ্জন সবার কাছেই এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে খুব আনন্দ পেতুম। ঘরে গিয়ে বিছানায় উবুড় হয়ে পড়ে হেসে কুটি কুটি হয়েছি। মা-বাবা ছাড়া যারা আমার আদর দেখে বিষ নজরে দেখত, তাদের পক্ষে এটা মাহেন্দ্রক্ষণ হয়ে দাঁড়াত। প্রাণ খুলে আমাকে গালমন্দ দিয়েছে আমার হাসির ইন্ধন যোগাবার জন্যে।—মরণ আর কি! কম বয়েসে ভালো কথা মাথায় ঢোকে না কারও। পরে টেরটি পাবে'খন। যত হাসি তত কান্না।

সেই ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেছে আমার। সেই দুষ্টুমি। ছোট্ট মেয়েটি হয়ে গেছি আমি। হয়ে যেতে ভালো লেগেছে। হারানো বাবা-মাকে দেখেছি জীবন্ত, চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। শ্রীঅর লামার ডান চোখের তারায় বাবার মুখ, বাঁ চোখের তারায় মায়ের।

মানুষের অতি আপনজনের স্মৃতি ক্ষণেকের জন্য ফিরে এলেও, সে সময়টায় মনে হয় যেন সর্বস্ব ফিরে পেয়েছে সে। যতই দুঃখের হোক না কেন স্মৃতি, বেঁচে থাকে বলেই হয়ত অতীত বেঁচে থাকে। অতীতের মানুষ বেঁচে থাকে, অতীতের কর্মকাণ্ড বেঁচে থাকে। অতীতের ভালোবাসা বেঁচে থাকে।

তীর্থনাথ অনেকবার বলেছেন আমাকে, তুষারকণা, অতীতকে এতো টানাটানি কর কেন? তোমার মনের কোণে একটা দুঃখ বিলাস দিন দিন ছোট থেকে বড় হয়ে উঠছে, সেটা কি কখনও আত্ম-বিশ্লেষণ করে দেখেছ? নিজেকে নির্দেশ দিয়ে ভুলতে চেষ্টা কর। তা না হলে তোমার সাধন ভজন সব বৃথা।

ভুলতে চেষ্টা করেছি আমি। প্রতি রাতে ঘুমোবার সময় নিজের অবচেতন মনকে বলেছি, আমি তুষারকণা। আমার অতীত স্মৃতি যেন কখনও ফিরে না আসে। ফিরে এসে আমায় না জ্বালায়। নিশ্চয় ফিরে আসবে না। নিশ্চয় জ্বালাবে না। দিনের পর দিন নিজের মনকে এইভাবে সম্মোহিত করেছি। ভুলেছি সমস্ত। আমি কে কোথা থেকে এসেছি কি নাম।

আত্মসম্মোহনের সময়—নিজেকে নিজে নির্দেশ দেবার সময় একটি নাম বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায় এটা আমি চাই নি কখনও। সে নাম সৌরভের। কি রকম হয়ে গেছলুম আমি। আমাকে দেখে তীর্থনাথ বারে বারে বলেছেন, এমনভাবে নিজেকে এ রকম আদেশ দিয়ে তোমায় আমি জড় পদার্থ হতে বলি নি। ফিরে এসো আবার স্বাভাবিক অবস্থায়।

আমার আত্মবিস্মৃত অবস্থায় সৌরভ-সৌরভ বলে আমি নাকি সময় সময় ডেকে উঠেছি। সৌরভকে দেখার জন্যে অনেক কান্নাকাটিও করেছি। এটা আমি শুনেছি তীর্থনাথের মুখে, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর।

আমি যখন ঘুমের প্রার্থনা করতুম রাত্তিরে, দু'চোখে ঘুম নেমে আসুক, গুরুমা-কিরণশশী ঠিক সেই সময় সকল কাজ ফেলে আমার শিয়রে এসে দাঁড়াতেন। গানের সুরে গুনগুন করে বলতেন, তোমার সমস্ত স্মৃতি জেগে উঠুক আবার। জেগে উঠুক, জেগে উঠুক।

কিরণশশী আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুললেন। সেদিন আমি যেমন পুনর্জীবন পেয়েছিলুম, আজও মনে হয় লামার কাছে আমি পুনর্জীবন পেলুম। সময় অল্প, আমাকে চলতে হবে তাড়াতাড়ি, কাজ সারতে হবে তাড়াতাড়ি।

আমার বাচ্চা বয়েসের তুষারকণার দুষ্টুমি বড্ড বেশি পেয়ে বসছে। আটকে রাখলে হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ি পিটবে দমাদম। তার চেয়ে ওকে ঘাড় ধরে বাইরে বের করে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

আমি বললুম লামাকে, ধৃষ্টতা মাপ করবেন। একটা কথা না বলে পারছি না। অভয় দিলে, বলে নিশ্চিন্ত হই—হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

—বল না, গুরু-শিষ্যে শিক্ষক-ছাত্রে তর্কাতর্কি না করলে কিছু শেখাও যায় না কিছু নেয়াও হয় না। লামার হাসিতে কৌতুকের ঝিলিক।

আমি বললুম, মূর্ত্তামূর্ত্যং উভয়াত্মকং ব্রহ্ম। মূর্তি-অমূর্তি সবই যদি ব্রহ্ম হয়, তাহলে এই রঙের সাধনা রঙের সঙ্গে আমার যোগ,

এটা কি ব্রহ্মসাধনা নয় বলতে চান ?

লামার হাসিতে গমগম করে উঠল গুম্ফার ভেতর। কোথাকার বাতাস ছুটে এসে ঘন্টাগুলো টুংটাং ঢং ঢং শব্দে বাজিয়ে দিল। লামা আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। বললেন, তুমি যা বলেছ, আমাকে খোঁচা দেবার জন্যেই। কিন্তু এইভাবেই মানুষের হঠাৎ হঠাৎ চেতনার উদয় হয়ে যায়। তোমার কথা ফেলবার নয়। অতি সত্য। তবুও কি জান, মন এমনই এক বস্তু, যাকে তৈরী করা যায় না। যে তৈরী হয় না। যাকে নিয়ে এই জগৎসংসারে লীলাখেলা মনের বিচিত্র ভাব! সদাসর্বদা চঞ্চল। মনই পশু মনই দানব মনই দেবতা। মনকে স্থির করলে, তবেই সকলের মনের ছবি ধরা পড়ে মনে। সকলের মনের কথা শোনা যায় মনে। শুধু বর্তমান নয়, অতীত ভবিষ্যৎও দেখতে পাওয়া যায়। কি গেছে কি আসবে।

আমি ওঁর কথার মর্ম-অর্থ ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি কিনা, সেটা চোখ টান টান করে আমাকে দেখে পরখ ক'রে নিলেন বোধহয়। হাসলেন একটু। বললেন, মনস্থিরের সাধনায় সফল হয়ে উঠতে গেলে সাধনার অনেক স্তর পেরুতে হয়। তন্ত্রের কুলাচার সাধনা এ যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ। কুলাচারের সাধককে কৌল বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তিনি জল বাতাস আলো জীব সবেতেই দেখেন ব্রহ্ম। তিনি-ব্রহ্ম অভিন্ন হয়ে যান। এটা শোনা যত সহজ চিন্তা করা যত সহজ, কিন্তু তত সহজে মনকে তৈরী করা যায় না। ঘুরেফিরে বারবার মনের মধ্যে অহং জেগে ওঠে। এই জেগে ওঠাকে নির্মূল করা সহজ নয়। সাধনার এক এক স্তরে উঠতে হয় তাই। ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী যে অদৃশ্য শক্তি রয়েছে, সেই ব্রহ্মশক্তি থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি, তাতেই স্থিতি, তাতেই মিশে লয়। লয়যোগের সাধনাতেই এ সাধনা সম্ভব। নিজেকে চেনা নিজেকে জানা নিজের ভেতরে সব শক্তির লয়। নিজের ভেতর ষট্‌চক্রের ধ্যান-প্রাণায়ামে এই দেহেই সেই অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে মিশে যাওয়াই ব্রহ্মসাধনা। লয়যোগের সাধনা। সুখদুঃখ ভুলে যাওয়ার সাধনা।

কৈলাস পাহাড়ের শিবলিঙ্গের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরল আমার। দৃষ্টি ফিরল লামার। আকাশে একখণ্ড কালো মেঘের হঠাৎ আবির্ভাব, এখুনি ঝড় বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি নেমে আসবে ওই মেঘ থেকে। এখুনি দুর্দান্ত তুফান উঠবে মানস সরোবরে। প্রাণঘাতী পরিবেশ ছেয়ে ফেলবে চতুর্দিক।

লামা ইঙ্গিত করলেন আমাকে ভেতরে যেতে। বললেন, দেখলে তো, প্রতি পদে পদে এই রকম ঝড় আসে। নানান পরিবেশে নানান প্রবৃত্তির তাড়নায়। সুন্দরকে দেখছিলে, এখন কি দেখতে পাচ্ছ? তবে দেখতে পাবে তাকে মনের চোখে, ভেতরে। মাথার মধ্যে, যেখানে সহস্রার চক্র রয়েছে, ঠিক সেখানে।...

লামা যখন আমাকে যোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন, কোথায় কোন্ চক্র বুঝিয়ে বলেছেন, আমিও যেন তখন সেই সব চক্রের ছবি আমার ভেতরে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি। এসব চক্রের ক্রিয়া-কলাপও আমার কাছে একটুও কঠিন মনে হয় নি। মনে মনে ভেবেছি, একেই বলে সদগুরু। গুরুকে কেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। গুরুই ভেতরে সৃষ্টি করেন জ্ঞান-পিপাসার সাগর, তখন তিনি ব্রহ্মা। সেটি যাতে শুকিয়ে না যায়, সেজন্য সাধনার পুণ্য জলে পরিপূর্ণ করতে শেখান তিনি। তখন গুরু বিষ্ণু। আবার গুরুই শিষ্যের সাধনায় সদাসর্বদা প্রহরী। যাতে পতন না হয় যাতে অন্যায় চিন্তা তার মনের রাজ্যে প্রবেশ না করে, গুরু তখন সদাসতর্ক প্রহরী মহেশ্বর।

ব্রহ্মার লাল রঙে ব্রহ্মার মূর্তিতে লামাকে আমার ধ্যানের চক্ষে দেখেছি। দেখেছি, নীলরঙের বিষ্ণু। দেখেছি, শুভ্র জ্যোতির শিব-সুন্দর।

আমার মনের আকাশে এতো সব দেখাদেখি চিন্তা করাকরি ধ্যান ধারণায় মগ্ন থাকাথাকি, সমস্ত যেন কেমন ছন্নছাড়া কেমন তছনছ হয়ে যেতে লাগল। যাঁকে আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের আসনে বসিয়েছি, কোথায় তাঁর ব্রহ্মচিন্তা! উপদেশ দেবার বেলায়

স্বয়ং ব্রহ্ম। কিন্তু পালন করার বেলায় তিনি তো সাধারণ মানুষ। যা বলি তা করি না।

আমার ভালো লাগে না। রাতেদিনে যতক্ষণ জেগে থাকবেন—মুখে ওই একটা নামেরই উচ্চারণ জপের মতো। সাইলামো।
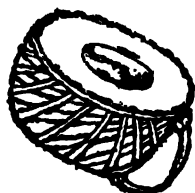
পঞ্চালীর পঞ্চ স্বামী ছিল। যুধিষ্ঠির থেকে সহদেব অবধি। এখানে সাইলামো পাঞ্চালীকেও ছাড়িয়ে গেছে। অষ্ট স্বামী। একে নিয়েই উন্মত্ত লামা। কারণ, মাস খানেক বয়েসের যে স্বামীটি সবে জন্মেছে, তার ওপর যমের নজর পড়েছে নাকি! এই নজরদোষ কাটাবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে মরছে সাইলামো। লামাকে অনুনয়-বিনয়—তার কনিষ্ঠতম স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে যে করে হোক। আট ভাইয়ের স্ত্রী সাইলামোর কি বেদনা কি কান্না!

তিব্বতী পরিবারে বড় ভায়ের স্ত্রী সাইলামো। এক ভায়ের স্ত্রী হলেই সকল ভায়ের স্ত্রী হতে হবে রীতি-নীতি অনুসারে। যারা বেঁচে আছে, তাদের ওপর মায়ামোহ হওয়া স্বাভাবিক। তাদের কিছুতে কান্নাকাটি সাজে তবু। যে ছেলে দুনিয়ায় এসেছে কিছুদিন মাত্র, তার জন্যে এরকম আকুল-ব্যাকুল ভাব কেমন করে হতে পারে! আমি তো ভেবে ঠিকঠিকানা পাই না কোন। কেবলই আমার মনে হয়েছে, এটা প্রথার সম্মান রাখতে গিয়ে সাইলামো ভান করে। একথা লামাকে বলেছি আমি। লামার দু'চোখে জল দেখেছি। হাসিমুখে বিষাদের ছায়া। বলেছেন, সাইলামোর মন তুমি বুঝবে না। তোমার মতো পাথর কঠিন নয়, ও নরম মাটি।

পাথর কঠিন নয়, নরম মাটি। কথাটা বড্ড বেশী রূঢ় শুনিয়েছে আমার কানে। উনি মোহমুক্ত হতে বলেন, মনকে সকল ব্যাপার

থেকে মুক্ত করে রাখতে বলেন। কিন্তু উনি নিজেই তো মোহে আবদ্ধ। মোহেতেই মানুষের যুক্তি-বিচার হারিয়ে যায়, একথা ওঁর মুখ থেকে শোনা। যুক্তি-বিচার হারিয়ে গেছে ওঁর। নরম মাটির মন দেখালেন সাইলামোর। সংসারী লোকের মতো মনোমত কথা না শুনতে পেয়ে আমাকে খোঁচা দিতেও কসুর করলেন না। আমার পাথর-কঠিন মন বলে আঘাতও হানলেন, আবার অভিমানে দু'চোখের জলও ফেললেন।

দেখেশুনে গুরুতে অরুচি, যোগ শিক্ষায় অরুচি ধরেছে আমার। তীর্থনাথের চোখে লামা সর্বজ্ঞ লামা মহাপুরুষ লামা মহাযোগী লামা তান্ত্রিক। আচার-আচরণে তার একটা কণাও দেখছি না আমি কোথাও।

মুক্তপুরুষ সম্বন্ধে তীর্থনাথ আমায় বলেছিলেন, গৃহী হোকে লাগায় ধ্যান/ভোগী হোকে কহে জ্ঞান/যোগী হোকে ঠকে ভগ/তিনো আদমী মহাঠগ। সদাসর্বদা বিষয়ের চিন্তায় যে গেরস্ত মগ্ন, সে নাকি ঈশ্বরের ধ্যান করছে দিনরাত! নিজের অনুষ্ঠানের ত্রুটি হলে রুদ্র-মূর্তি ধরছে যে, ভোগ-বিলাসে উন্মত্ত—তার নাকি ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। তন্ত্রের পশ্বাচার সাধনায় হিংসা নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধ স্বপ্নেও কোন রমণী চিন্তা। রমণীকে কামনার পাত্রী হিসেবে দেখে যে দিনরাত, সে নাকি পশ্বাচারী মহাযোগী! এসব উপদেশ দেবার সময় তীর্থনাথ বলতেন, একথা তোমরা মনে রাখলে আসল গুরু নকল গুরু বোঝবার অসুবিধা হবে না কোন। নিজেদেরও ভুল করে ঠকবার ভয় থাকবে না। এই সমস্ত লক্ষণের ঊর্ধ্বে লামাও নন। প্রকৃত যোগী কে হতে পারে, সে বিষয়ে সুন্দর একটি গল্পও শুনিয়েছিলেন তীর্থনাথ।

—রাজার মনে দারুণ অশান্তি। খেয়ে সুখ নেই শুয়ে সুখ নেই। প্রাচুর্যের বিরক্তি সদাসর্বদা মনে। ঐশ্বর্যের ওপর পায়ে পা দিয়ে বসে আছেন। বিষের জ্বালা অনুভব করছেন। রূপসীদের নাচগানে ভূমিকম্প দেখছেন—পায়ের তলার মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে যেন। সব ধসে পড়ছে। পুত্র-কন্যা রানী সবাই পৃথিবী ছেড়ে চলে

যাচ্ছে যেন! কি জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন! মাঝে মাঝে কুলগুরুর গীতার ব্যাখ্যা কানে বেজে উঠছে। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন। অর্জুন, যা করবার আমিই সব করে রেখেছি। তোমার জন্যে কার মৃত্যু হবে? এচিন্তা তোমার ভুল। চেয়ে দেখ, সকলেই মরে পড়ে রয়েছে। সব কিছু আমি আগে থাকতে করে রেখে দিয়েছি।

স্বর্ণ-সিংহাসনে বসে রাজা শিউরে উঠেছেন। আংটির হীরেতে বাজপড়ার বিদ্যুৎ চমকে উঠেছে। চোখে অন্ধকার দেখছেন রাজা। সবই কি হারিয়ে যাবে তাহলে? সবই কি নশ্বর, সবই কি অস্থায়ী? এই দেহ—এই নশ্বরকান্তি এই যৌবন এই রাজ্য কিছুই থাকবে না?

রাজার কানে কানে কথা কয়ে ওঠে কে যেন। না-না-না।

অশান্ত মনে দরবারে উন্মত্তের মতো পায়চারি করেন রাজা। মন্ত্রী অনেক সান্ত্বনা দেন, কিছুই যাবে না। রাজা শান্তি পান না। এ একটা স্তোকবাক্য স্রেফ। দেশবিদেশের সাধুসন্তকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসেন। এক বিন্দু শান্তি পাবার আশায়। কত জনে কত শাস্ত্র ব্যাখ্যা শোনালেন, কত ধর্মকথা কইলেন, কত উপদেশ দিলেন। কিছুতেই কিছু হল না। রাজার মনের ব্যাধি সারল না। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন রাজা। মাথার মধ্যে ক্রোধ বাসা বাঁধল। উষ্ণ রক্তের স্রোত বইছে। ইচ্ছে করছে, এক একজনের রক্ত দেখে তার নিজের রক্ত ঠাণ্ডা করেন। ক্ষেপে ওঠার লক্ষণ যাকে বলে। পারিষদবর্গ আত্মীয়স্বজন মন্ত্রী, সকলেই ভয়ে তটস্থ। কারুর সাহস হচ্ছে না রাজার সঙ্গে দেখা করবার।

ঢাক পিটিয়ে আদেশ প্রচার করলেন রাজা। যে তাঁকে শান্তি দিতে পারবে, সেই লোককে সর্বস্ব দিয়ে তিনি দেশত্যাগী হবেন। রাজ্যপাট করার সাধ তার মিটেছে। শুধু একটি মাত্র শর্ত। রাজাকে শান্তি দিতে না পারলে মৃত্যুদণ্ড।

রাজ্যলোভে এসেছে অনেক লোভী। রাজাকে তৃপ্তি দিতে পারে নি কেউ। বন্দী করে রেখেছেন রাজা সকলকে। পাইকারী হারে মৃত্যুদণ্ড দেবেন সকলকে একসঙ্গে। রাজার অস্থিরতা চরমে পৌঁছেছে।

ডেকে পাঠালেন তিনি কুলপুরোহিতকে। বললেন, এত দিন কুলের হিত কামনা করে এসেছেন। এবারে আমার একটা ব্যক্তিগত হিত করতে হবে আপনাকে। পথ বাতলে দিন—কেমন করে, কি করে শান্তি পাই।

কুলপুরোহিতের উপদেশে আর ওঁর নির্দেশ মতো ক্রিয়াকলাপে কোন ফলই পাননি রাজা। বন্দী করেছেন পুরোহিতকে।

পুরোহিতের একটি মাত্র ছেলে, পাগলাটে ধরনের। রাজদরবারে এসে বুক চিতিয়ে বলল, মহারাজ, বাবা আপনাকে শান্তির রাস্তা দেখাবে কোত্থেকে? বাবা কি জানে? নিজের বুকে হাত চাপড়ে বলল, জানি আমি। আপনার মনের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে আমিই মুক্তি দিতে পারি কেবল।

মৃত্যুর স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনলেন পুরোহিত নিজের কানে। নিজের নয়, ছেলের। ছেলেটা বেঁচে থাকলে তবু বংশ রক্ষে হত, বংশে বাতি পড়ত। যজমানের ঘর বাঁচত। সে আশা নির্মূল হয়ে গেল। ছেলে পারবে না জানে। কত গেল মহারথী…। রাজাকে প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিল পুরোহিত-কুমার। সে যা করবে, রাজা তাই করবেন। সে যা বলবে, রাজা তাই শুনবেন।

দু'টি বড় কাছি সঙ্গে নিয়ে ডান পাশে রাজার হাত আর বাঁ পাশে পুরোহিতের হাত ধরে পুরোহিত-কুমার এসে হাজির হল শ্মশানে।

সামনা সামনি দু'টি বটগাছে কাছি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে দু'জনকে বাঁধল। নিজে মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল, মহারাজ, আপনার কুলপুরোহিতকে আপনার বাঁধন খুলে দিতে বলুন!

সরোষে রাজা বলে উঠলেন, কি আশ্চর্য কথা! তুমি অতি মূর্খ। কুলপুরোহিত নিজেই বাঁধা অবস্থায় রয়েছেন। কেমন করে আমাকে খুলে দিতে আসবেন?

পুরোহিতের কাছে এগিয়ে এসে কুমার বলল, বাবা, আপনি রাজার বন্ধন খুলে দিন। বাবা বলল, পাগলের মুখেই একথা সাজে।

রাজার কাছে এগিয়ে এলো কুমার। বলল, মহারাজ, আপনারা দুজনেই বাঁধা, কেউ কাউকে মুক্ত করতে পারবেন না। পারি আমি। কারণ—আমি মুক্ত। মোহবন্ধনে বাঁধা যারা, তাদের কাছে আপনি মুক্তি আশা করেন কি করে? আমি যোগী, লয়যোগের সাধনায় আমি আপনার মনকে নির্লিপ্ত করে দিয়ে, অশান্তির আগুন থেকে মুক্ত করতে পারি।

গল্প শেষে তীর্থনাথ বলেছেন, লামা ওই পুরোহিতের ছেলের জাতের, কোন বন্ধনেই তিনি বাঁধা নন। যোগের রাস্তা উনিই তোমায় প্রকৃত বাতলে দেবেন। এ অধিকার ওঁর, আমার এখনও আসেনি।

ধ্যান-ধারণা করতে যোগের চক্র সাধনা করতে মন চায় না আর আমার। সেই শূন্য জায়গায় নানান ছবি এসে উপস্থিত হচ্ছে—তীর্থনাথের নানা উপদেশ নানা গল্প।

আমি ঠিক করলুম, ঝুটমুট শান্তি যদি না পাই, এ অশান্তি ভোগ আমার কেন? খুব হয়েছে সাধনভজন। ঠিক করলুম, তিব্বত ছেড়ে চলে যাব। আবারও সেই গাঁয়ের মেয়েদের একসঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে গানের কথা মনে পড়ছে আমার। মানস সরোবরে চান করলে দেহের ময়লা যায়, মনের ময়লা যায় না। লামারও যায় নি। আমারও গেছে কোথায়?

লোকটির এই একটা গুণ এখনও রয়েছে। মোহে আচ্ছন্ন থাকুক, আর যাই থাকুক— মনের কথা শুনতে পাওয়া। একটুও চেপে রাখার উপায় নেই, একটুও লুকোবার উপায় নেই। মনে যা যা ভেবেছি, সবই শুনেছেন উনি। হাসতে হাসতে সামনে এসে দাঁড়ালেন। সেই আগকার পবিত্র ঢল নামা হাসি। বললেন, উঃ, কি কষ্টই না পাচ্ছ তুমি আমাকে নিয়ে! ভালো, একটা সোনা থেকে খাদ বার করতে হলে আগুনে গলাতে হবে তো তাকে। একটা লোহাকে ইস্পাত করতে গেলে কত পোড়ান কত পেটান! এ সবেরও প্রয়োজন আছে। যাঁর মনে এসব উঁকিঝুঁকি

না মেরেছে, সে আত্মবিশ্লেষণের পথে এগোবে কি করে? কেমন করে নিজের চোখ দিয়ে অপরকে দেখবে বুঝবে? মানুষের আত্ম-বিশ্লেষণই আসল ধর্ম। আমাকে ফালাফালা করে কেটে দেখতে গিয়ে দেখেছ, মনের ময়লা যায় নি। তবে আমি ভারী খুশী হয়েছি তোমার ওই কথাটায়। নিজেকেও ক্ষমা কর নি। বলেছ, আমারই বা গেছে কোথায়! এতেই তোমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে।

একজন্মে মনের কত জন্মই না হয়! আমারও তাই হচ্ছে। এই অন্ধকার এই আলো, এই আলো আবার অন্ধকার। আবার আলো। ভালো কথা শুনে কার না আনন্দ হয়? আমারও হয়। যতবার শুনি, ততবার নতুন করে। যেন এমন আনন্দ এর আগে পাই নি। আগের চেয়ে অনেক বেশী, অন্য স্বাদের।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে আমার। নানা ধারণার ভুল ফসল নিয়ে মিছে নাড়াচাড়া। তার চেয়ে নিজের দিকে ফিরে তাকানো ভালো. যতটা পারা যায় এগিয়ে থাকা ভালো। মনে পড়ে গেল, ছোটবেলাকার কথা, অতশত মানে বুঝি নি তখন। এখন বুঝেছি। ছোটকথা, কত বড় মানে! কথার বাঁধছাঁদ নেই, তবু প্রাণের ছন্দে গাঁথা। শুনতে তেমন ভালো নয়, উচ্চারণেও ম্যাড়মেড়ে। কিন্তু কথা কইলে যে সুর বেজে ওঠে, কত সাধ্যসাধনার মীমাংসার সে সুর। যে আলো জ্বলে ওঠে, আকাশের ধ্রুবজ্যোতিও ম্লান দেখায় তখন।

গাঁয়ের প্রাচীন কথা। তবুও এগিয়ে চলার অমূল্য পাথেয়। যুগ বদলালেও এ পাথেয় অক্ষয় অবিনশ্বর। মায়ে-ঝিয়ে মঙ্গলবার করে, যে যার মঙ্গল সে তার করে। যে মোহ-অন্ধ হোক, যাই হোক। বিচারে আর সময় নষ্ট না করে নিজের বিচারে এগিয়ে যাওয়া যাক।
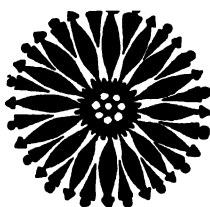
গুম্ফার শেষের ঘরে ফিরে এলুম আমি।

এ-ঘরটা আমার সাধনার। কাঠের চৌকির ওপরে কম্বলের আসন পাতা। ঘরের মধ্যিখানে একটা মাত্র জানালা সবে। এই ঘরেই অনেকে মহানির্বাণ লাভ করেছেন, লয় যোগের প্রাণায়াম-ধ্যান করতে করতে। এটা ওঁদের ইচ্ছামৃত্যু।

শরীর ছাড়বার ইচ্ছে হলে ওঁরা জানলা-দরজা বন্ধ করে সাধনায় বসেছেন। নির্দিষ্ট সময় দিয়েছেন দরজা খুলে ফেলবার। লোকে এসে দেখেছে, ধ্যানমগ্ন নিষ্প্রাণ দেহ। সেই ঘরে আজ আমি। আমার মনে হচ্ছে যাঁরা চলে গেছেন, তাঁরা যান নি। আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করছেন। বলছেন, ভালো ভাবে চক্রের সাধনাই সব সাধনার শ্রেষ্ঠ।

বাঁ পায়ের উরুর ওপর ডান পায়ের পাতা। ডান পায়ের উরুর ওপর বাঁ-পায়ের পাতা রেখে, কোলের কাছে ডান হাতের তেলোর ওপর বাঁ হাতের ওপর পিঠ রেখে, আমি পদ্মাসনে চক্রসাধনায় বসলুম। লামার নির্দেশ মেনে চলেছি। ধ্যানেতে পর পর ছ'টা চক্র, আর সেই চক্রের দেবী চোখের সামনে ভাসছে আমার। মেরুদণ্ডের শেষ যেখানে, তার একটু তফাতে মূলাধার, দেবী ডাকিনী। তার খানিকটা ওপরে মেরুদণ্ডের দিকে স্বাধিষ্ঠান, রাকিনী। মেরুদণ্ডেই—নাভির সমান সমান মণিপুর, কামিনী। বুকে হৃৎপিণ্ডের পেছনে অনাহত, কাকিনী। কণ্ঠের পেছনে বিশুদ্ধ, শাকিনী। ছ'টি ভুরুর মধ্যিখান থেকে পেছন দিকে আজ্ঞা, হাকিনী।

'ষং' মন্ত্রে নাক দিয়ে আমি নিশ্বাস টেনে নিচ্ছি। মণিপুর চক্রে সেই নিশ্বাস ধাক্কা দিতে, সেখানে লাল ধোঁয়ায় গড়ে উঠল কামিনী দেবীর মূর্তি। রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী। 'ষং' মন্ত্রর সঙ্গে

নিশ্বাসের বাতাস কামিনী দেবীর চরণ ছুঁয়ে নামছে নীচের দিকে। নামার সময় বাতাসে ধ্বনি উঠল, যং রং কাং লং। বাতাস নেমে এলো মূলাধার চক্রে। পীতবর্ণের আসনের ওপর গোলাপী রঙের শিবলিঙ্গ। আড়াই পাকে বেষ্টন করে রয়েছে বিদ্যুৎলতা কুলকুণ্ডলিনী। 'যং'-এর বাতাস চক্রের কন্দর্পবাতাসে মিশে আলোড়ন তুলল। আলোড়নে কেঁপে উঠল কুলকুণ্ডলিনী। ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে ধীরে ধীরে 'যং'-এর বাতাস। বেরিয়ে গেল বাঁ-নাক দিয়ে। 'রং' মন্ত্রে নিশ্বাস টানছি আমি বাঁ নাক দিয়ে। 'রং' মন্ত্রের নিশ্বাস কামিনী দেবীকে স্পর্শ করে 'হ্ঃ' 'সঃ' 'ওঁ' 'কাং'-একটি চরণে ছুঁটি করে মন্ত্র সোনার আলোয় লিখে দিয়ে নেমে এলো মূলাধারে। কন্দর্পবাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে এবারেও আলোড়ন তুলল প্রথমবারের দ্বিগুণ। বিদ্যুৎলতা কুণ্ডলিনী জেগে উঠল। আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে 'রং' মন্ত্রের নিশ্বাস। ডান-নাক দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

ধ্যান-প্রাণায়াম, প্রাণায়াম আর ধ্যান চলেছে আমার। কতক্ষণ কেটেছে জানি না। সব ভুলেছি আমি, ভুলেছি প্রাণায়াম ভুলেছি স্থান-কাল। নিজের ইন্দ্রিয়কে নিজের রিপুকে। পঞ্চধূপ জ্বলে জ্বলে সুবাস ছড়িয়ে কখন নিভে শেষ হয়ে গেছে। বন্ধ দরজার বাইরে কখন থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছেন লামা। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেন নি, পাছে আমার কোন বিঘ্ন ঘটে।

নিজের মধ্যে নিজে ফিরে এসে যেমন ছিলুম তেমনি চুপ চাপ বসে আছি। উঠবো উঠবো ভাবছি। মৃদু টোকা মারলেন লামা। তিনি বুঝেছেন আমার ক্রিয়াকলাপ শেষ হয়েছে। দরজা খুলতেই একগাল হেসে বললেন, তুষারকণা, তোমাকে এক্ষুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে এক জায়গায়।

যেখানে এলুম, সে বাড়ির বউটি আমার চেনা। লামার কাছে দেখেছি তাকে অনেকবার। দু'পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে

কেঁদেছে। ওর জন্যে ভেতরে ভেতরে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছি। ওর কান্নার সহানুভূতিতে নয়। ওর ওপর বিরক্তির জন্যে। ওকে ভালো চোখে দেখি নি আমি। গ্রহের ফের কি না, জীবনে আর কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হব কি না বুঝতে পারছি না।

লামার মুখের দিকে তাকিয়ে হাড়পিত্তি জ্বলে উঠল আমার। কৌতুকের হাসি। লামা আমায় ডাকলেন সাইলামোর ঘরে। আমার অনিচ্ছা, উনি এসে আমার হাত ধরতে আমি কেমন হয়ে গেলুম। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওঁর সঙ্গে এলুম সাইলামোর ঘরে।

এক মাসের ছেলে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে ককিয়ে কেঁদে উঠল। সাদাটে রঙে নীলের ছোপ পড়তে লাগল। গলায় হাতে পায়ে···। ওইটুকু ছেলে কি হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে বড় মানুষের মতো! ছেলেটা যেন মৃত্যুর সঙ্গে যোঝাযুঝি করছে প্রচণ্ড! ওকে দেখে ওর কষ্ট দেখে আমার তাই মনে হল। এ সময়ে সৌরভের কথা মনে পড়ছে এত কেন?

ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছেলের মা—সাইলামোর শাশুড়ী। সাইলামোর দু'চোখ উপচে জল গড়াচ্ছে। ধরা গলায় লামাকে বলল, প্রভু, এ কষ্ট আমি আর দেখতে পারছি না দিনরাত। তথাগতর ইচ্ছে যদি হয়, সে ইচ্ছে আপনি পূর্ণ করুন তাড়াতাড়ি। নয় ও বেঁচে উঠুক সুস্থ হয়ে উঠুক।

কোমরে বাঁধা সামনে ঝোলান চারকোণা কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে নিয়ে বলল, শাশুড়ী তো বলেই দিয়েছেন, যতক্ষণ পেটে ছিল, ও আমার ভাগ্যে বেঁচে ছিল। এখন তো তোমার। এখন বাঁচে তো তোমার ভাগ্যে, মরে, তাও তোমার ভাগ্যে।

ডুকরে কেঁদে উঠল সাইলামো। প্রভু বলুন, আমার কি পোড়া ভাগ্য!

দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বর বেরিয়ে এলো লামার গলা থেকে। না, তুমি সৌভাগ্যবতী। তোমার এ স্বামী বাঁচবে, কোন ভয় নেই।

আমার ভেতরটাও মোচড় দিয়ে উঠছে সাইলামোর দুঃখে। আমি

মনে মনে বলছি, তথাগত, সাইলামোর ওপর আমার ভুল ধারণার জন্যে তুমি আমায় ক্ষমা কর। তুমি ওর স্বামীকে বাঁচিয়ে তোল। আমার জীবন নিয়েও যদি ও বেঁচে ওঠে, তাই উঠুক।

লামার চরণ স্পর্শ করে আমি বললুম, ওকে বাঁচিয়ে তুলতে যদি আমি কোন কাজে লাগি, আমি প্রস্তুত। লামা হাসলেন। ডান হাতখানা ক্ষণেকের জন্যে মাথার ওপরে রাখলেন। অনুশোচনার দংশনের জ্বালা নিমেষে জুড়িয়ে গেল আমার। মনে হল, সত্যি সত্যি ক্ষমাসুন্দর করুণাময় তথাগত এসে আমার মাথায় হাত রেখেছেন।

ছেলেটিকে ঘিরে গোল করে ধূপবাতি সাজান হল। ধূপের ধোঁয়ায় ছেলেটি ডুবে যাচ্ছে। লামা বেশ খানিক সময় ছেলেটির দিকে চেয়ে রইলেন। ওর কান্না থামল। ঘরের ভেতর ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবেশ করছে। ধূপের ধোঁয়া এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ছে। ধোঁয়া থেকে যেন ছেলেটি ভেসে উঠছে এবার। ঘুমবুড়ি দু'চোখের পাতায় ঘুমের কাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে গেছে কখন। ও ঘুমে অচেতন। নীল ছোপ কাটা দেহ থেকে মিলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মুখে অপূর্ব প্রশান্তি, ব্যাধি উপশমের মুখখানা ভালো লাগছে খুব। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে বুঝি।

ঘুমন্ত শিশুর কপালে পাঁচবার ধর্মচক্র ছোঁয়ালেন লামা। তারপর আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। পথে এসে সাইলামো শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম করেছে লামাকে। আমাকে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়েছি। ও আমার হাত ধরে আনন্দে কেঁদে ফেলে বলেছে, বোন, তুমি খুব পয়মন্ত। তোমার জন্যে স্বামী আজ আমার সুস্থ হয়ে উঠল। প্রাণে বেঁচে গেল।

আমি বললুম না। তথাগতের ইচ্ছে, লামার আশীর্বাদ তোমার চোখের জল। আমরা হেঁটে হেঁটে চলেছি। পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি, একভাবে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে সাইলামো। দেখতে দেখতে চলার পথে বাঁকের মোড়ে এসে পড়েছি আমরা। দৃষ্টি থেকে মিলিয়েছে সাইলামো, মন থেকে মেলায় নি।

লামাকে কিছু জিজ্ঞেস করি নি আমি। কোথায় যাচ্ছেন তিনি, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমায়। মনে কোন প্রশ্নই জাগে নি। সঙ্গে চলতে বহুদিন পর বেশ লাগছে। মন হালকা দেহ হালকা। আমি এখন যোগের অণিমা-লঘিমা হয়ে গেছি। মনে হচ্ছে, অণু থেকে অণু লঘু থেকে লঘু। মনে হচ্ছে, সব জায়গায় যেতে পারি সব কিছু দেখতে পারি, অজানা রাজ্য ভেসে ভেসে বেড়াতে পারি। আমার কাছে পাহাড়-পর্বত নদী-সমুদ্র, সব কিছু তুচ্ছ। কেউ আমায় আটকাতে পারবে না।

আপন মনে হো-হো করে হেসে উঠলেন লামা। বললেন, আজ বুঝি তুমি মানস সরোবরে চান করে-এসেছ ? কেমন, তাই না ?

অদ্ভুত অবাস্তব কথা শুনলে কার না বিস্ময় জেগে ওঠে ভেতরে। সারা দিন রইলুম মঠের ভেতরে। সাধনা-ধ্যানধারণা, সাইলামোর বাড়িতে আসা। সর্বক্ষণ লামাতো আমাকে চোখের পাহারায় রেখেছিলেন। সঙ্গেও এনেছেন। এ আবার কেমনতরো কথাবার্তা— মানস সরোবরে চান !

গম্ভীর গলায় বললুম আমি, আপনি কি অন্য জগতে ছিলেন সারাদিন ? ঠোঁটকাটা মানুষ, কথা বলেই জিভ কাটলুম। কি মুখই হয়েছে আমার ! মুখরা স্বভাবটা গেল না দেখছি।

লামার লক্ষ্য এড়ায় নি। উনি বললেন, বলেছ তাতে আর লজ্জা কিসের ! ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই তো আমরা সব দেখি। মানস সরোবরে চান করলে মনের ময়লা যায় না। কিন্তু ভেতরের ধ্যানধারণাটার সরোবরে চান করলেও কি যায় না ? আমি দেখছি তোমার তো গেছে। লজ্জায় মুখ নীচু করেছি আমি। চাপা গলায় বলেছি, এই দুষ্টু মেয়ে এই অবুঝ মেয়ের উপযুক্ত গুরু আপনি।

কথায় কথায় কোথায় চলে এসেছি জানি না। অচেনা জায়গা, অচেনা পরিবেশ, চতুর্দিকে বরফের স্তূপ। দাঁড়িয়ে পড়লেন লামা। নীচের দিকে চেয়ে আমাকে বললেন, এটা কার চেহারা চিনতে পার কি ?

আমি ঘাড় নাড়লুম, না।

উনি বললেন, ভালো করে চিন্তা করে দেখ, তোমার চেনা লোক।

আমি নীচের দিকে তাকিয়ে দেখছি একটা বরফের মানুষ শুয়ে। বললুম, এ তো বরফের মানুষ! বরফের মানুষ কি করে আমার চেনা হবে? হেসে ফেললুম। হাসলেন লামাও। বললেন, আজ বরফের মানুষ হলেও একসময় এ রক্তমাংসের মানুষ ছিল। সেই মানুষকে দেখছি আমি। তুমি দেখতে পাচ্ছ না। আমার দৃষ্টি দিয়ে তুমি দেখার চেষ্টা কর, দেখতে পাবে।

উনি আমার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বেশ বুঝতে পারছি, আমার মাথার পেছনে ওঁর অপলক দৃষ্টি। বরফের মানুষে যে মানুষকে দেখলুম, আঁতকে উঠলুম আমি। উনি সরে এলেন পাশে। বললেন, এবার চিনতে পেরেছ?

বললুম, বিলক্ষণ।

লামা বললেন, ছেলেটি—সাইলামোর স্বামীর বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিল। ডাকাতির পাওনা হিসেব নিয়ে তুমুল সংগ্রাম দু'জনে। বন্ধু জিতেছে। আর এই বরফ-মানুষের আসল মানুষ হেরে গেছে। এ ছিল দলের সর্দার। অস্ত্রের আঘাতে দু'জনে এত ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল যে, দু'জনেই ভূমিশয্যা নিয়েছে। বন্ধু জন্মেছে সাইলামোর স্বামী হয়ে। সর্দার জন্মায় নি এখনও। তারই প্রেতাত্মার প্রভাব পড়ত সাইলামোর স্বামীর ওপর।

তিব্বতে আসার পথে যে দৃশ্য দেখেছিলুম আমি, আবার দেখছি যেন। রমণীর বেশে পথ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে, নিজের ছদ্মবেশ টেনে খুলে ফেলে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল নির্দয়ভাবে। প্রাণ-ধন ছিনিয়ে নেবে বলে। সেই প্রধান সেই বীভৎস মুখ নিয়ে আমার সামনে আবার এগিয়ে আসছে। বরফের ওপর দাঁড়িয়ে আমি, অত ঠাণ্ডা—আমার ভেতর শুকিয়ে কাঠ। এগিয়ে আসছে।

আমি নিথর-পাথর হয়ে গেছি। ওই নৃশংস মূর্তি এগিয়ে আসছে। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে ধর্মচক্র। এটা কি

আমার কল্পনা ?

না। সত্যি সত্যিই দেখছি আমি। সামনে এগিয়ে এসে চক্রটা নিজে হাতে ঘোরাচ্ছেন লামা। মিলিয়ে যাচ্ছে ওই বীভৎস মুখ ওই নৃশংস মূর্তি। অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিভীষিকার সর্বস্ব দিয়ে গড়া যে মূর্তিটি, চোখের সামনে ভেঙে খানখান হয়ে গেল। অর্থাৎ মিলিয়ে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভাবলুম, এবার মঠে ফিরে যেতে হবে। মোড় ঘুরে মানস সরোবরের পথে পা বাড়াতে গেছি সবে, মাথা নেড়ে নিষেধ করলেন লামা। নির্দেশ দিলেন সোজা পথে চলতে।

লামার মুখে হাসির আভাস।

ও-হাসির ছোঁয়ায় আমার মুখে অভ্যস্ত ভদ্রতার হাসি ফুটে উঠেছে, অন্তরের নয়। লামাকে জানি, বিচক্ষণ দৃষ্টি। মনের গোপন চিন্তাও গোপন থাকে না ওঁর মনের পরদায়। জ্বলজ্বল করে ভেসে ওঠে স্পষ্ট। এ প্রমাণ পেয়েছি বহুবার। এবারও পেলুম।

উনি বললেন, মুখে এক মনে এক করা ভালো নয় কিন্তু। এতে অন্যের তেমন কিছু না হলেও, নিজের ক্ষতিটাই বেশী। ছল-কপট আচরণে তৈরী হয়ে উঠতে মনকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে যায়। এভাবে ছেড়ে দিলে, ভবিষ্যতে সামলানো দায় হয়ে ওঠে। তখন, যারা সৎ হতে চায়, মানসিক নির্যাতনে বিশেষ করে ভুগতে হয় তাদের। এগোনোর পথে এক পাথর চাপা বাধা এসে দাঁড়িয়ে থাকে সর্বক্ষণ।

আমি হেসে ফেলে বললুম, সবই তো বুঝি, কিন্তু বাস্তবে কি সমস্ত উপদেশ খাটে সব সময়? সেই থেকে বরফের ওপর হেঁটে

হেঁটে পা দুটো যে খসে পড়তে বসেছে, ভারী বোঝা হয়ে উঠছে—সেদিকে কোন সহানুভূতির সাড়া পেলুম না তো এতটুকুও আপনার ভেতর থেকে! মনের ব্যাপার দেখতে পান যখন, মনের কথা শুনতে পান যখন, তখন এ বিষয়ে কিছু ভাবাটাও কি নিষেধ? মনোবল আর দেহের শক্তির যোগান দিন না, সারাজীবন আপনার সঙ্গে হেঁটে চলবো। রাত নেই দিন নেই—কোন সময়ের বালাই রাখবো না মোটে।

এবারে লামা গম্ভীর। বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট নয়। মোলায়েম স্বরে বললেন, দেহ-মন এমন বস্তু—অপরের ওপর অবলম্বন করতে করতে পঙ্গু হয়ে যায় একেবারে; অভ্যাসে তোমাকে—নিজেকেই শক্তসমর্থ করতে তুলতে হবে। এখানে আমার কোন মদত পাবে না তুমি। আশা করাটাও বৃথা।

লামা তাকালেন আমার দিকে। চলা থামালেন না, চলছেন। আমার আকুতি নাকচ করে দিয়ে উলের বুটজুতোয়—শোম্পায় মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলেছেন মন্থর গতিতে।

হ'ক গুণী হ'ক যোগী হ'ক সর্বজ্ঞ—ব্যাপারস্যাপারে হাড়পিত্তি জ্বলে উঠছে আমার। চলনেরই বা ছিরি কি! ঠাণ্ডায় জমে যাবার যোগাড়, কোথায় শরীরের রক্ত গরম রাখার জন্যে ছোটার মতো করে চলবেন, তা নয়—এ যেন আমার সঙ্গে রেষারেষি।

আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ওঁর আগে এগিয়ে চলেছি। প্রায় দৌড়ে দৌড়ে বললেই হয়। ওঁর বিরাট দেহ একটা আস্ত চলন্ত বরফ-পাথর। গলবেও না টলবেও না। আর নতুন করে জমে গিয়ে বরফের রাস্তায় আটকে পড়ার কোন ভয় নেই। আমার আছে। শীত-গ্রীষ্ম সমান ভেবে নিতে এখনও পুরোপুরি সক্ষম হই নি আমি।

শীতে ঠাণ্ডা অনুভব করবো না, গরমে গরম—মনের এমন অভ্যেস হয়ে ওঠে নি। এসব মুখে বলা যত সহজ, কাজে অত্যন্ত কঠিন। দরকার অনেক সময়ের।

আমি ছুটে ছুটে চলেছি।

লামা ডাকলেন।—অত যদি মরণের ভয় তো সাধনা শিখতে আসা কেন এখানে ?

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পেছু ফিরে তাকালুম।

ওঁর মুখ কঠিন, স্বরও। বললেন, তুষারকণা, তোমার উদ্ধত-ভাবটা ত্যাগ না করলে কিচ্ছু হবে না। হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিলেন পাশে পাশে চলতে।

খানিক এগিয়ে গিয়েও পেছিয়ে আসতে হল আবার। পুন-র্মূষিক ভব। একটু তফাৎ রেখে দু'জনে চলছি আমরা সমান তালে পা ফেলে ফেলে।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য লামার মুখে এঁটে বসে থাকে নি বেশীক্ষণ। উনি আমার চলার ধরনধারণে আর হাঁপিয়ে পড়তে দেখে, হেসে ফেললেন। —বড্ড কষ্ট হচ্ছে—না ? সামনের দিকে দ্যাখো—কতটুকুই বা পথ —শেষের বাড়িটা। অনেক কাছে মনে হচ্ছে না ?

মুখে বললুম না কিছু। স্নমুখে মাথা ঝুঁকিয়ে ইঙ্গিতে জানালুম স্রেফ—হ্যাঁ।

এখানকার এমন আবহাওয়া, অনেক দূরের জিনিসও দেখা যায় খুব স্পষ্ট। যেন কত কাছে। এ অভিজ্ঞতা হল আমার চলে-চলে পা ব্যথা হয়ে যেতে।

এবার যেখান দিয়ে চলছি, একেবারে মৃত্যুকে সঙ্গী করে নিয়ে। পায়ের তলার মাটি নরম। মাটি-পাথর মিলেমিশে ধসে পড়ছে থেকে থেকে। পাশে বিরাট গভীর খাদ।

আমাকে আর বলতে হল না কোন কথা। ওঁর ডান হাতখানা ডানদিকে ছড়িয়ে দিয়ে আগলে আটকালেন যেন আমায়। চলার মোড় ঘুরল। অন্য রাস্তা। চোখের ভাষায় অনুসরণ করতে বললেন। শেষের নির্দিষ্ট বাড়ির কাছে এসে পৌছুলুম।

বাড়ির মেয়ে-পুরুষ—সকলে লামার অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে। অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে যাবে। ওরা ছুটে এসে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা-প্রণাম জানাল। ধুপ-ধুনোর ধোঁয়ায় বাতাস ভরিয়ে, রাস্তায় পাতা

নানা রঙের ফুল আঁকা কার্পেটের ওপর দিয়ে নিয়ে চলল লামাকে।

বাড়ির দরজার হু'পাশে ভালুক লোমের নীল চোখো নেকড়ে-প্রমাণ রাক্ষুসে কুকুর হুটো নিরীহ চাউনিতে চেয়ে আছে। এমনতরো প্রকৃতি কিন্তু মোটেই নয় এদের। এদের ডাকে কেবল আকাশ-পাহাড় কাঁপে, তা নয়। ভয়ে মানুষের বুক থরথর, কল্‌জের রক্ত জমাট লাল বরফ।

এহেন কুকুরদের কোন্‌ মন্ত্রবলে, না যাহু বলে—বুঝলুম না—হিংস্র স্বভাব বদলে গেছে। ধীরস্থির। পাথুরে জন্তু বুঝি। হতেও পারে বাড়ির চেনা লোকেদের সঙ্গে আমাদের দেখে।

যে ঘরে এসে রেশমের গালচে পাতা কাঠের আসনের ওপর বসলুম আমরা, সে ঘরে খাটের ওপর লাল রেশমী কাপড়ে মোড়া ঘাসের গদির ওপর শয্যাগত একটি তরুণ। বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ। মড়া মানুষের ঘষা কাঁচের চোখের তারায় নীল পাথরের মণি হুটো জেগে আছে যেন। অপলক দৃষ্টি লামার মুখের ওপর। ক্ষীণ নিশ্বাসের ওঠানামা চলছে। বুকে চাপা হলুদ চাদর কাঁপছে মৃহু মৃহু। অন্য কোথাও নয়, শুধু বাঁদিকের বুকের মাঝে একটুখানি জায়গায়।

দেখে মনে হয়, শরীর ছেড়ে প্রাণ বেরোবার প্রস্তুতি চলছে ওর ভেতরে। আমার খুব মায়া হল। তরুণটি বিয়ে-শাদী করেছে সবে। তিব্বতী প্রথা মানে নি। এর বৌ—সব ভায়ের এক বৌ নয়। ওরই একার স্ত্রী। নিজের বাড়িতে ভায়েদের সঙ্গে নেই। আলাদা। অন্য জ্ঞাতিদের সঙ্গে বাস করছে এখানে। বরাত মন্দ, বাড়ি ত্যাগের পর শয্যা নিয়েছে। সেই থেকে হু'তিন মাস হয়ে গেল, উঠতে পারছে না আর।

এত ভুগছে, মৃত্যুপথের যাত্রী। তবু এ স্ত্রীর ওপর থেকে এতটুকুও আকর্ষণ কমে নি। ভায়েরা কত না উপদেশ শুনিয়ে গেছে ছেড়ে দিতে। বলেছে, টের পেয়েছো তো হাতে হাতে। আর কেন?

অল্প হেসে বলেছে তরুণ, ভাগবাটোয়ারায় সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাবার ভয়েই তো একটা বৌ। সংস্কারের ধ্যামো মাথায় ঢুকিয়ে মনটাকে

আর নাই-বা দুর্বল করে দেবার চেষ্টা করলে। দোহাই তোমাদের ? মরি যদি—শান্তিতে মরতে দাও।

লামার পায়ে ধরে নীরবে কাঁদছে ওর বৌ। উঠে বসতে বললেন লামা, বললেন শান্ত হতে। বৌটি করুণ কণ্ঠে বলল, আমার জীবন নিয়ে যদি ও জীবন ফিরে পায়, তাই করুন!

মুমূর্ষু রুগী চঞ্চল হয়ে উঠল। নড়ে উঠল দু'টি নীলচে ঠোঁট। বহুদূরের কোন ক্লান্ত মানুষ নিস্তেজ নিষ্প্রাণ গলায় কথা কইছে ওর মুখ দিয়ে: জোবা—স্বামী, ওকে আপনি দয়া করে বাঁচিয়ে রাখুন। আমার পরমায়ু যদি ফুরিয়ে থাকে, যেতে দিন। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, আবার আসবো আমি ওরই জন্য।

কাউকে কিছু বললেন না লামা।

এখানকার লামা শাস্ত্রজ্ঞ শিক্ষক সন্ন্যাসী জ্যোতিষী চিকিৎসক। ছক কেটে তরুণের কোন গণনা করলেন না ইনি। কোন দাওয়াইও বাতলে দিলেন না। ধর্ম-উপদেশ শাস্ত্রের বাণী শোনালেন না। একটু আনমনা হয়ে থেকে, সাজান ঘরখানার চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার।

তরুণের খাটের পাশে আর একখানি খাট, একই মাপের। অতটা উঁচু নয়, খুবই নীচু। মেঝে থেকে বেগদা খানেক উঁচু। একটা মাটির পুরুষ-মূর্তি শোয়ান। তরুণের প্রতিরূপ নাকি? শ্রীঅর লামা বিড়বিড় করে কি সব বললেন বোঝা গেল না ঠিক। মূর্তির চারধারে বারবার ঘোরাতে লাগলেন একটি রূপোর চোঙা—মানী। মানীর ভেতর কাগজে লেখা লাখ মন্ত্র পোরা রয়েছে। একবার ঘোরান মানে লাখ বার জপ করা। দশ বার ঘোরালেন উনি। মূর্তির বুক থেকে পা অবধি চাপা হলুদ চাদর টেনে তুললেন। চারটে কোণ খুব ছোট করে কেটে নিয়ে প্রদীপ শিখায় জ্বালিয়ে নিলেন।

মাঝের আঙুলে চাদরের কোণ পোড়া ভস্ম লাগিয়ে তরুণের কপালে বুকে পেটে ছোঁয়ালেন। মূর্তিটিকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে

বললেন। গ্রামের বাইরে ফেলে দেওয়া হবে। তরুণের আপদবালাই আর ব্যাধির বিদায়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলুম আমরা। আমি লামা আর চারজন মূর্তিবাহক। দু'জন সামনে, দু'জন পেছনে।

লামা-আমি পাশাপাশি এগিয়ে চলছি, পেছনে মূর্তিবাহকরা। মূর্তিবাহকরা লামার আদেশে ডাকিনী দেবীর মন্ত্র উচ্চারণ করছে সমস্বরে।—ওঁ হ্রীং ডাকিনী আ হুঁ···।

মন্ত্র শুনতে শুনতে আমিও মনে মনে উচ্চারণ করে চলেছি। চতুর্দিকের পরিবেশে একটা থমথমে ভাব জেঁকে বসছে ক্রমে। ঠাণ্ডা বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেছে। নিশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট। সারা শরীরে একটা অবসন্ন ভাব ভর করেছে।

গ্রামের শেষে এসে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিল ওরা মূর্তিটি। পেছু ফিরে না তাকিয়ে সকলে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। লামা ও আমি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে। ওঁর দৃষ্টি নদীর জলে। ওই দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি দেখছি আর আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। এও কি সম্ভব! যে জায়গায় মূর্তি ডুবছে, জল ফুলে ফেঁপে একটা স্তম্ভের আকার নিচ্ছে। আমার মনে হল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ওই জলস্তম্ভ আমাদের দিকে এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। টেনে নিয়ে ডুবিয়ে মারবে।

লামা বললেন, আর একদণ্ড দেরী নয়। তাড়াতাড়ি ফিরে চল।

যত দূর শক্তি আছে শরীরে, পা চালিয়ে চালিয়ে চলেছি। কিন্তু বিপদ রাক্ষুসে মূর্তি ধরে আমাদের গেলবার জন্য দৌড়ে এলো। জলস্তম্ভ নয় আকাশের মেঘ। আমাদের ছোটার সঙ্গে ছুটে ছুটে আসছে ব্রহ্মতালু লক্ষ্য করে। ঝোড়ো হাওয়ায় লামার হলুদ রেশমেতে ঢাকা নেকড়ের ছালের পোস্তিন উড়ছে। মাথার হলুদ টুপি কোথায় উড়ে গেছে কখন! চোখের সামনে থেকে মুহূর্তে অদৃশ্য। আমার একই অবস্থা।

বরফ বৃষ্টি নামল। পোস্তিন ছ্যাঁদা করে চামড়া রগড়ে ঘষড়ে তুলে দিয়ে হাড়ের ভেতর তীর বিঁধছে যেন। চারদিকে তাকাচ্ছি

আমি। দুর্যোগের আবহাওয়ায় একটু আশ্রয় কি কোথাও পাব না! পরমায়ু লেখার খাতায় আমার নামের পাশে বিধাতাপুরুষ কি এই অন্ধকার বিকেলে ইতি টেনে দিয়েছেন!

আমি কিছু দেখতে পেলুম না। না গাছ না বাড়ি না পাহাড়ের গুহা। লামা ভুরুর ওপর হাত রেখে কি যেন কি দেখলেন এক দৃষ্টে কোথায়! আনন্দে বলে উঠলেন, তুষারকণা, এখনও মরার সময় আসেনি! মাথা গোঁজার জায়গা পেয়ে গেছি। সময় নেই অসময় নেই লামার এই বিদ্রূপবাণ আমার অসহ্য হয়ে ওঠে। হয়ে উঠলেও এঁকে ছেড়ে আমার যাবার কোন উপায় নেই এখন। এ-মানুষের স্মৃতির ভাঁড়ারে বুদ্ধির গুপ্তঘরে অনেক রত্নরাজি ভরভরতি হয়ে রয়েছে। কামাখ্যার তীর্থনাথ বারে বারে কানে মন্ত্র দিয়েছেন—শ্রীঅর লামা প্রকৃত গুণী, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে কিছু পাবে। ধৈর্য-হারা হবে না। অনেক কিছু অবিশ্বাসের ব্যাপার চোখে পড়লেও অবিশ্বাস এনো না মনে। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে গেলে জীবনে অনেক কঠিন পরীক্ষার সামনাসামনি দাঁড়াতে হয়। সহজেই সব কিছু পাওয়া যায় না। উপযুক্ত করে তুলতে না পারলে—কেউ কাউকে নিজের সাধনার বস্তু, আদরের ধনপ্রাণ বিলিয়ে দিতে পারে কি?

ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে এলুম যে ডেরায়, দরজা নেই আবার। রামের কাছে ঘোড়া চাইলুম, পেলুম খোঁড়া ঘোড়া। ভেড়া চরানোর সময় রাখাল আর ভেড়া—দুইয়েরই বিশ্রাম নেবার জন্যে এই ঘর। ফুসঘাসের ছাউনির ছাদ, মাটির দেয়াল। দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসছে। এমন দেশে এসেছি, শাড়ির বিসর্জন হয়ে গেছে কবে! থাকলে নাকে আঁচল চাপতে সুবিধে হতো। কাঁপা হাতে নাক চাপা। আড়চোখে তাকালেন শ্রীঅর লামা। হেসে গড়াগড়ি যাকে বলে তাই, এক এক বার আমাকে দেখছেন আর সজোরে হেসে উঠছেন বাচ্চা ছেলের মতো। হাসির ধমকে ওঁর সর্বশরীর কেঁপে উঠছে। আমার মনে হচ্ছে, ঘরের মেঝে কাঁপছে, দেয়াল কাঁপছে,

ছাদ কাঁপছে। সাধু-সন্ন্যাসী বলে কি দয়া বস্তুটাকেও জলাঞ্জলি দিয়েছেন উনি! ওঁদের মুখে শুনেছি, মস্ত বড় ধর্ম হল দয়া।

আমি একটা কোণে বেরালের কোণ নেয়ার মতো এসে বসলুম। কাঁপুনিতে বুকের ভেতর এত গুরগুর করছে যে, আমার নিজের সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি আমি। বুকের ধুকপুকুনিটা কখন না কখন বন্ধ হয়ে যাবে বুঝি।

ঝড়ের বেগ কমেছে, বৃষ্টিরও। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনছি। মচ মচ শব্দে বরফ ভেঙে এগিয়ে আসছে ঘোড়াটা আমাদেরই দিকে। নারীকণ্ঠের একটা আওয়াজই শুনছি। সতর্কবাণী। যে আসছে, সে দূরে কাউকে দেখছে কিনা জানি না। তবে মিষ্টি গলায় বলছে। বেশ চিৎকার করেই—ফা ক্যু ক্যে···। যে যেখানে আছ—সরে যাও সরে যাও সরে যাও।

ঘোড়া থামিয়ে নামলো মহিলা। সাজসজ্জা দেখে কোন গৃহবাসিনী মনে হল না। মনে হল সন্ন্যাসিনী মেয়েলামা। নির্ভয় দুটি চোখে ভীরুর আশ্রয়। ওঁর চোখের দিকে তাকাতে আমার নিজেকে অনেক ছোট মনে হল। মনে হল আমি সত্যি লামা হবার উপযুক্ত নয় এখনও। এই বৃষ্টি-বাদলের দিনে চামড়া ঢাকা মশালের আলো হাতে নিয়ে স্বর্গের দেবী এসে ঢুকলেন যেন আমাদের পর্ণকুটিরে।

নেউলের লোমের জামা ঢাকা একটি বছর চারেকের শিশু তাঁর বুক আঁকড়ে আশ্রয় নিয়েছে। মিট মিট করে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। বুকটা ভেঙে যাচ্ছে আমার। সৌরভের অভাব আজ বড় বেশী অনুভব করছি।

লামাকে কিছু বললেন না উনি। বছর তিনেক রয়েছি আমি। এরকম হাসি-ব্যাধিতে ভুগতে দেখিনি লামাকে। আজ পৃথিবীর সমস্ত লোকের হাসি জমা হয়েছে ওঁর মুখে। কেবল হেসেই চলেছেন। শীতের অনুভূতিটা অবধি হারিয়েছেন। ওঁকে দেখে আর আমার ক্ষোভ-দুঃখ হচ্ছে না। একটার পর একটা বিস্ময়ের পর্দা

আমার সামনে উপস্থিত হচ্ছে কেবল। কথাতে শুনেছি রহস্যময় রহস্যময়ী। এদের চোখে দেখি নি কোনদিন। আজ দেখছি লামাকে। লামা রহস্যময় পুরুষ। এক দেহে বহুরূপ।

জ্বলন্ত মশালটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন সন্ন্যাসিনী। তাঁর হাসিমুখ থেকে স্নিগ্ধ সহানুভূতি ঝরে পড়ল—বড্ড কাঁপছো তুমি, এই আগুনটা কাছে রাখ। হাঁ-হাঁ করে উঠলেন লামা। শুধু হাঁ নয়, বিরাট শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঘর থেকে বাইরে অবধি এগিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত উনি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। সন্ন্যাসিনীকে বললেন, অনেক অনাথ পড়ে আছে, এ আগুন তাদের। তুষারকণার নয়।

এত ঠাণ্ডাতেও ভেতরে জমে যায় নি আমার। বুঝলুম ক্রোধের তাপ নড়াচড়া করে উঠতে। মনে মনে কি ভেবেছেন উনি? পাকে-প্রকারে আমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসুক—এটাই চান দেখছি। আমার মৃতদেহে ওঁর শবসাধনার সুবিধে হবে নিশ্চয়। এ তো প্রকৃত লামা নয়, লামার বেশে সাক্ষাৎ যমের দ্বারী।

মনে করার সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্রোধের আগুনে জল ঢেলে নিভিয়ে দিলেন লামা। ওর আদেশবাণীতে আমি দৈববাণী শুনলুম। প্রাণ বাঁচাতে মৃত সঞ্জীবনী'র সন্ধান পেলুম। উনি বললেন, বাইরের আগুন তো সাময়িক। অনেক ক্ষেত্রে তো মেলে না একদম। তখন বাঁচবে কি করে? নিজের ভেতরে যে শক্তি আছে, তার তেজ বাড়াতে শেখ। দেখবে, তোমার অপর্যাপ্ত শক্তি। এর ক্ষয় নেই এর লয় নেই।

কিভাবে আমি হাঁটু বুকে চেপে ধরে জড়সড় হয়ে বসে আছি, লামা ভালো করে দেখে নিলেন একবার।

বললেন, পদ্মাসন করে সিধে হয়ে বসো। ওরকম কুঁকড়ে থাকলে চলবে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হবে। এতটুকু বেঁকা-টেরা করে রাখলে ফল ভালো পাওয়া যাবে না। চিবুক বুকে ঠেকিয়ে রাখো। জিভ টাগরায়। এটা জালান্ধরবদ্ধ মুদ্রা। সকল অবস্থায় বোঝবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ডান নাক দিয়ে নিশ্বাস টানো।

যতখানি সময়ে টানবে, তার দ্বিগুণ সময় ধরে রাখবে নাভিতে। টানার চতুর্গুণ সময়ের ঠিক মতো সংখ্যার মাপে বাঁ নাক দিয়ে নিশ্বাস ছাড়বে। মনে রাখবে এক সংখ্যায় নিশ্বাস টানলে দু সংখ্যায় রাখা আর চার সংখ্যায় বার করে দেওয়া।

একটু থেমে ধ্যানের পদ্ধতি জানালেন। প্রাণায়ামের সঙ্গে সঙ্গে এই ধ্যান চলবে। প্রাণায়ামের নাম সূর্যভেদ প্রাণায়াম। কোটি কোটি সূর্যের তেজ নিশ্বাসের বাতাস ধরে দেহে প্রবেশ করছে। করছে প্রতি লোমকুপ দিয়ে। রক্তের প্রবাহে সূর্যকিরণ ভেসে বেড়াচ্ছে শিরায় শিরায়। সূর্যময় জ্যোতির্ময় হয়ে উঠছে সারা শরীর।

একটু কি ভেবে নিয়ে লামা বললেন, যখন যাকে শেখাবে এসব —সামনে বসে। নিজের সময় না থাকে, অভিজ্ঞ লোকের কাছে পাঠিয়ে দেবে। এমনি মুখের কথায় কাউকে নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় মোটে। অভ্যেস অনুযায়ী সংখ্যাও বাড়বে। নিশ্বাস টানা রাখা ছাড়া—পূরক কুম্ভক রেচক, এদের সংখ্যাও বাড়বে টানার সংখ্যার ওপর নির্ভর করে। পূরক দুই হলে চার কুম্ভক আট রেচক। এইভাবে।

উনি ইশারায় জানিয়ে দিলেন প্রাণায়াম ধ্যান নিজে শুরু করছেন। আমাকেও ওঁর সঙ্গেই করতে হবে।

আমি প্রাণায়াম করছি। অর্থাৎ প্রাণের ব্যায়াম। প্রাণ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে যেন আমার। সর্বদেহে তাপে তাপে ছেয়ে যাচ্ছে। নিশ্বাসে আগুনের হলকা। আশ্চর্য, কোথায় হিম হয়ে যাবো, না রোমে রোমে ঘাম ঝরতে শুরু করল। অসহ্য গরম। শুনেছি, আফ্রিকায় যাই নি, ওখানে ভীষণ গরম। এরকম কিনা জানি না। আমার মনে হচ্ছে, পৃথিবীর সব মানুষের দেহের তাপ আমার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে নেচে বেড়াচ্ছে।

জীবন রক্ষায় প্রাণায়াম-ধ্যানের এমন বাস্তব প্রমাণে আমি অভিভূত হয়ে পড়লুম। লামাকে নিজের বিবেকের কাছে ঘাট স্বীকার করে মনে মনে শ্রদ্ধা জানালুম, জানালুম কৃতজ্ঞতা। মুখে

করার সাহস নেই। অনুশোচনা-অনুতাপ বড় জ্বালাচ্ছে।

লামাকে যখন-তখন যা-তা ভাবছি। উনি সমস্ত বুঝতে পেরেও সহ্য করছেন আমায়। কি অসীম সহ্যশক্তি। আমার মতন এত সন্দিগ্ধ সংকীর্ণ মনের লোককে কেন উনি তাড়িয়ে দিচ্ছেন না, কেন উনি সরিয়ে দিচ্ছেন না! এত বাড় বাড়তে দিচ্ছেন উনি কেন? উনি আমায় বুঝতে দিন—ওঁর কাছে একটা ধূলিকণার চেয়েও সহস্রগুণ ছোট আমি। ওঁর স্নেহের সাগরে ভেসে বেড়ানোর অযোগ্য আমি।

আমার সকল অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে এত করুণা—কোনমতেই সইতে পারবো না আমি। উনি আমায় শাসন করুন, নাহলে, ঘরছাড়া হয়েছিলুম একদিন যেমন, কামাখ্যায় তীর্থনাথের আশ্রম ছেড়ে এসেছি যেমন, তেমনি এই শ্রীঅর লামার কাছ থেকেও চলে যেতে হবে আবার আমায়।

আমি কি কোনদিনই কুলে গিয়ে ঠেকবো না? কেবলই নীড়হারা পাখীর মতন মনের ঝোড়ো হাওয়ার দৌরাত্ম্যে হেথাহোথা ঘুরে বেড়াতে থাকবো উদ্দেশ্যবিহীন জীবন নিয়ে! এত উপদেশ-বাণী শুনে কিছু সাধনা করেও চৈতন্যোদয় হল কই আমার! যে তিমিরে, সেই তিমিরে। রাগ দ্বেষ ক্ষোভ অভিমান ত্যাগ করতে পেরেছি কই!

আমার অতীত জীবন জেনে, সকলে সহানুভূতির পাত্রী হিসেবে দেখে। এটা চাই না আমি, এটা চাই না।

আমার মনের এমন অবস্থা, পাগলের মতন। ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে কোথাও। দৌড়ো-দৌড়ি করতে ইচ্ছে করছে। লামাকে নির্বিকার চিত্তে বসে থাকতে দেখে, ওঁর পায়ে মাথা খুঁড়ে রক্তের নদী বইয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

লামা মুখ খুললেন, তোমার কত শক্তি—বুঝতে পারছো নিশ্চয় এবার?

—শক্তিটক্তির কথা ছাড়ুন। ধর্মে কি অন্যায়কে মাথায় তুলে নাচতে বলেছে।

উনি মৌনমুখে হাসলেন একটু। ব্যস, ওই পর্যন্ত। আমি

মরিয়া হয়ে উঠেছি। বললুম, আমার এখানে থাকা পোষাবে না। এখানে থাকলে, আপনাদের কাছে থাকলে কখ্খনো কিচ্ছু হবে না।

লামা নির্বিকার। কোন কথার উত্তর দিলেন না উনি। মুখ টিপে হাসলেন স্রেফ।

আমি নাছোড়বান্দা—কথা কওয়াবই-ই। ওই মুখ থেকে বলুন উনি, হ্যাঁ, তুমি যেতে পার। জিভের আগায় অভিমান-ক্ষোভ আমার। প্রলয়নাচন নেচে চলেছে। একটা হেস্তনেস্ত নাহলে এ নাচুনি থামবে না বোধ করি। আমি বললুম, আমি এখান ছেড়ে চলে যাবই। কেউ আমায় রুখতে পারবে না। নিশ্চয় আপনিও মত দেবেন।

লামার কোন পরিবর্তন নেই। আগের অবস্থা। প্রাণের সাড়া নাইকো প্রাণে। আমি উঠে পড়লুম। যেখানে দু'চোখ যায়, সেই পথই আমার পথ। আমার কেউ নেই, আমি একা। এসেছি একা, আছি একা—যেতে হবে একা।

গোঁভরে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমেছি, লামা এসে আমার ডানহাতের কব্জি চেপে ধরলেন। টেনে নিয়ে চললেন গুম্ফার পথে। আমি কেমন হয়ে গেছি। আমার চলার যত শক্তি তার সমস্ত কলকাঠি ওই একটা মুঠোর মধ্যে। সারা দেহের শিরায় শিরায় সব ভোলানো একটা ঠাণ্ডা আমেজ বয়ে যাচ্ছে। এই রকম—ঠিক এই রকম হয়েছিল আমার ছোট বয়সে।
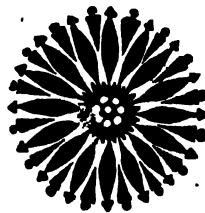
বয়েস তখন সাত কি আট।

জেঠিমার নেটিপেটি মেয়ে। নিজের মায়ের চেয়ে জেঠিমাকে আমার বেশী ভালো লাগত। ঠাকুরমার সঙ্গে মুলগাঁয়ের বাড়িতে

বেড়াতে গিয়ে তেরাত্তিরও টিকতে পারি নি। কান্নাকাটির জ্বালায় দেশ থেকে কলকাতার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে ঠাকুরমা। বাড়িতে এসে ভারীগলার কি চেঁচামেচি!—আর কোন দিন যদি তোকে সঙ্গে নিয়ে বেরুই কোথাও—নাকে-কানে খৎ। এ বংশে এমন পাহাড়ে মেয়ে হল শেষে। আমায় নাইতে-খেতে দেয় না। কেবল 'নিয়ে চল নিয়ে চল'। বলি, দু'দিন বাদে বিয়ে হবে যখন, মজা বুঝবি। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা শুনবে'খন তোর কথা এই বুড়ির মতো! কি উত্যক্ত! বোঝালে যদি বোঝে একটু, মোয়া দাও মেঠাই দাও—ভবি কিন্তু ভোলবার নয়। পেট-খারাপে কড়াই ভাজা খাবার বায়না ছাড়ায় কার সাধ্যি!

মুখেচোখে জলের ঝাপটা দিয়ে দখিনের ঘরের বারান্দায় এসে বসেছে ঠাকুরমা। ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথায় চড়া রক্ত নেমেছে একটু পরে। তখন ঠাকুরমার আর রণচণ্ডী মূর্তি নয়। একেবারে শান্তশিষ্ট কমলা। ফোগলা মুখে শিশুর হাসি হেসে বলেছে, দিদিভাই, রাগ করিস নে! রাগের বশে কত কি বলি তোকে।

হাসির পর দুঃখ প্রকাশের পর ঠাকুরমা কেঁদে সারা হয়েছে। আহা, আমার কি মা-ই না ছিল! যাকে বলে মায়ের মতন মা। কত অন্যায় করেছি, কখনও বকে নি। সেই মা আমার স্বপ্ন দিয়ে এলো—আর আমি এমন নিষ্ঠুর—কি বকাই না বকলুম গা।

হাত ধরে বুকে টেনে নিয়ে চেপে ধরে বলেছে, ওমা আমার মা-জননী, ওমা আমার মা-জননী!

জেঠিমা-দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নেটের পরদায় চোখ রেখে দেখেছে আর ফিকফিক করে হেসেছে। মাঝে মাঝে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে কাছে।

জেঠিমাকে ভালো লাগার কারণ অতিরিক্ত প্রশ্রয়দান। আমি যত অন্যায়ই করি না কেন—সাতখুন মাপ। বাড়ির কোন ছেলে-মেয়ের সাধ্যি নেই যে, আমার পেছনে লাগে, আমার অন্যায়ের প্রতিবাদ করে।

মা তো কোন ব্যাপারেই থাকে না। সম্পূর্ণ উদাসীন। কোন জিনিসের ওপর আকর্ষণ নেই। টান নেই বাবার ওপর, টান নেই আমার ওপর, টান নেই নিজের ওপরও।

আমাদের বাড়িতে জ্ঞাতিস্বজনদের আসা-যাওয়া ছিল খুব। সম্পর্ক সবই অবস্থাপন্ন ঘরের সঙ্গে। মায়ের মাথায় রুখু চুল, পরনে আধময়লা শাড়ি, হাতে দু'গাছা সরু চুড়ি গলায় সরু চেনহার। এ-সাজ জ্ঞাতিদের হীরে, জহরত আর বেনারসী-সিল্কের কাছে বেমানান। এ যেন রাজপ্রাসাদের পাশে মাটির খোড়োচালের কুঁড়ে ঘর।

বাড়িতে লোক এলেই ঠাকুরমার মাথায় বজ্রাঘাত। কি বোঝান বোঝানো। ছোট বৌ, আমার কথা রাখো। এ যে মানসম্ভ্রমের প্রশ্ন ছোট বৌ। আমার শ্বশুরমশাই যে পথে বসিয়ে গেছেন, তা তো নয়। নাতবৌদেরও প্রচুর দিয়েছেন। এসব যখের ধন আগলে কি আমি বসে থাকবো ধ্যানজপ ভুলে! বিশবার বলি, যে যার গয়নাগাটি বুঝেসুঝে নাও। আমি নিষ্কৃতি পাই। কই, বড়বৌ তো এমন নয়। দিনরাত সেজেগুজে রয়েছে।

মায়ের কানে কথা যেত কিনা কে জানে! তবে কোনদিন ও-বেশ ছাড়া নতুন বেশে দেখিনি আমি। ছেলেবেলা থেকে গয়না পরার সাধ ছিল খুব আমার। সাধ জেগে উঠেছিল জেঠিমার নাকের হীরের রামধনু রঙের রোদ ঠিকরনো দেখে। আলো-আঁধারি ঘরে আরো সুন্দর।

ওই হীরে আমায় স্বপ্নে জ্বালিয়েছে অনেক রাত। আমার নাকের পাটায় এসে বসেছে আলতোভাবে। আমার মুখখানা পাল্টে গেছে। জেঠিমার মতন। নিজেকে কি ভালোই লেগেছে। স্বপ্ন আমার কাছে স্বপ্ন নয়, একেবারে নিখুঁত সত্যি। জেগে, নাকে হাত দিয়ে দেখে কি কান্না! জেঠিমা পরিয়ে দিল, খুলে নিল কে!

বাড়ির লোকে হেসে কুটিকুটি। মুখ ঘুরিয়ে হেসে ফেলেছে বাবা। হিংস্র পশুর মতন ঝাঁপিয়ে পড়েছি আমি। হাত দুটো

কাঁমড়ে-আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছি। রাগের লেশমাত্র দেখিনি বাবার মুখে। বরং হাসতে হাসতেই বলেছে, একটু স্থির হ' তুষার, একটু স্থির হ'। নিজের রক্ত দেখিয়ে বলেছে, বোকা মেয়ে কোথাকার। মুক্তো দাঁতের রক্ত দেখছিস না? তোর দাঁত ক'টা পড়ে যাবে এবার। ঠাকুরমার মতো হয়ে যাবি শেষে। হায়, হায়!

দাঁতে হাত চেপে দৌড়ে পালিয়েছি তক্ষুণি জেঠিমার ঘরে পরদা ঠেলে। জেঠিমা বলেছে, তোকে তো কতবার বলেছি তুষি, নাকছাবিটা তোরই। তোকে আমি দেবো। ঠিক সময়েই পাবি তুই। জেঠিমার গলা জড়িয়ে ধরে খিলখিল করে হেসে উঠেছি আমি। এ সব আমার পাঁচ বছর বয়সের কথা।

সাত-আটের কথায় আবার ফিরে আসি।

জেঠিমার কথায় এমন একটা কাণ্ড করে বসলুম, মনে নিদারুণ ভাবে দাগ কেটে গেল। জেঠিমার ওপর আমার একটা দুর্বলতা ছিলই। বাড়ির মধ্যে এই একজনই আমার আপনজন। আর সকলে পর। অতএব জেঠিমা যা বলেছে, ভালোর জন্যেই বলেছে। সেটা মানা উচিত বাবার। বাবাকে বলেছি সেকথা। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, কাজ কিছু করে নি। বলেছে, পাগলী মেয়ে, ওসব মুখে আনতে নেই।

মওকা পেলে নাকি মানুষ মগডালে উঠে বসে। আদরে-আদরে আমার সেই অবস্থা। আমি এমন প্রশ্রয়-পাগল যে, আদরের সুযোগ নিয়ে একেবারে সকলের মাথায় চড়ে বসে আছি। আমি যেন বাড়ির কর্তাব্যক্তি। বাবা আমার মত নিল না। অভিমানে একটা অবাধ্য দুষ্টুমি একটা বিবেকবুদ্ধিহীন পাগলামো পেয়ে বসল আমায়। বাবাকে জব্দ করতে হবে। বাবা যখন থাকবে না ঘরে, তখন সেই কাজ।

বাবার গুরুভক্তি আর পুজোপাঠ জেঠিমা পছন্দ করে না মোটে। বলে, এসব কুঁড়ে লোকের কাজ। ছাখ দিকিনি তুমি, তোর জ্যাঠামণি কেমন! বিষয়-সম্পত্তি দেখা থেকে সংসারের কাজ পর্যন্ত কি না করে, কি না ছাখে! খেটে খেটে তো আধখানা হয়ে গেল।

সহায়তা করার নেইকো কেউ, ভাত পাতবার গোঁসাই। ঠাকুরপোর ঘটে যদি একটু বিবেচনা বলে কোন বস্তু থাকে!

জেঠিমা বুকভাঙা নিশ্বাস ফেলে বলে আবার, এরকম উদয়-অস্ত খাটতে থাকলে, মানুষটা বাঁচবে ক'দিন বল্! তোর বাবাকে একটু বলিস—পুজোপাঠ কি আর কেউ করে না? ওসব নিয়ে দিনরাত অত মেতে থাকলে চলবে কেন? বখরা ভোগ করছে তো। পরে চুলচিরে ভাগ নিতে কসুর করবে না। একটু গতর নাড়তে বলিস। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙাটা মানুষের কাজ নয়, কোন ধর্মেরও না।

জেঠিমার মনোবেদনা আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে। বাবার ওপর প্রচণ্ড রাগ এসেছে। জেঠিমার কথা বলেও বাবাকে পুজোপাঠের সময় সংক্ষেপ করাতে পারিনি। জেঠিমা বলেছে, ওসব পুজো না ছাই। যত সব বুজরুকি। চোখ বুজে বসে বসে সময় কাটানো, কাজে ফাঁকি দেওয়া। আমার বাবা বলে, পয়সা লক্ষ্মী। পয়সার আরাধনাই মালক্ষ্মীর আরাধনা। আর ছেলে মেয়ে বৌকে খাওয়াই—নারায়ণ সেবা। গুরুর ছবি আর গুরুর পাদুকা পুজোয় আছেটা কি! ছবি মানুষকে ছবিই করে ফেলে। জ্যান্ত মরা যাকে বলে।

বাবাকে জ্যান্তে মরা করে রাখতে চাইনি আমি। বাবার গুরুদেবের ছবি আর পাদুকা—খড়ম জোড়া নিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে চেয়েছি পাঁচির মার সঙ্গে শলাপরামর্শ করে। পরামর্শ অবিশ্যি জেঠিমার ঘরে জেঠিমার সামনে হয়েছে। বলতে গেলে আমাদের একাজের উৎসাহ-প্রেরণা সাহস যুগিয়েছে নেপথ্য থেকে একা জেঠিমা-ই।

গুরুধ্যান গুরুজপের মতন প্রাতঃভ্রমণও বাবার নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যে পড়ে। কার্যসমাধা না হওয়া অবধি আমার সে কি উৎকণ্ঠা! সারা রাত উসখুস করেছি কখন সকাল হবে। মা মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে গুনগুন করে গান গেয়েছে ঘুম পাড়ানোর জন্যে।

—কি হারালি, ভোল রে ব্যথা ভোল···।

আমার কোন অস্থিরতা দেখলে, ঘুমটুমে কোন ব্যাঘাত হচ্ছে

বুঝতে পারলে মা এই গানটাই গাইত কেবল। অন্য কোন কথা নয়, কোন সান্ত্বনা নয়, কোন জিজ্ঞাসা নয়—শুধু একটি গান। তাও সম্পূর্ণ নয়। ওই একই কথা ঘুরেফিরে।

সকাল হল। বাবা প্রাতঃভ্রমণে, মা চানের ঘরে। এই সুযোগ। পাঁচির মা আমার জন্যে সিঁড়ির চাতালে অপেক্ষা করছে। ও আমাদের পুরনো ঝি। আমাদের কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। জেঠিমার অনুগত খুব। ওর মেয়ে পাঁচি আমাদেরই মতন বাড়ির আর একটা মেয়ে হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে খেলাধুলো খাওয়া-দাওয়া—সব।

প্রথমে আমি পাঁচির মাকে গুরুদেবের ছবি দিয়ে এলুম। ছবিটা মাঝারি সাইজেরও নয়। ছোট্ট, রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো। দেয়াল-আয়নার পাথরের ব্র্যাকেটে বসানো ছিল। ঘরের উত্তর দিকে ছোট জলচৌকিতে গেরুয়া আসন পাতা। তার ওপর খড়ম জোড়া। সামনে মেঝেয় পশমের আসন বিছানো। বাবা বসে পুজো করে।

আমি চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে নিলুম একবার। কেউ আসছে কিনা। অতি সন্তর্পণে খড়ম জোড়া তুলে বুকে চেপে ধরেছি, নিয়ে যাব।

পেছন থেকে কে যেন এসে আমার মাথা স্পর্শ করল। আমি চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখি, বাবা। বুক থেকে হাত দুটো আলগা হয়ে গেল আমার। কালো পাথরের মেঝেয় খড়ম জোড়া পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

বাবা নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিয়ে সযত্নে আমার হাতে তুলে দিল হাসিমুখে। আমি নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে চুপচাপ। ভয় নয় আনন্দ নয়—কি জানি কি একটা ভাব! আমি কে আমি কোথায় আমি কার সামনে দাঁড়িয়ে। জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি!

বোধ হয় শরীরটা কাঁপছিল কি টলছিল। হয়তো বা পড়ে যাচ্ছিলুম, বাবা হাতের আগলে আটকাল। মখমলের চাদর মোড়া মেহগিনি কাঠের খাটের বিছানায় নিয়ে এসে বসাল। সলমাকে

ডেকে জল দিতে বলল এক গেলাস। সলমাও ঝি। ফাইফরমায়েস খাটার জন্যে।

জলের গেলাস মুখে ধরে বলল বাবা, তুষার, তোর গলাটা একটু ভিজিয়ে নে। শুকিয়ে গেছে মনে হচ্ছে। শুকিয়ে গেছে কেন—সত্যিই শুকিয়ে মরুভূমি। বাবা জানল কেমন করে?

আমি এক ঢোক করে জল গিলছি আর চোখ তুলে অবাক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি বাবার মুখের দিকে।

বাবা পাশে বসে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্নেহঝরা স্বরে বলেছে, পাঁচির মার হাতে খড়ম দুটো দিয়ে দে তুই। যা করেছিস, ঠিকই করেছিস। ভেতরে যার গুরুর চরণ গুরুর ছবি রয়েছে, বাইরে আর কি দরকার তার!

বাবা আমাদের এ ব্যাপারটা আগে থেকেই জানতে পেরেছে। তাই প্রাতঃভ্রমণে না বেরিয়ে বাড়িতেই নীচের বৈঠকখানায় বসেছিল। ঠিক সময়ে দোতলার ঘরে এসে পড়েছে।

পরামর্শের দিনেই পাঁচির মা বলে দিয়েছে বাবাকে। গুরু বলে কথা! ছেলেমেয়ের মা সে, পাপের ভাগী হবে কে! এক তো এ জন্মে দাসীবৃত্তি—হোক না যত সুখেরই, পরজন্মে নরকযন্ত্রণায় পচে মরতে হবে শেষে। লালুয়া চাকরের সঙ্গে বাজার করতে গিয়ে ছবির দোকানে নরকরাজ্যে হরেক রকমের পাপের সাজার বহর দেখে তার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। মাগো মা! দু'পাশে দুজন যমদূত কারো মাথা করাত দিয়ে চিরছে। ফুটন্ত তেলে আবার কাউকে ফেলে দিচ্ছে। কাউকে আবার সদ্য পোড়ানো লাল টকটকে লোহার সিক দিয়ে চোখ-কান-নাক এফোঁড় ওফোঁড় করছে। আরো কত কি আছে। দেখতে পারেনি আর চোখ চেয়ে।

ভয়ে বুকের ভেতর গুড় গুড় করে উঠেছে। আকাশের বাজ বুঝি আছড়ে-আছড়ে পড়ছে বুকের ওপর। ঠকঠক করে কাঁপুনি কি! চোখে সর্ষেফুল দেখে, দাঁত কপাটি লেগে ধড়াস করে পড়ে গেছে রাস্তায়।

···বাড়িতে এসে লালুয়াকে বলেছে, বাজার চুরির পয়সা আর আমার দরকার নেই রে। চুরিচামারি মস্ত পাপ। পাপের সাজা দেখেছি, আর কোন পুতখাগী ও-রাস্তা মাড়ায়! নাক মলেছে কান মলেছে পাঁচির মা। মা-কালীর মা-শীতলার পুজো চড়িয়েছে শ-পাঁচ আনা করে। চুরির শোধ হিসেবে। প্রায়শ্চিত্তের মাশুল।

সেই থেকে পাঁচির মা'র স্বভাব পাল্টেছে মন বদলেছে। নিজের দোষ খণ্ডন করেছে দোষ স্বীকার করে। এ হেন পাঁচির মার ঘাড়ে গুরুদায়িত্বের বোঝা পড়ল গুরুদেবের ছবি পাদুকা বিসর্জনের। বড়বৌদির কোপ এড়ানোর জন্য 'হ্যাঁ' বলেছে। নরকের দরজাগোড়ায় যাতে পৌঁছুতে না হয়—ছুটে এসেছে বাবার কাছে। সব বলে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

বাবা আশ্বাস দিয়েছে, ভয় নেই। সে-সময় থাকবে। তবে কথা যেমন আছে, সেই মতো প্রস্তুত থাকে যেন পাঁচির মা।

পাঁচির মা গুরুদেবের ছবি দিয়ে গেল বাবাকে। আমার সামনে ভয়-ভয় মুখ করে এমন ভাব দেখাল, যেন আমার মতন সেও হঠাৎ ধরা পড়ে গেছে। বাবার মুখে যে আমি সমস্ত শুনে ফেলেছি, ও জানে না।

আমাদের ফিটন গাড়ী করে বাবা নিয়ে গেল আমায় গঙ্গার ধারে। আমারই চোখের সামনে সিঁড়ি বেয়ে জলে নেমে, নিজে হাতে গুরুদেবের চরণ-ছবি বিসর্জন দিল।

কমণ্ডলু করে গঙ্গাজল তুলে নিয়ে এসে আমার মাথায় ছিটিয়ে দিল। মনে হল পুজো শেষে শান্তিজল পড়ল। সাদা আর কালো—ছুটো ঘোড়ার মাথায়—সহিসের মাথায় ছিটিয়ে দিল। পুণ্য বোশেখের পবিত্র গঙ্গাজলের ধারা নামল বাবার মোটা-মোটা আঙুলের ফাঁক দিয়ে।

বাবার মুখে কোন বিকার নেই। গাড়িতে সারাটা রাস্তাই হাসতে হাসতে হাসানোর গল্প করেছে আমার সঙ্গে। যেন আমি যা করেছি, ঠিকই করেছি। বাবা খুশী। শুধু খুশী নয়, মহাখুশী।

একলাফে আমার আদর বেড়ে গেছে আরো চতুর্গুণ।

বাবাকে লামার মধ্যে বহুবার দেখেছি। বাবা-লামা লামা-বাবা এক হয়ে গেছে আমার চোখে আমার মনে। সময় সময় লামাকে বাবা ডেকে ফেলেছি। লামা হেসেছেন। এ-হাসি আমার পরিচিত, আমার নিজের লোকের—আমার বাবার।

বাবার কথা মনে আসতে অনেক কথাই আমাকে ঘিরে ধরে ঘুরছে। অনেক ঘটনা।···

গুরুদেবের ছবি-পাদুকা বিসর্জন হয়ে যাবার পর আমি কিরকম হয়ে গেছলুম। যেন এক অন্য জগতের অন্য মানুষ। হাসি-খেলা দুরন্তপনা কিচ্ছু ভালো লাগত না। পাহাড় প্রমাণ অবসাদের পাথর বুকের ভেতর। ঘর ছেড়ে বেরোতে ইচ্ছে করত না বাইরে। সূর্যের আলো জানলা-দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলে, তক্ষুণি সরে গিয়ে কোণ নিয়েছি। কি আগুনের হলকা! আপাদমস্তক পুড়িয়ে মারছে। চাঁদের ভেতর সূর্য দেখে, দু'চোখে হাতচাপা দিয়েছি।

ঘরখানা কি শূন্য কি নির্জন ঠেকেছে। বাবা পায়চারি করছে, তবুও। মা পাঁচির মা সলমা আসা-যাওয়া করছে। সবাইকে দেখছি, সবার কথা শুনছি, মনে কিন্তু এতটুকু দাগ কাটছে না। কেবল ভেতর ফুঁপিয়ে একটা কান্না বাইরে—চোখের কোল উপচে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে। বেরোতে পারছে না। তালাচাবি বন্ধ লোহার সিন্দুকে বন্দী যেন।

আমার কি যে যন্ত্রণা কি যে ব্যথা—মুখ খুলে কিছুই বলতে চাইছি না কাউকে—ইচ্ছেও করছে না। কণ্ঠ থেকে নেমে গিয়ে যত কথা জমা হচ্ছে বুকের সেই অবসাদের পাথরটার কাছে। মুক্তির নিষ্ফল প্রয়াস—পাথরে মাথা কুটে কুটে মরছে কেবল।

দেয়াল-আয়নার ব্রাকেটের সামনে এসে নিত্যি কিছুক্ষণ করে দাঁড়িয়ে থাকে বাবা। আশ্চর্য, ঠিক সেই সময় আমি স্পষ্ট দেখি, গুরুদেবের ছবি বসানো রয়েছে। বাবা গুরুবন্দনা করতে করতে চলে যায় উত্তর দিকে—যেখানে গুরুপাদুকা ছিল।

বাবা নতজানু হয়ে জলচৌকিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানায়। —নমামু করুঁ ম্যাঁয় গুরুচরণম্, সদ্‌গুরুচরণম্, শ্রীগুরুচরণম্…। গম্ভীর গলায় আনন্দ ভরা সুরে প্রতিটি শব্দ জীবন্ত হয়ে ঘরের বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরে বেড়ায় আমার শিরা-উপশিরায় আমার রক্তপ্রবাহে আমার নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে। তালে তালে নেচে চলে আমার বুকের ওঠানামার ঢেউয়ের দোলনে।

আমি দেখি, গুরুদেবের সেই বিসর্জন দেওয়া খড়ম-জোড়া। আর দেখি সেই খড়মের মানুষকে। মুণ্ডিত শির দীর্ঘদেহী দাঁড়িয়ে। পায়ে খড়ম পরনে গেরুয়া প্রশাস্ত নগ্ন-বুক। নির্নিমেষ নয়নের স্নিগ্ধ-দৃষ্টি আমার মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। ঠোঁটের ফাঁকে সোনার আলোর একটুকরো মিষ্টি হাসি উঁকি মারছে মিলিয়ে যাচ্ছে আবার উঁকি মারছে। আমার সঙ্গে কি লুকোচুরি খেলা!

আমি পাগল হয়ে উঠি। শুনতে পাই বুঝি ওই মানুষের কণ্ঠস্বর। বলছেন আস্তে আস্তে—এত আস্তে কানে কানে বলা যেতে পারে, বিদেয় করতে চেয়েছিলি তো তোর জেঠিমার কথা শুনে, পেরেছিস? পেরেছিস পেরেছিস…?

আমি শুনতে পারি না আর, সহ্য করতে পারি না। সেই মুহূর্তে আমার বুকের বোঝা—পাথরটা পালকের মতন কেমন হালকা হয়ে ওঠে আচমকা। লোহার সিন্দুকের পাল্লা ঠেলে ছিটকে বেরিয়ে আসে কত কথা। বেরিয়ে আসে কয়েদবন্দী কান্না। সমস্ত একসঙ্গে।

আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠি।—ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর! মেঝেয় পড়ে কি আছাড়িপিছাড়ি! চোখের জলে ধুয়েছে পাথরের মেঝে। ওই ধোয়া পাথরে ফুটে উঠেছে ওই দাঁড়িয়ে থাকা সন্ন্যাসীর চেহারা। আমায় হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছেন।

আমি উবুড় হয়েই মেঝেয় সাঁতার কেটে কেটে এগোচ্ছি। বাবা এসে আটকেছে।

এটা একটা ব্যামোর মতন হয়ে গেল আমার। রোজ একই অবস্থা!

ঠাকুরমা জোড়হাতে চোখের জলে গুরুদেবের উদ্দেশ্যে মানত করে রোজ। —তুমি অবোধ মেয়ে! ওর অপরাধ নিও না তুমি। ক্ষমা কর। ওকে এভাবে শাস্তি দিও না আর। তোমায় ষোড়শ উপচারে পুজো দেবো। দোহাই তোমার, দোহাই তোমার।

মায়ের তো কোন ব্যাপারেই ভ্রূক্ষেপ নেই। এ বিষয়েও তাই। তার দৃষ্টিতে কোন কিছু পড়ে না, কানে প্রবেশ করে নাও কান্না কথা কোলাহল। জেঠিমা এসে মুচকি হেসে বলে, আ-হা-হা-হা! বাছারে—মায়ের পাগলামো মেয়েয় অর্শালো গা! এই সলমা এই পাঁচির মা! খুব হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি তোদের! বাড়ির কথা বাইরে যেন একটুও না বেরোয়। আইবুড়ো মেয়ে, পাগল জানাজানি হয়ে পড়লে বিয়ে দেওয়া দায় হয়ে দাঁড়াবে শেষে।

রূপোর চৌকোনা ডিবে খুলে পানের খিলি মুখে পুরলো জেঠিমা। জরদার কৌটো থেকে চার পাঁচটা রূপোলী দানা তুলে নিয়ে আলতো ভাবে মুখে ফেলে, আধো-আধো কথায় বলল, আ-মরণ! মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে দেখছিস কি অত? কানে ঢুকেছে, না ঢোকে নি?

ঝাঁঝালো গলায় চেঁচিয়ে উঠেছে জেঠিমা। দ্যাখ, তোদের ন্যাকামো আমার ভালো লাগে না। তোরা যে হাড়বজ্জাত—আমার জানা আছে ভালো রকম। বোকা সাজলে আমি কিন্তু ছেড়ে কথা কইবো না কাউকে। বাপের বাড়িতে রায়বাঘিনী বলে ডাকতো সবাই। আমার দাপটে গোটা বাড়ি থরহরি কম্পমান।

সলমা-পাঁচির মা ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাঁচতে চাইল। সলমা বেরিয়ে বাঁচল। কিন্তু পাঁচির মা চৌকাঠের ওপারে পা বাড়াতেই, বাঘিনীর মতোই গর্জে উঠল জেঠিমা। —পালাচ্ছিস যে! বলি,

শঙ্করমাছের চাবুকটার কথা কি ভুলে গেছিস? ঘরের দেয়ালে এখনো ঝোলানো। পালের গোদা কোথাকার! মেয়েটাকে পাগল করার মূলে তো তুই সর্বনাশীই। বেরিয়ে যা, দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা চোখের সামনে থেকে। দু'চক্ষের বিষ। ভালো-ভালো লোকদের পৃথিবী থেকে তুলে নিচ্ছে ভগবান—এদের চোখে পড়ে না গা! ওপুরীতে গিয়েও যে জ্বালাবে! সেই ভয়। মেঝেয় দুমদুম গোড়ালির আওয়াজ তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে জেঠিমা।

মাকে যে যাই বলুক, মনে কোন কষ্ট হতো না আমার। 'পাগল' কথাটা শুনতে ভালো লাগত না। ঠাকুরমার মুখে প্রায়ই দুঃখ প্রকাশ করতে শুনেছি, ছোটবৌয়ের তুলনা হয় না। লক্ষ্মীঠাকরুণ একেবারে। যেমন রূপ তেমনি গুণ ছিল। সমস্ত চলে গেল অদৃষ্টের বিপাকে। এক-আধটা নয়—চারটে ছেলে, তিনটে মেয়ে। একুনে সাত-সাতটা। সব ক'টাই মায়ের সঙ্গে বেইমানি করে কোল ছেড়ে চলে গেছে। কেউ হয়েই, কেউ দু'চার বছর থেকে আরো জ্বালিয়ে—শত্রুতা করে। কথায় বলে পেটের চেয়ে বড় দুশমন দুনিয়ায় নেই আর।

বুকভাঙা নিশ্বাস ফেলে বলেছে ঠাকুরমা—আমার চুলের বিনুনির পাক ঘোরাতে ঘোরাতে, দিদি ভাই, মেয়েটা কাঁদতে জানে না। কেঁদে ভাসিয়ে দিতে পারলে আজ এমনতর অবস্থা হতো না। কোন খেয়াল নেই। নিজের সাজসজ্জা খাওয়া-নাওয়া—কোন কিছুতেই না।

নিজের মায়ের ছবির দিকে তাকিয়েছে ঠাকুরমা—দিদিভাই, তুই বেঁচে থাক। ঠাকুরমার চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে। আমার মাথাটা বুকে চেপে ধরে কাঁপাগলায় বলেছে, যারা গেছে তারা যে পর ছিল, তাই গেছে! তুই যে আমার মা রে।

বিড়বিড় করে বলেছে, যাবি না যাবি না। আমি জানি, মা আমায় কাঁদাবে না। আমার চোখের জল সইতে পারত না মা। আমাকে রাগিয়ে আনন্দ পেতে চাইলে—বাবার সঙ্গে কি বকাবকি না হতো। —মেয়েটাকে না কাঁদিয়ে ছাড়বে না তুমি শেষে! বরং বাগানে একটু পায়চারি করে এসো গে।

ঠাকুরমার কি নরম তুলতুলে হাতের আঙুল। মাথায়-মুখে বুলিয়ে দিয়েছে। —দিদিভাই, তোর মায়ের মতন এত দয়ামায়া এ বাড়ির কারো নেই। ঈশ্বর ওকে অফুরন্ত ভালোবাসা দিয়ে পাঠিয়েছিল। ঝি-চাকরের ছেলে-মেয়েকে নিজের ছেলে-মেয়ে ভেবেছে। তফাৎ ছাখে নি কখনও। পাঁচির মার পাঁচিটা তো ওরই হাতে পুরো মানুষ। দিদিভাই, তুই কোন আদর পেলিনা রে। ছোট বৌ ঠিক পাগল নয়, ঘা খেয়ে খেয়ে পাথর হয়ে গেছে '

মা পাগল—জেঠিমার কথায় বুকের ওপর সজোরে হাতুড়ির ঘা পড়েছে। মায়ের দিকে তাকালুম একবার। বধিরের নির্বিকার মুখ। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মাথা নীচু করলুম আমি।

আমাকে নিয়ে রোজই মানসিক যন্ত্রণা সকলের। সকলের বলতে বাবা আর ঠাকুরমার। আমার মনের পরিবর্তনে জেঠিমার পরিবর্তন দেখলুম হঠাৎ। যেটা আমাকে সর্বহারার দুঃখ দিয়েছে খুব। আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। আগের মতন ঘরে আর ডাকে না। জ্যাঠতুতো বোন মমতাদির সঙ্গে দেখা করতে দেয় না। আমার কাছ থেকে মমতাদিকেও সরিয়ে সরিয়ে রাখে।

জেঠিমার চোখে আমি যেন মেথর-ধাঙড়ের মেয়ে। একটা অলক্ষুণে বস্তু। আমার ছোঁয়ায় জাত যাবে, আমায় দেখলে হয়তো বা ওরা পাগল হবে। এত অল্প বয়েসে কেমন করে আমার মনের তিনগুণ বয়েস বেড়ে গেল, বোঝবার ক্ষমতা পরিণত হয়ে উঠল—বেশী বয়েসে চিন্তা করেও কোন হদিশ খুঁজে পাই নি। শুধু একটা কারণই উঁকিঝুকি মেরেছে, বোধ হয় সেইটাই প্রধান কারণ। গুরুদেবের ছবি-খড়মের বিসর্জন।

গুরুদেবের —আমার কল্পনার চোখে দেখা হাতছানি ক্রমে আমার কাছে সত্যি হয়ে উঠল। আমি ঘর থেকে 'যাই-যাই' বলে ছুটে বেরিয়ে যেতে গেছি অনেক বার।

ঠাকুরমার বাবার মতোই গুরুবিশ্বাস গুরুভক্তি প্রবল। আমাদের বাড়ির সন্ন্যাসী-গুরু সকলের। ঠাকুরদার আমল থেকে। ঠাকুরদার

গুরু ছিলেন স্বামী পরমানন্দ। তিনি মরদেহ রেখেছেন অর্থাৎ মহাসমাধি লাভ করেছেন অনেক দিন। আমরা তাঁকে দেখি নি। তাঁরই প্রধান-প্রিয় শিষ্য স্বামী আত্মানন্দের কাছে বাবা মা—সবাই দীক্ষিত। জেঠিমা নয়। গুরু পুরোহিত সন্ন্যাসীর ওপর দারুণ অবিশ্বাস।

আমার মুখে গুরুদেব ডাকছেন শুনে—বিদ্রূপের বিষ ঢেলে বলেছে, গুরু করা সাধনভজন করা—এ সমস্ত আলসে লোকের ধর্ম। নেই কাজ তো খই ভাজ! বাইজী থিয়েটার বায়স্কোপের মতন এও একটা সর্বনেশে নেশা। মানুষকে সর্বস্বান্ত করে তবে ছাড়ে। আরে বাবা, আগে ভোগ, তবে ত্যাগ। যত সব ভণ্ডামি! কই, ভগবানকে তো চারহাত বার করে এসে কারো দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে দেখি নি! সম্পত্তিই প্রতিপত্তি, সম্পত্তিই মান-সম্মান লক্ষ্মীনারায়ণ।

পিকদানিতে পিক ফেলতে ফেলতে হেসে কুটিকুটি হয়েছে। সলমা ভয়েময়ে বলেছে, বড় বউদি, বিষম লাগবে যে। মুখের পানটা ফেলে দিয়ে কথা কও না। সুপুরির কুঁচো লাগতে কতক্ষণ! পাঁচির মার যা মোটা-মোটা করে কুঁচনো। মা গো মা। ডানহাতে পিকদানি ধরে, বাঁ হাতে নিজের গাল চাপড়েছে।

জেঠিমা একটু ঢোঁক গিলে বলেছে, সলমা, সত্যিই বলেছিস তো রে! গলায় যেন কি একটা লাগল আমার। ডাকতো হারামজাদীকে। আমায় মেরে ফেলবার মতলব।

বলির পাঁঠার মতন কাঁপতে-কাঁপতে এসে দাঁড়িয়েছে পাঁচির মা।

জেঠিমার গলা সপ্তমে চড়েছে। বলি, কোন্ সাহসে আমার সঙ্গে শক্রতা করবার জন্যে আদাজল খেয়ে উঠিপড়ি লেগেছিস শুনি! এ বাড়িতে কারো ঘাড়ে দুটো মাথা নেই যে, আমি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করলে তোকে রাখতে পারে। আমার জন্যই পেটে অন্ন জুটছে হাতে বাউটি উঠছে। পাঁচভূতের ভাবনায় দিনরাত চোখে পাতায় এক করতে পারি না। মুখ চাইবার কেউ নেই। কোন্ বাড়ির ভাড়াটেরা ভাড়া দিচ্ছে কিনা—তা ত্যাখো। বাজার-দোকান ঠিক-

মতো হল কিনা—বড়বৌ দেখবে। কুটুম-স্বজনের আসুন্তি-যাউন্তি—বড়বৌ। বিষয়-আশয়ের খোঁজখবর রাখা—কোন্ জমি বেদখল হল—তার ব্যবস্থা। কেন বল্ তো ? তোরা ভেবেছিস কি আমাকে !

হাতের হীরের আংটিটা ঘুরিয়ে দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জেঠিমা। হীরে-জহরত নিয়ে কি ধুয়ে-ধুয়ে খাবো। হীরের মানুষটা তো বাইজীর খপ্পরে !

পাঁচির মা করুণ সুরে বলল, বড়কর্তার মন ঘুরুক বাবা সত্য-নারাণের দয়ায়। অমাবস্তেতেও সিন্নি দোব আমি।

মুখ ভেংচে খেঁকিয়ে ওঠে জেঠিমা !—মায়ের চেয়ে ডাইনির দরদ যে বেশী দেখছি। খবরদার, দ্বিতীয়বার আর এসব কথা বলবি নি আমার সামনে। বাইজী নিয়ে আছে, বেশ করেছে। এ-তো পুরুষের ধর্ম ! পালে-পার্বণে বাইজীকে নিয়ে এসে কত না গান শুনিয়েছে আমায়। আরে, রতনবাইয়ের মতো কারো অত বড় হৃদয় হবে ! যখুনি আসে, একটা-না-একটা কিছু আমাকে দিয়ে যাবেই—পান্নার দুল মুক্তোর চুড়ি চুনির হার। আহা কি গলা কি গান !—আই সখি, দুলহা কে রূপ দেখি……।

পাঁচির মা কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানায় কোন্ দেবতাকে কে জানে।—ভগবান রতনবাইয়ের ভালো করুক বড় বউদি।

মুহূর্তে ক্ষেপে আগুন জেঠিমা। জরদার কৌটো ছুঁড়ল পাঁচির মার কপাল লক্ষ্য করে। তড়িঘড়ি মাথা নীচু করে ফেলায় পাঁচির মার কপালের রক্ত বেঁচে গেল।

বুকে তাকিয়া চেপে মেঝের ঢালা বিছানায় বসেছিল জেঠিমা। রাগের চোটে দু'হাতে তাকিয়া তুলে ছুঁড়ল।—বেরিয়ে যা আপদ, বেরিয়ে যা—

দৌড়ে পালাল পাঁচির মা।

মেঝে থেকে তাকিয়া তুলে নিয়ে, একটু ঝেড়েঝুড়ে বড়বৌদির কোলের ওপর আস্তে আস্তে রেখে দিল সলমা। মাথার ওপর বনবন করে পাখা ঘুরছে। সলমা তবু তালপাতার বাতাস করছে।

—বড়বৌদি একটু জল খাও। শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে!

—সেইটাই তো এ বাড়ির সবাই চায়। আমি কি আর বুঝি না কিছু। ছোট বৌ পাগল সেজে ঘুরে বেড়াবে, পাছে কুটো নাড়তে হয়। দেওর তো সন্ন্যাসী বনে গেছে। যত জ্বালা হয়েছে আমার। ভাগ নেবার বেলায় তো সন্ন্যাসী থেকে দুর্যোধন হয়ে উঠবে তখন, বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী!

জেঠিমার চেঁচামেচিতে আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাহিনী পাঁচির মার মুখে শুনে ঠাকুরমা এসে হাজির।

যাও-বা মাথার রক্ত নামছিল একটু, ঠাকুরমাকে দেখে আবার চড়ল।—আচ্ছা মা, আপনি কি চান আমি শেষ হয়ে যাই?

—ষাট্, ষাট! তোমার শত্রু শেষ হ'ক মা। ও-কথা মুখে এনো না। সব হালই তো ধরে আছো মা।

—ফল কি হল তাতে! আপনি চলে গেলে তো পথে বসতে হবে। দেখছেন তো আপনার ছোটছেলে আর ছোটবৌয়ের ব্যাপার! আপনি দু'চোখ বুজলে ছোট বৌয়ের বাপের বাড়ির লোক এসে আমায় তাড়িয়ে দেবে। বাপের বাড়ির লোক এলে আড়ালে বেশ ফিসফিস, আমাদের কাছেই বোবা। মাকে কতবার বলেছি, একটা ব্যবস্থা করুন অন্তত। চারটে ছেলে আর একটা মেয়ের হাত ধরে পথে বেরোতে হবে আমায়।

চওড়া জরির আঁচলে চোখ ঢেকে বাচ্চা মেয়ের মতন হাউ হাউ করে কেঁদেছে জেঠিমা।—না, মা। তা হবে না। আমি ব্যবস্থা করছি যত শীগগির পারি।

হ্যাঁ, ঠাকুরমা ব্যবস্থা করেছে। করেছে বললে অপলাপ। জেঠিমা করিয়েছে। আমরা তখন টিহিরীতে। আমি আর বাবা।

আমার মনের ব্যামো সারানোর জন্যে—গুরুদেব হাতছানি দিয়ে ডাকেন—ঠাকুরমাই গুরুদেবের কাছে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে জোর দিয়েছিল।

…হৃষিকেশ থেকে আমাদের বাস ছুটেছে শাঁ-শাঁ করে। বাতাসে ডানা মেলে হাওয়ায় ভেসে ভেসে। পাহাড়ের ওপর দশ মাইল উঠে নরেন্দ্রনগর। টিহিরী গাড়োয়ালের সহর। সুন্দর সাজানো বাড়ি ঘর, যেন ছবি। বাজার পার্ক—সমস্ত কিছু। আরো উঁচুতে রাজার গরমকালে থাকার রাজপ্রাসাদ।

বাস চলেছে উঁচুনীচু—চড়াই-উতরাইয়ের পথ বেয়ে বেয়ে। যত এগিয়ে যাচ্ছে, ততই রাস্তা কোথাও তিনহাত কোথাও একেবারে খাদের ধার। ক্ষীণকায়া স্বচ্ছ গঙ্গা নীচে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে। নীচে—অনেক, অনেক নীচে। কোথাও আবার গাছগাছালি শূন্য ন্যাড়া-রুক্ষ কালো পাহাড়। চোখ পড়তে মন হু-হু করে উঠছে।

বাঁকের পর বাঁক পেরুচ্ছে আমাদের বাসের সারথী অর্জুন সিং। হ্যাঁ, অর্জুনের মতনই আজানুলম্বিত বাহু। মজবুত গড়ন। পাকানো গোঁফ টিকলো নাক। বড় বড় চোখ। গাড়োয়ালী তরুণ এক কথায় সুপুরুষ। ধৈর্য সাহসও প্রচুর। খাদের ধার থেকে বাঁকের মুখ থেকে যেভাবে সার্কাসের খেলা দেখানোর মতন যাত্রী ভরতি বাসটাকে ঘোরাচ্ছে-ফেরাচ্ছে, উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না।

যারা স্থানীয় যাত্রী, তারা এক একটা বিপদমুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে 'অর্জুন সিংজী কি জয়' ধ্বনি দিচ্ছে। অর্জুন সিংয়ের চোখের তারায় আনন্দ উৎসাহের নতুন জোয়ার। অর্জুন সিংও লাল টুকটুকে দুটি ঠোঁটে মিষ্টি হাসির আবির রাঙিয়ে মিষ্টি গলায় বলে উঠছে, গঙ্গা মাইকি জয়, যমুনা মাই কি জয়, যাত্রীয়োঁ কি জয়।

আমাদের সামনের আসনে বসা একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের গাড়োয়ালী ছেলে হাততালি দিয়ে দিয়ে মাথা নেড়ে-নেড়ে চোখ বুজে গাইছে।—জী চাহে তো রামনাম, জী চাহে তো ভোলানাথ। জী চাহে তো রাধেশ্যাম, জী চাহে তো রঘুনাথ।

বাস চলছে। গান শুনছি। কলকাতার মেয়ে অন্য জগতে এসে গেছি। সবই নতুন। দেখার শোনার আর বোঝার। সকালে বেশ বৃষ্টি ঝরেছে। বোশেখের বাতাসে তাপ নেই তেমন। দূরে-দূরে সবুজ তাজা গাছের মেলা।

বাস থেমে যেতে চেতনা হল আমার। হাতের কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ির কাঁটাটা দেখে নিল বাবা। প্রায় বারোটা। টিহিরীর মাটিতে নামলুম আমরা। এখানেই ভেতর দিকে গুরুদেব আছেন উপস্থিত। গুরুদেবের চিঠিটা কোটের পকেট থেকে বার করে স্থানীয় লোকের শরণাপন্ন হল বাবা।

লোকটি ঘাড় নেড়ে জানাল, সে জানে আত্মানন্দকে। উঁচু-নীচু পথ মাড়িয়ে নিয়ে এলো আমাদের মনোরম তপোবনে।

যতদূর চোখ যায়—ফুল আর ফুল। নানা রঙের নানা জাতের। পাঁচ মিশেলি ফুলের সুবাস বাতাসের বুকে মাতন তুলেছে একটা নতুন আমেজের। পথের উৎকণ্ঠা মৃত্যু-ত্রাস, প্রকৃতির সৌন্দর্যমুগ্ধ আনন্দ ধুয়ে মুছে গেল মুহূর্তে। এখানের আনন্দ এমনি আনন্দ নয়। কেমন—বলে বোঝানো যায় না। সব আনন্দের সেরা—তারও শেষ ওপরে বোধ হয়।

আমাদের ছেড়ে দিয়ে লোকটি চলে গেল।

তপোবনের মধ্যিখানে ছোট্ট পাথরের ঘর দেখা যাচ্ছে। রাজার মন্ত্রী জঙবাহাদুর গুরুদেব যখন আসেন, থাকতে দেন। পরিব্রাজক গুরুদেবের সব দেশই আপন দেশ, সব ডেরাই আপন ডেরা। আবার সব ডেরা সব দেশের উর্ধ্বেও উনি।

যখনকার কথা বলছি, বাবার মুখে এসব শুনলেও—জিনিসটার আসল তত্ত্ব কি—অতশত বোধ ছিল না। কথা আমার মনে আছে, ভুলিনি। আজ আমার বুদ্ধির আয়নায় সেদিনের সমস্ত কিছু নতুন করে দেখছি, বুঝছি, বলছি।

আবার আগের ঘটনায় ফিরে আসছি আমি।

বাবা আর আমি—দু'জনেই পাশাপাশি পায়ে পায়ে এগোচ্ছি।

পাথুরে ঘরখানা বুঝি জীবন্ত। ওই দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যত কাছাকাছি হচ্ছি, তত ওই ঘরের মন্ত্রধ্বনি আমাদের নিশ্বাসে প্রতিধ্বনি তুলছে প্রবল।······ওঁ দেহজাঃ ক্রিয়া সর্বাণীন্দ্রিয় কর্মাণি প্রাণ কর্মাণি··· ··।

মানে কিছু বুঝি বা না বুঝি, আমার ভেতরটা জুড়িয়ে যাচ্ছে। আমিই আমাকে দেখছি, সামনে এগিয়ে-এগিয়ে যাচ্ছে। এ-আমির চেয়ে ও-আমি কত সুন্দর। একটা সাদাটে ঠাণ্ডা আলোয় ডুবে-ডুবে ও-আমি যাচ্ছে।

বাবার দিকে তাকিয়েও দেখিনি বাবার মনের কি অবস্থা। আসলে দেখার ইচ্ছে-মন হারিয়ে ফেলেছি। যদিও বাবা হাত ধরেছিল।

ঘরের দাওয়ায় উঠতে গিয়ে বাবা দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি উঠতে যাচ্ছি, জোরে টান পড়ল আমার হাতে। বাবা উঠতে দিল না। আগেকার মনের ভাবটা কেটে গেল সহসা।

দালানের ধারে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখছি ঘরের ভেতর। খোলা দরজার ডানদিকের দেয়ালে বসুধারা আঁকা। সিঁদুরের টিপের তলায় হলুদের অর্ধচন্দ্র। তার তলায় পাশাপাশি সারবেঁধে সাতটি সিঁদুর-ফোঁটা বেয়ে মেঝে অবধি সাত-সাতটি লম্বা ঘিয়ের ধারা নেমে গেছে। জ্যাঠতুতো ভাই অম্লানের পৈতের কথা মনে পড়ল। পৈতের ঘরে ওই রকম বসুধারা দেখেছি।

হোমের আগুন জ্বলছে সামনে। পুব দিকে মুখ করে একটি তরুণ কুশাসনে বসে। উত্তরে—একটু তফাতে গুরুদেব। কুশিতে ঘি তুলে তরুণটির হাতে দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়ে আগুনে—হোমে দেওয়াচ্ছেন গুরুদেব।

গুরুদেব শিষ্যকে বিরজা হোম করাচ্ছেন। সন্ন্যাস নেয়ার বিরজা হোম।

আমার পরের জীবনে—কামাখ্যায় তীর্থনাথ এ-হোম করিয়েছিলেন। কামাখ্যা নিয়ে বলার সময় বলে গেছি।

গুরুদেব আর শিষ্যের পরনে গেরুয়া। দু'জনেরই মুণ্ডিত শির।

কোনদিকে দৃষ্টি নেই কারো। এক মন এক প্রাণ এক আত্মা। দাওয়ার নীচে মাটিতেই বাবা-আমি বসে পড়লুম। মাথার ওপর বটের ছায়া। ফুরফুরে হাওয়ায় থেকে থেকে দু'চোখ বুজে আসছে।

মন্ত্র নয় তো—গান শুনছি। গুরুদেবের হৃদয়ের গহন-গভীর থেকে মধুর অমৃতবাণীর ঢেউ দুলে উঠছে। আর সেই দোলন আমাদের শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দিগন্তে।

আসছে মনে প্রশান্তি। প্রাণে সাড়া উঠছে ওই মন্ত্রের। সংস্কৃত পড়ি নি তখন। অথচ আমি পরিষ্কার অনুভব করছি। এ ভাষা আমার কাছে অনেক পুরনো। এ আমি জানি। মনে মনে পবিত্র মন্ত্রের উচ্চারণ করে চলেছি আমি। বাবার ভেতরেও বুঝি তাই। বাবা আমায় স্পর্শ করে রয়েছে। আমার আঙুলে বাবার আঙুল কথা কয়ে উঠছে—রক্তপ্রবাহে। আর আমার?

আমার রক্তপ্রবাহের কানে শুনছি আমি।

নতুন উপলব্ধি।

গুরুদেবের মন্ত্রপাঠ শুনছি আবার।··যানিচ এতানি শুদ্ধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা। এখানে আসার সময় আগেরটা শুনেছি, এবার পরের শুনছি।

—আগের মন-প্রাণ চিত্ত-অহংকার সমস্ত ইন্দ্রিয় যা অন্ধকার রাজ্যে ঘুরে বেড়াত নৃশংস প্রবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে—তাদের সবাইকে শুদ্ধজ্যোতিতে আহুতি দিচ্ছি। এবার আমার পরিশুদ্ধ জীবনের জন্ম। আমি লোকের মঙ্গল। আমি মুক্ত আমি পবিত্র। সৎভাবে নিজেকে সবার মাঝে বিলিয়ে দেওয়াই আমার সন্ন্যাস। সকলের আত্মা সকলের প্রাণ সকলের শুদ্ধভাব—সব আমি। আমিই সবার, সবাই-ই আমার।

আমার মনে হচ্ছে, সন্ন্যাসের ব্যাখ্যা গুরুদেব ওই তরুণকে দিচ্ছেন না। দিচ্ছেন আমাকে। আমি ওই হোমে আহুতি দিচ্ছি ওই মন্ত্রে। তরুণের হাত তরুণের নয়। আমার—আমার আমার।

গুরুদেব তরুণের কানের কাছে মুখ এনে সন্ন্যাস-মন্ত্র শোনাচ্ছেন

এবার। আমি শুনছি আমার কানে।—ওঁ তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়। তুমি ব্রহ্ম তুমি মহাজ্ঞানী। তুমি সেই, তুমি সেই আমি! যে আমি যে তুমি বিশ্বের প্রতিটি অণুপরমাণু পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে।

গুরুদেব বললেন, ···নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর। —তুমি নিরহঙ্কার হয়ে সুখে দিন কাটাও।

গুরুদেব প্রণাম জানাচ্ছেন সন্ন্যাসী শিষ্যকে। নমস্তুভ্যং নমোমহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ। ত্বমেব তদহমেব বিশ্বরূপং নমোঽস্তুতে। তোমাকে নমস্কার আমাকে নমস্কার। মহৎকে বিশ্বরূপকে জগতের সকলকে নমস্কার। সকল শত্রু-মিত্রের ওপরে তুমি। তুমি শিবোহং।

আমার ভেতরে কে যেন বলছে আমাকে—আমিই ব্রহ্ম আমিই শিব আমিই বিশ্বরূপ। আমিই আমাকে প্রণাম করছি।

সন্ন্যাস দীক্ষা-ব্যাখ্যার শেষে গুরুদেব তাকালেন মুখ ফিরিয়ে চাতালের দিকে। হেসে, হাতের ইশারায় ডাকলেন।

মেঝেয় পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল বাবা। বাবার দেখাদেখি আমিও।

অপূর্ব অনুভূতি।

মুখে বলে উচ্ছিষ্ট করতে আমার বাধে। তবে না বললেও ভীষণ অস্বস্তি। কত পিপাসাকাতর মানুষ আছে। আনন্দের কণামাত্র পেলে সারা জীবনের তেষ্টা মিটে যায়। কৃপণের ধনের মতন আগলে রাখলে যে আমারও হবে না, পরেরও হবে না।

তাই বলি। আমার আনন্দের শুধু ভাগ নয়, উজাড় করে ঢেলে দিলে যদি কেউ সুখী হয়, আমি প্রস্তুত দিতে।

আনন্দের সঙ্গে আমার দর্শন হয়!

আমি ঠিক ঘুমিয়ে নেই, ঠিক জেগেও নয়। না ঘুম না জাগার মাঝামাঝি অবস্থা। অনেকে বলে, যোগে নাকি এ ধরনের অবস্থাকে সুষুপ্তি বলে। এটা নিজেকে নিজের জানার দেখার পুণ্য পরিবেশ। এ-মত কামাখ্যার তীর্থনাথেরও, আর তিব্বতের শ্রীঅরলামারও।

ওদের দু'জনের সঙ্গেই আলোচনা করেছি আমি আমার অতীত-অনুভূতি নিয়ে।

যতটুকু মনে আছে, গুরুদেব আত্মানন্দ আমার প্রণামে মাথা স্পর্শ করেছিলেন! মাথায় হাত রাখতে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে গেল সর্বাঙ্গে। শিরদাঁড়া বেয়ে কি যেন কি নেমে গেল শেষ অবধি। যতক্ষণ নেমেছে যতখানি নেমেছে, ঠিক ততক্ষণ ততখানি অবধি ঘুম-পাড়ানো সুখের আবেশ। সব হারানোর পর নতুনভাবে সব ফিরে পাওয়ার পুলক। নতুন রূপে দেখার পুলক। শরীরটা কেঁপে উঠেছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুলক-শিহরণের বাতাস বয়ে গেছে।

আমি হারিয়ে ফেলেছি আট বছর বয়েসের একটা ছোট্ট মেয়ে তুষারকণাকে। তার বাপের তুষারকে, ঠাকুরমার তুষিকে।

আমার চোখের তারায় বিশ্বসংসার ডুবে গেছে ঘুটঘুটে অন্ধকারে। কিছুক্ষণ। ফিকে হয়ে এলো ঘন আঁধার। আরো ফিকে আরো ফিকে আরো ফিকে। আকাশ জুড়ে ফুটে উঠল জবাফুল রঙের আলো। মিলিয়ে গেল একটু থেকেই। ফুটে উঠল অপরাজিতা নীল। এ-রঙও অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার সাদার ওপর চাঁপার আভা।

এই আভায় নিজেকে আমি অনেক বড় দেখছি, কিশোরী-তরুণী পেরিয়ে গেছি। একটার পর একটা অচেনা দেশ পেরিয়ে-পেরিয়ে চলেছি। বন-জঙ্গল নদী পাহাড়-বরফ উঁচু-নীচু জায়গা। মাটিতে পা পড়ছে না। মেঘে-মেঘে পা রেখে-রেখে চলছি। চলছি তো চলছিই। কি যেন একটা ভার-ভার ঠেকছে কোমরের কাছে। কি ওটা? কাঁখে আমার জলভরা মাটির কলসী।

নিজেকে অন্য রাজ্যে দেখা আমার ভেঙে গেল গুরুদেবের ব্রহ্মমন্ত্র কানে যেতে।—ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম। ব্রহ্মাণ্ডে চিরস্থায়ী চৈতন্য এক অদ্বিতীয়। এই অদ্বিতীয় শক্তি থেকেই সৃষ্টির প্রকাশ, স্থিতি। আবার এতেই লীন—লয়। অদ্বিতীয় শক্তির স্থির অপ্রকাশ অবস্থার নাম ব্রহ্ম।—ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম।

আমি ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকালুম। গুরুদেবের চোখ আমার

চোখে। হাসলেন উনি। বললেন, উঠে বোসো।

উঠে বসে, বাবার দিকে মুখ ফেরাতেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। বাবার অবাক চোখের তারা দুটি বিস্ময়-আনন্দের ধাক্কায় স্থির-অচঞ্চল। হাসি আটকে পড়েছে চোখের তারায়। আটকে পড়েছে জিভের ডগায়। ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক। বাবার এমন মুখ আমি দেখিনি কখনও।

বাবাকে বললেন গুরুদেব, অঘোর, তোর তো কোনো ঘোর থাকা উচিত নয় রে। তুষারকণা তোর নয়, ও ওর নিজেরই। নিজেকেই দেখছিল এতক্ষণ।

আমার দিকে ফিরে বললেন, কি রে মা—তাই না? আমি আমার অগোচরেই সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে জবাব দিলুম, হ্যাঁ, তাই। গুরুদেবের অন্তরের ভাষার প্রতিধ্বনি।

আমার মনে হতে লাগল বড় মানুষের মতন মন হয়ে গেছে আমার। আমি সমস্ত বুঝি, আমার অনেক বুদ্ধি অনেক জ্ঞান।

বাবা বলল, ও যখন আমাদের নয় বুঝছেন, তখন ওকে এখন থেকেই শিক্ষা-দীক্ষায় তৈরী করে তুলুন গুরুদেব।

—না, এখন অনেক সময় বাকি ওর।

দু'দিনও থাকতে দিলেন না গুরুদেব তাঁর তপোবনে। পরের সকালে কড়া নির্দেশ। —অঘোর, তুষারক[illegible]াকে নিয়ে ফিরে যা কলকাতায়।

খানিক নিস্পন্দ মূর্তির মতন চোখ বুজে বসে থাকার পর তাকালেন। যেন ঘুমন্ত চোখ। ঘুমন্ত মানুষের মতনই ভাঙা-ভাঙা ভারী গলায় বললেন, আমার মন যা বলে, আমি দেখিও। অঘোর, তোর মা খুব অসুস্থ। এ-যাত্রা বাঁচ[illegible] না আর। ওর হার্টের অসুখটা আচমকা বেড়ে উঠেছে।

গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য করে তপোবন ত্যাগ করলুম আমরা।

…ফিরে এসেছি বাড়িতে।

বাড়ি নিরালা-নীরব। কোনো লোকজন নেই বুঝি। না, সকলেই আছে। জেঠিমার হুকুম সবার ওপর।— শাশুড়ী যাবার পথে, শান্তিতে যেতে দেওয়া হোক।

ওপরে উঠতেই ঠাকুরমার ঘরে আমাদের প্রবেশ নিষেধ—খোদ জেঠিমাই জানিয়ে দিয়ে গেল। ডাক্তারের বারণ। কাউকে দেখে এতটুকু যেন উত্তেজিত না হয়ে ওঠে। উত্তেজিত হয়ে মরা অপঘাত মৃত্যুর সামিল।

ভুরু কুঁচকে বাবার দিকে চেয়ে বলল জেঠিমা, ঠাকুরপো, কোনোদিনই তো মাকে শান্তি দিলে না। কেবল গুরু গুরু গুরু! সাক্ষাৎ মায়ের চেয়ে কোন গুরু বড় শুনি? এবার সারা জীবন ধরে তীর্থধর্ম আর গুরু নিয়ে থাকো না।

চওড়া লাল দাঁতপাড় শাড়ীর আঁচলে চোখের ভিজেপাতা আলতোভাবে থুপে নিয়ে ধরা গলায় বলল, মায়ের মৃত্যুর কারণ কিন্তু তোমরা তিনজনে। তোমাদের জন্যে কম চিন্তা মায়ের! তুমি সংসার-বিবাগী, ছোট-জা উন্মাদ। আর তুষি? ও-ও তো মায়ের ধারা পুরো পেয়েছে। তোমাদের অভিশপ্ত জীবন ভাই। মনে কিছু কোরো না। বলে ফেললুম অনেক কথা। ভেতরে অনেক জ্বালা। তোমাদের চিন্তাতেই মায়ের সিরিয়াস হার্ট অ্যাটাক।

দিন তিনেক পরে ঠাকুরমা চলে গেলেন। তিনদিনের মধ্যে কোনো সময়ের জন্যে ঠাকুরমার চোখের সামনে যেতে দেয় নি জেঠিমা। না বাবাকে, না আমাকে। চব্বিশ ঘণ্টা আগলে থেকেছে। একবারটি চোখের দেখা দেখার জন্যে আমার ভেতরে কি আকুলি-বিকুলি। জেঠিমা চৌকাঠের ওপারে ঢুকতে দেয় নি। আমার চোখের জলে তার মন গলে নি। আমার মতন বাবারও দশা। ঘরের বাইরে থেকে খবর নেয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি।

জেঠিমার বক্তব্য—যদিও দু'ঘণ্টা বাঁচে ঠাকুরমা, আমাদের দেখলে নাকি তক্ষুণি শেষ হয়ে যাবে।

পাঁচির মা এসে চুপিচুপি বলেছে বাবাকে, ছোটদা, বড় বউদি

দিনরাত কর্তামার বিছানা হাঁটকাচ্ছে। এক থোলো চাবি বার করে সরিয়ে ফেলল। গলার বিছেহারটা খুলে নিয়ে বলল, মা, বুকে লাগবে—ডাক্তার বলেছে। তোমরা তো বাইরে ছ্যালে গো। উকিলবাবুকে এনে, কি সব নেকাপড়া হল।

দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল একবার পাঁচির মা। কেউ আসছে কিনা। বলল, আমি কি ছাই কিছু বুঝি গা। শুনলু, বড়বৌদি বোলছ্যালো—পাগল-বৈরাগীর নামে বিষয় থাকলে তো নষ্ট হয়ে যাবে।

ঠাকুরমার শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে যাবার পরই পাঁচির মার কথা সত্যি প্রমাণ হয়ে গেল। প্রমাণ করল জেঠিমা স্বয়ং।

আমাদের ঘরে এসে চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, ঠাকুরপো, মা আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে গেছে ভাই। চোখ মুছছে নাক মুছছে। জেঠিমার চোখের কোণ লাল নাকের ডগা সিঁদুর। —তোমরা তো সব নিশ্চিন্তে খেয়ে পড়ে ঘুরে বেড়াবে। যত জ্বালা আমার। মাকে কত বোঝালুম, বাবা আপনার নামে করে দিয়েছেন। আপনি মালিক। বেশীটা ঠাকুরপোকে দিন।

মা হেসে বললেন, বৌমা আমার শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর, ওটা কি মানুষ! মরবার সময় হাসালে বটে বেটি। তোমার নামে থাকবে সব। তোমাকেই ওদের দেখতে হবে। যতদিন বেঁচে থাকবে ওরা, এবাড়িতে থাকা-খাওয়ার অধিকার থাকবে সেফ।

জেঠিমা জোরে একটা নিশ্বাস ফেলল।—কি জড়ান জড়ানো বল তো ভাই। যাক, তুমি কিছু ভেব না।

মা গেছেন, আমি আছি তো। তোমাদের না দেখলে মরেও শান্তি পাব না যে। যখন যা দরকার পড়বে—আমাকে জানাতে ভুলবে না কিন্তু। তোমাকে নিয়েই যত আমার ভয়—এমন নির্লোভী মানুষও পৃথিবীতে থাকে। কোনো কিছু চাইতে জানে না। কোনো কিছুতেই লোভ নেই। ঠাকুরপো, মা তোমার গায়ে বিষয়ের কোনো আঁচ লাগাতে দিয়ে গেলেন না। যা ভালোবাস—তাই করে

গেলেন—বিষয়সম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রেখে গেলেন। ভাগ্য বটে তোমার। মরেছে এই হতভাগী মেয়ে।

জেঠিমা বেশ জোরে কেঁদে উঠল।—মা, মাগো। একি সাজা দিয়ে গেলে গো।

মানুষ চলে গেলেও, তার স্মৃতি তার কর্মধারাকে বজায় রাখতে চেষ্টা করে—যারা বেঁচে থাকে। এই চেষ্টাই মৃতের নীরব অস্তিত্ব প্রকাশ করে প্রতিটি মুহূর্তে। মনে হয়, গিয়েও যায় নি। আছে—সকলের কাছে কাছে আছে। বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেমন কথা কইত, ঠিক তেমনি কথা কইছে।

এতে মানুষ হারানোর ব্যথা ভোলে অনেক। কিছুটাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। শোক-পাগল মনের শোক কমে খানিক। সংসার ভাসিয়ে পালিয়ে বাঁচার বা মৃত্যুপথের যাত্রী হবার বাসনাকে আটকে রাখে অন্তত। কেবলি মনে হয়, হে পূর্ণ তব চরণের কাছে। যাহা কিছু সব আছে আছে আছে, নাই নাই ভয় সে শুধু আমারই। নিশিদিন কাঁদি তাই।

ঠাকুরমার বেলায় তা হল না।

নীরব-অস্তিত্ব মুছে গেল বাড়ি থেকে মাস দুয়েকের মধ্যে।

যারা-যারা তার প্রিয় ছিল, ঠাকুরদার আমল থেকে সংসার চালাত, সম্পত্তি দেখাশোনা করত—এক এক করে সকলকে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হল। স্বেচ্ছায় নয়। বদনামের পরাজয়-টিকা কপালে পরে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বিদায় নিতে হয়েছে বাড়ি থেকে।

বাড়ি থেকে বেরোবার আগে প্রত্যেককে কবুল করিয়ে নিয়ে তবে ছেড়েছে জেঠিমা।—স্বীকার করে যান, স্বীকার করে যাও, স্বীকার করে যা—বড় বৌদির মায়াদয়ার শরীর। ক্ষমা করতে জানে। না হলে পুলিস-কেসে জেলে পচে মরতে হত। পুলিসের পিটুনি খেয়ে হাড়পাঁজরা ভেঙে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকতে হত জীবনভোর।

সকলেই প্রায় একই কথা বলে গেছে, বড়বৌদি সাক্ষাৎ দয়াময়ী মা। দশ মহাবিদ্যার কমলামূর্তি। জেঠিমা মুচকি হেসে, ঢাকাই

শাড়ীর আঁচলে বাঁধা ভাঁড়ার ঘরের রূপোর চাবির রিঙের রূপোর চেনটা তর্জনীতে দু-পাক জড়িয়ে, খুলে নিয়ে, ডান-কাঁধের পাশ দিয়ে ঝনাৎ শব্দে পিঠে ফেলে দিল।

গজগামিনীর মন্থর গতিতে পা ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকে, খাটের বিছানায় আছড়ে পড়ে হেসে খুন।

বালিশে মুখ গুঁজে হাসছে জেঠিমা।

প্রবেশ করল ঘরে সলমা। সলমার চাকরি যায় নি। সলমা নাকি বিশ্বাসী খুব। হাসির ধমকে জেঠিমার সর্বাঙ্গ থরথর। সলমা কান্নার সুরে বলল, কেমন করে বাঁচবে বড়বৌদি? দিনরাত কাঁদতেছো। বয়েস হইছ্যালো। কর্তামা গ্যাছেন।

হাসি থামল জেঠিমার। কয়েক মুহূর্ত। মুখ গোঁজা অবস্থাতেই বলল, তোরা বুঝবি কি রে সলমা? মায়ের শোক ভুলতে আমি পারছি নে কিছুতেই। বেশ জোরে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। —আর কতদিন রাখবেন আমায়? তুলে নিন, তুলে নিন। কাছে ডেকে নিন। যে গুরুদায়িত্ব দিয়ে গেলেন, কেমন করে বইবো? চতুর্দিকে শত্রু। বিষয় নয় তো বিষ বিষ।

জেঠিমা হাতে চোখ মুছে, উঠে বসল। সামনের দেয়াল আয়নায় নিজের মুখখানা দেখে নিল ভালো করে। —বলি, ওলো সলমা। দু'হাতে বুক চেপে ধরল।

সলমার মুখে-চোখে ত্রাস। কর্তামার মতো বুকের কাল ব্যামো ধরল নাকি। ঘরের কোণে দাঁড় করানো নক্সা আঁকা লাল শালুর ওপর পুঁতির ঝালর দেওয়া বড় তালপাখাটা নিয়ে এসে হাওয়া করতে শুরু করেছে।

মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠল জেঠিমা।—চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি পোড়ারমুখী? আমার কপালটার ওপর কি নজর পড়ল না তোর! ধন্যি মেয়েমানুষ বটে। আ ম'লো যা! দাঁড়িয়ে ক্যাল ক্যাল করে দেখার সময় হল এটা!

জেঠিমা করজোড়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে ঠাকুরমার উদ্দেশ্যে

আবেদন জানাল।—মা গো, তুমি মরে গিয়ে এখন তো দেবী হয়ে গেছ মা। দেখো, যেন কোনো অমঙ্গল না হয়।

আমি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। আয়নায় দেখেছে জেঠিমা। জেঠিমাকে আমি ভালোবাসি। জেঠিমা আমায় না চাইলেও আমি যে তাকে চাই। ঘুরে ফিরে আসি দরজায়। জানি, জেঠিমা ডাকবে না। তবু আসি, আবার ফিরে যাই বেদনা-অবসাদে অবসন্ন দেহ নিয়ে।

জেঠিমা আধলার মাপে বড়সড় সিঁদুর টিপ পরে আয়নায় নিজেই নিজের মুখ দেখছে আর গাইছে।—'ভুলাইয়া ভবে আনিলি, বিষয় বিষ খাওয়াইলি। বিষের জ্বালায় সদাই জ্বলি, মা-মা বলে আর ডাকবো কত। এখনও কি ব্রহ্মময়ী হয় নি মা তোর মনের মতো'।

গান থেমে যেতেই ডাক শুনলুম আমি। আমার নাম ধরে ডাক—তুষি! প্রথমে আমি বিস্ময়ে হতবাক। কে? ঠাকুরমা নাকি? না, ঠাকুরমা তো নেই। আবার ডাক। দ্বিতীয়বারে বুঝতে পেরেছি জেঠিমা ডাকছে, ডেকেছে। আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি বুঝি বা। আনন্দে দু'চোখের পাতা ভিজে উঠল আমার।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে চৌকাঠে ঠোক্কর লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। সলমা এসে ধরে তুলল।—ভাগ্যিস নাক থেঁতো হয়ে যায় নি।

জেঠিমার গলা উঁচুগ্রামে উঠল।—গেলে তো ভালোই হত। যত জ্বলন আমার। একে মহাগুরু নিপাতের বছর—কালাশৌচটা কাটলে বাঁচি। সলমা রে, কি করে যে বছর কাটবে বুঝতে পারছি নে। এই ধুম্বি মেয়ে ঘাড় থেকে যত শীগগির নামে ততই মঙ্গল। রঙের কি-ই বা ছিরি। সারা গায়ে যেন শ্বেতি-ধবল। আবার গুণে তো নুন দিতে নেই। পাগলের মেয়ে পাগল। কি করে যে উদ্ধার হবে—ভেবে মরছি দিনরাত।

সলমাকে উপলক্ষ করে বলল, তোরা বলিস মায়ের আমি মুখের পান ছিলুম। হ্যাঁ, আমি না থাকলে মরণের সময় মুখে জল পর্যন্ত পড়ত না। আচ্ছা সলমা, তাই বলে মায়েরও কি আমার সঙ্গে

শত্রুতা করা ভালো হয়েছে ?

আমার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আঙুল দেখিয়ে বিদ্রূপের সুরে বলল, মহাজন আমার। এক কাঁড়ি টাকা নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবেন। আমার যেন হয়েছে ওপরে কাঁটা নীচে কাঁটা। যাও, চারপেয়ে লক্ষ্মী—এখুনি পড়ে গিয়ে ডাক্তারের পেছনে আমার একগাদা টাকা খরচ করাতে বসেছিল। আর মুখের দিকে চেয়ে ভালোমানুষ সেজে দাঁড়িয়ে কেন ? আদরের বাপিকে ডেকে নিয়ে এসো দয়া করে।

এসব শুনে আমি কেমন হয়ে গেছি।

দু'পা মেঝেয় আটকে গেছে।

জেঠিমার তীব্র-তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলুম—বলি, কোন্ আমির বাদশার মেয়ে এসেছিস শুনি! নড়ছিস নে যে ঘর থেকে। ভেবেছিস কি ? সলমা তোকে কোলে করে দিয়ে আসবে ঘরে!

কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেছি ঘর থেকে। বাবাকে নিয়ে এসেছি তখুনি।

জেঠিমার আগের মুখের চেহারা বদলেছে। বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। গলার স্বরও পাল্টেছে। মোলায়েম।

—ঠাকুরপো। বোসো ভাই। মা যাবার পর এদিকে উঁকি দিতে নেই বুঝি। তোমাদের মুখ চেয়েই তো বেঁচে থাকা আমার। মায়ের মৃত্যু দেখে মন বড় ভেঙে গেছে। নিজের ওপর নিজের আর কোন ভরসা নেই, কখন ডাক পড়ে কে জানে। তাই ভেবেছিলুম ছোটবৌয়ের গয়নাগাটি, তোমার আংটি-বোতাম চেনহার, তুষির গয়না—এসব দিয়ে দিই। ঘাড় থেকে দায়দায়িত্ব নেমে যায় যত তাড়াতাড়ি ততই ভালো। আমি জানি, তুমি আমায় এত বিশ্বাস কর—পৃথিবীতে আর কাউকে নয়। আমার কাছে থাকাও যা, তোমার কাছে থাকাও তা। তুমি তো কোন জিনিস চাও নি কখনও, চাইবে নাও জানি। তবু আমি দেবার মনস্থ করেছিলুম।

বাবা বিনয়ের সঙ্গে বলল, বৌদি, এসব কোন কথা শুনতে চাই

না আমি। আমি চললুম বৌদি।

—না ভাই, সব বলা হয় নি আমার। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, মায়ের কাছে অনেক আগে থেকে হাতিয়ে নিয়েছে সব নিশ্চয় নানা কাঁদুনি গেয়ে গেয়ে বেইমানেরা। সিন্দুকে কিছু নেই। তাই তো দূর করলুম ওদের। ওরাই তো চব্বিশ ঘণ্টা মায়ের সঙ্গে ফিসফিস করত। আর মাকেও বলি, একবারও বলে গেলেন না এসব। তুমি না হয় কিছু ভাববে না জানি, অন্য কেউ হলে, চোর সাব্যস্ত করত কি না করত বল ?

—বৌদি, ওসব নিয়ে চিন্তা করে শরীর মন খারাপ কোরো না। মানুষের চেয়ে কি গয়নাগাটির মূল্য বেশী ? মা যাকে যা হাতে তুলে দিয়ে গেছে ঠিক করে গেছে।

—বল কি গো। ওই জন্যেই তোমাদের ওপর আমাকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন বারবার। প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়েছেন। আমি তোমার মতো অমন হতে পারবো না ভাই। তাঁর আজ্ঞা পালন করতে হবে। সবদিকে নজর রেখে বিষয়সম্পত্তি চালাতে হবে। সব দূর করেছি, নায়েব সরকার দরোয়ান পাঁচির মা, লালুয়া, নিধুবামুন —মাকে ভালোমানুষ সরল পেয়ে দিব্যি হাত বুলিয়েছে মাথায়। ভাবেনি কেউ ধরা পড়বে।

জেঠিমা বাপের বাড়ি থেকে উকিল-ভাইয়ের পরামর্শে সমস্ত নতুন লোক রেখেছে। এরা নাকি খুব বিশ্বাসী। এরা থাকলে একটা বিরাট সর্বনাশ হয়ে যেত না। বাবার তো মহাভয় ধরল, ভেবে ভেবে জেঠিমার না আবার ঠাকুরমার মতো রোগ ধরে।

যতটা পেরেছে, বাবা অনুরোধ করেছে ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে দিতে। চলে যা যায় তা আসে না আর ফিরে। মিথ্যে পাগল হওয়া।

জেঠিমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। কান্না ভেজা গলায় বলেছে, আমার গয়না না হয় ছোটবৌকে দাও। ভাগ্য ভালো, মায়ের সিন্দুকে ছিল না, নাহলে এও যেত।

—বৌদি, ওকথা মুখে উচ্চারণ কোরো না আর। যাদের জিনিস

তারাই পেয়েছে। আমাদের নয়, আমাদের নয়।

বারান্দায় পায়চারি ঘরে পায়চারি ছাদে পায়চারি। বেশীরভাগ সময় বাবাকে এই অবস্থায় দেখে দেখে ভীষণ ভয় ধরেছিল আমার। বাবা আমার এমনি খুব অমায়িক হাসিখুশী। সেই মানুষ কেবল আনমনা। বাবাকে এ অবস্থায় দেখে মনে হয়েছে, না জানি কত দূরে চলে যাচ্ছে।

বড় একটা কাছে নেয়া আদর করা আদিখ্যেতা দেখানো এটা বাবার স্বভাব বিরুদ্ধ। তবে দেখলে এমন হাসি ফুটে উঠেছে মুখে, ভোলা যায় না। চিবুক ধরে বলেছে, কি গো আমার মামণি। পড়বি না? মাস্টারমশাই আসে নি বুঝি। তাহলে একটু গান গা শুনি।

আমাদের বাড়ির দু'খানা বাড়ির পরে মনোরমা মাসির বাড়ি। মনোরমা মাসি আমাদের বাড়ি রোজ বিকেলে আসে। মমতাদি—মমতাদি আমার জ্যাঠতুতো বোন। আমার চেয়ে বছর ছয়েকের বড়। আমার বাড়ন্ত গড়নে ওর মাথায়-মাথায় এসে গেছি। বাইরের লোকে বলে সমবয়সী।

আমি ভূমিষ্ঠ হবার আগে যে দিদি মারা গেছে তাকে দেখিনি, ফটো দেখেছি। আমাদের বাড়ির মেয়েদের মধ্যে সেরা সুন্দরী ছিল। একদিনের জ্বরে শেষ। ঠাকুরমার মুখে শুনে শুনে মন বড় খারাপ হয়ে যেত। ঠাকুরমা কাঁদত দিদির জন্যে। দিদির জলজ্যান্ত শরীর দেখার জন্যে ছটফট করেছি। কোথায় পাবো দেখতে। দেখার আশা দেখার আশা—আশা শুধু ছলনাময়ী। ঘরে ছবির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবেছি—ছবিটা জ্যান্ত হয়ে উঠে ফিকফিক করে হাসছে।

ঠাকুরমার কাছে দৌড়ে গিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলেছি, দিদি আমাকে দেখে হাসে। কাঁদো-কাঁদো কথায় বলেছে ঠাকুরমা, দিদি-ভাই তোরা দেখতে পাস। আমার পোড়া ভাগ্য, একবারও চোখে পড়ে না। কত দেখার চেষ্টা করি—শোবার ঘরে পড়ার ঘরে।

দিদির মতন নাকি আমি হুবহু দেখতে। বেঁচে থাকলে লোকে বলত দু'টি যমজ বোন। মনোরমা মাসি আমাদের ঘরে ঢুকলেই বলত। অবিশ্যি আমি কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে।

মাসির কি ভালোবাসাই না পেয়েছি আমি। আমাকে নিজে এসে নিত্যি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া। নিজেই সঙ্গে করে আবার পৌঁছে দেওয়া, কি যত্নআত্তি। সুশান্তদা আর আমাকে পৃথক করে দেখেনি কখনও। মাসি আমার নিজের নয়, পাতানো। তবু কি উদার মন!

সুশান্তদাকে আর আমাকে পাশাপাশি দুটো আসনে—ময়ূরপঙ্খী আর পদ্মের—সুশান্তদার ময়ূরপঙ্খী, আমার পদ্ম—বসিয়ে সমানভাগে জলখাবার খাইয়েছে দিনের পর দিন। যে জিনিস বাড়িতে বানানো হবে, আমাকে না খাইয়ে মুখে দেবে না। সে কপির সিঙারাই হোক বা কড়াইশুঁটির কচুরীই হোক।

রান্নার ঘরে বামুনের সঙ্গে বসে বসে নিজে হাতে জলখাবার বানিয়েছে। ময়রাকে হার মানায়—এমন হাতের কাজ। কি না জানে মাসি! তোতাপুলি লেডিকেনি সন্দেশ পিঠেপানা—কত কি!

আমি খাবো না জেদ ধরলে, জোর করে মুখে পুরে দিয়েছে। অনেক সময় সুশান্তদাকেও খাইয়ে দিতে বলেছে। খাইয়ে দিয়েছে সুশান্তদা। আমার সে কি লজ্জা! আর মাসির? কি আনন্দ।

মাসির সুশান্তদাই একমাত্র সন্তান। কত দেবদেবীকে সাধ্যসাধনা করে এই দানটুকু পেয়েছে। মেয়ের সাধ ছিল বড্ড—একটি মেয়ে। মিটল না। বিধি বাম।

মমতাদির বয়েস সুশান্তদার। নামের সঙ্গে মেজাজেরও সামঞ্জস্য খুব। আমার জাঠতুতো ভায়েরা কি দুর্দান্ত, সুশান্তদা একেবারে

উল্টো, অদ্ভুত শান্তশিষ্ট। মাসির আর আমার মতো ভালোবাসে গান।

মাসি দুপায়ে বেলো করে অর্গ্যান বাজায়, দু'হাতের লম্বা চকচকে নখের ছুঁচলো আঙুল ছুঁইয়ে-ছুঁইয়ে। মিষ্টি সুরে গায়। আমি আর সুশান্তদা দুপাশে দাঁড়িয়ে মাসির নির্দেশে গান শিখি গলায় গলা মিলিয়ে।

ওই শেখা গানেরই এক আধটা গাই বাবা যখন বলে।—'এসো গো একা ঘরে একার সাথী, সজল নয়নে বল রব কত রাতি ·····।' আর একটা গান বাবার খুব প্রিয়। বারে বারে গাইতে বলেছে। —'তাহারে ভুলিব বল কেমনে। গাঁথা সে যে তব শতগানে যতনে।'

সেই বাবা। গান শুনতে চাওয়া তো দূরের কথা, চোখাচোখি হলে যেন অচেনা। বাবার জন্যেই যত আমার ভাবনা। বাবা পায়চারি করে যখন, আমি বারান্দায় গিয়ে, কখনও ঘরে বসে একটু গলা ছেড়ে গাইতে বসি। বাবাকে শোনাবার জন্যেই। গানের যে কলি একবার শুনে তৃপ্তি পায় না বাবা, আমাকে দিয়ে পাঁচ-ছ'বার গাওয়াবেই অন্তত। সেই কলি সুরে সুরে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করি আমি।

···কি হবে রুধিয়া দোর,
মানিবে না মনচোর
বাহিরের বাঁধনে '
তাহারে ভুলিব বল কেমনে।

বাবার দিক থেকে কোনো সাড়া পাই নি। গানের কোনো বাণী প্রবেশ করছে না কানে। আমি অবাক হয়ে চুপ করে বসে থেকেছি খানিক। আবার মনে হয়েছে, যেখানে বাবা 'আহা-আহা' করে উঠত, সেটুকুও গেয়ে দেখি না। গেয়েছি।

'যাবি কোন্ দূর বিজনে পাশরিতে সেই জনে
সেথা ওতো গাহে পাখি কাননে।
সেথা ওতো ফোটে ফুল বরষা বিরহাকুল,
সেথা ওতো ওঠে চাঁদ রজনীর গগনে।'

কোন প্রতিক্রিয়াই বাবার মুখে-চোখে প্রকাশ পায় নি। আগেকার মতো নির্লিপ্ত-নির্বিকার। অভিমানে গান বন্ধ করেছি। যে ঠোঁট ছুঁয়ে সুর বেরিয়েছে, সেই ঠোঁট কেঁপে-কেঁপে উঠেছে। চোখের জল নেমেছে হুড়হুড় করে। জিভে নোনতা স্বাদ। আঙুল কাটা রক্ত থামাতে গিয়ে চুষে যে স্বাদ পেয়েছি একবার, সেই স্বাদ।

আমি কাঁদছি কি হাসছি—বাবার জানার কথা নয়। বাবার দৃষ্টি কোন্ সুদূরে কে জানে। আমার নীরব কান্নার দিকে যে নয়, এটা বুঝতে পারি। নিষ্ফল রোদন। বাবার মন যেখানে ভেসে বেড়াচ্ছে, সেখান থেকে টেনে আনতে পারি নি, ফিরিয়ে আনতে পারি নি। হয়তো আমার সাধ্যের বাইরে বলে।

বাবা ফিরল।

আগের অবস্থায় আবার নতুন করে। আমার জন্যে নয়, গুরুদেব এসেছেন শুনে। গুরুদেবের নামের যাদুমন্ত্রে।

মনোরমা মাসি আর বাবা দু'জনে একই গুরুর শিষ্য। গুরুভাই গুরুবোন। গুরুদেব টিহিরী থেকে এসে উঠেছেন ও-বাড়িতে। ঠাকুরমা থাকতে যখন কলকাতায় এসেছেন, আমাদের বাড়িতেই এসেছেন। এই প্রথম অন্য রকম।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যেয় মাসির বাড়ি নিয়ম করে যায় বাবা। গুরুদেবকে গান শোনাতে বলে, নিজেও শোনে। গানের তারিফ করে বাবা, তারিফ করেন গুরুদেব। সকালে গুরুদেব ধ্যান আর যোগ শিক্ষা দেন। শরীর মন সুস্থ হবে। একের শরীর মন সুস্থ থাকলে, সেই-ই অন্যের মন-দেহকে সবল-নীরোগ করে তুলতে পারবে। এ দুটোতে বয়সের কোনো পার্থক্য নেই। ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সকলের সমান অধিকার। ছেলেবেলা থেকে শিখলে, অভ্যেস করলে, সুস্থ-শান্তির সমাজ গড়ে ওঠে। এই যন্ত্রণাজর্জর পৃথিবীই শান্তির স্বর্গসুখের দুনিয়া হয়ে ওঠে।

গুরুদেব মাসখানেক কলকাতায় থাকবেন। মনস্থির করে ফেলেছেন কিছু ছেলে-মেয়ে তৈরী করে যাবেন।

নীচের বড় ঘরে শেখান। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশজন বেশ পা-হাত ছড়িয়ে বসে অনায়াসে শিখতে পারে! কারো কোন অসুবিধে হবার প্রশ্নই ওঠে না। আর যত রকম সুযোগসুবিধে করে দিয়েছে মাসি।

মেসোও এই গুরুদেবের শিষ্য ভক্ত অনুগত।

গুরুদেবের কখন কি প্রয়োজন—এই নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। মাসি-মেসোর গুরুযত্ন গুরুসেবা আমার খুব ভালো লাগে।

মাসির নীচের হলঘরে আসনপিঁড়ি হয়ে বাবা-আমি বসি। অনেকে শিখতে আসে জানতে আসে।

একটা কাঠের চৌকির ওপর কম্বল, তার ওপর গেরুয়া চাদর বিছানো। দু'পাশে গেরুয়া ওয়াড় পরানো দুটো তাকিয়া। পেছনে একটা। মধ্যিখানে বসে গুরুদেব শিক্ষাদীক্ষা দেন।

অন্যকে দীক্ষা দিলেও—মন্ত্র, যার যে দেবতা পছন্দ, সেই দেবতার—আমাকে কিন্তু দেন নি। বাবা বলেছে, মেয়েটাকে দিন না।

গুরুদেব বলেছেন, আমি দেবো না। এর গুরু যাঁরা, তাঁরা দেবেন। আর তাছাড়া এর সময় এখনও হয় নি। সংসার-ধর্মটা করুক কিছুদিন—তারপর না!

বাবা বিস্মিত। আমি কিছু বুঝি না, চুপচাপ।

গুরুদেব আমাকে কাছে ডেকে, মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। বাবার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বললেন, আমি তো এর একরকম গুরুই রে। একে আমি অনেক বড় দেখেছি, এও নিজেকে অনেক বড় দেখেছে। ওর কানে তো মন্ত্র শুনিয়েও দিয়েছি। তবে, এই মন্ত্র এখন ওকে জপ করতে হবে না। পরে যিনি দেবেন, তখন মন্ত্রের মর্ম-শক্তি বুঝতে পারবে ও। জপও করতে হবে ওকে।

এবার বাবার মুখে হাসির ঢল। এসবের অর্থ না বুঝলেও বাবার হাসির ছোঁয়া লাগল আমার মনে।

কিছুদিন ধরে একটা শূন্যতা বোধ করছিলুম খুব। ভেতরের সে-ভাবটা কেটে গেল আমার। অজানা আনন্দের জোয়ারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলুম। দু'চোখ জুড়ে নিথর-ঘুম নামছে। মাথার ওপর থেকে

হাত তুলে নিলেন গুরুদেব। আমি ঘুমভাঙা চোখে তাকিয়েছি। গুরুদেবের চোখে কৌতুকের হাসি।

বলেছেন, তুই কি একাই জায়গাটা দখল করে বসে থাকবি রে। সুশান্তকে আসতে দে, ওকে আজ দীক্ষা দেবো।

গুরুদেবের ইঙ্গিতে যে ক'জন ঘরে ছিলুম আমরা, বেরিয়ে গেলুম।

রাগ যে একটু হয় নি, তা নয়। হয়েছে। সুশান্তদার সময় হল, আমার বেলায়—সময় এখনও হয় নি। গুরুদেব যতদিন মাসির বাড়ি থাকবেন, ত্রিসীমানায় মাড়ায় কে আর। বাবা শত সাধলেও, আর আসছি না। বাবার গুরুদেব বাবার আছে, আমার তাতে কি। বাবা গুরুদেবকে নিয়ে থাকুক না দিনরাত। আমার কি! আমার ওপর কারই বা স্নেহ ভালোবাসা আছে! না বাবার না গুরুদেবের। সকলেই দেখছি সুশান্তদাকে ভালোবাসে।

কিছুক্ষণ বাদে ঘরের দরজা খুলে হাসি মুখে সুশান্তদা বেরিয়ে এসে আমাকেই যেতে বলল ভেতরে প্রথম।

হাড়পিত্তি জ্বলে গেছে আমার। মনে মনে গজরাচ্ছি। —লজ্জা করে না বলতে। নিজের হয়ে গেছে নাকি, তাই শোনানো হচ্ছে। আমি যাবো না, বাড়ি পালাবো।

একদিন এ বাড়িতে না এলে, সুশান্তদা অমনি ওবাড়ি গিয়ে হাজির। তুষার, যাসনি কেন? মা কি ভাবাই ভাবছে তোর জন্যে। একটু আক্কেলবিবেচনা নেইকো।

আমি রেগে মুখ ভেঙচে বলেছি, কেন, তোমায় কি বাতে ধরেছে—এসে খবর নিয়ে যেতে পারো নি? মাসিকে তুমিই ভাবিয়েছো। দোষ সব তোমার। আবার ঝগড়া করতে এসেছে বাড়ি বয়ে।

ফর্সামুখ লাল হয়ে উঠেছে সুশান্তদার তখুনি। —তোর বুড়ো-বুড়ো কথা শুনতে আসি নি। এক্ষুনি যেতে হবে আমার সঙ্গে। কৃষ্ণনগরের সরভাজা মা ঘরে তৈরী করেছে। তুই না গেলে আমার খাওয়া হবে না। শীগগির চল্ বলছি।

আমি খেঁকিয়ে উঠেছি, হ্যাঁ, তোমায় সরভাজা গেলাচ্ছি আমি। আমার সঙ্গে ঝগড়া করলে কেন? কেন যা-তা বললে—যাবো না।

—যাবি না?

—না।

—যাবি না?

—না—বলে দিয়েছি তো।

আর কোন কথা নয়। সুশান্তদা আমায় পাঁজাকোলা করে তুলে ধরল। আমি ত্রাহিত্রাহি চীৎকার।

বললে, আছড়ে ফেলে দেবো উঠোনে। এখনও বলছি, যাবি কিনা বল্।

ভয়ে-মেয়ে বলেছি, যাবো।

আমি ভাবছি, সরভাজা খাওয়ানোর মতন আবার এখানেও ওই অবস্থা না হয় আমার। ওর চোখে ধুলো দিয়ে পালানো মুশকিল। আবার পাঁজাকোলা করে না তুলে ধরে সকলের সামনে!

মাসি বলে, পঞ্চানন ঠাকুরের দোরধরা সুশান্ত। ক্ষেপে গেলে রক্ষে নেই। এমনিতে মাটিব মানুষ। রাগলে, যা গোঁ ধরবে—করে তবে ছাড়বে। ঠাকুর ওব মাথায় চেপে বসে তখন।

গম্ভীর হয়ে বলল সুশান্তদা, শুনতে পাচ্ছিস না নাকি? সকলে ভেতবে গেল, তুই যে দাঁড়িয়ে রইলি!

কেন দাঁড়িয়ে রয়েছি—সে তো সুশান্তদার জন্যেই। ভেতরটা অভিমানে-ক্ষোভে গোমরাচ্ছে—দেখে কে? বললুম, কেন যাবো শুনি?

—এ আবার কি কথা!

—হ্যাঁ, এই রকমই কথা। মা[illegible] তোমার কিছু নেই।

—কি রকম?

—কি রকম আবার—তোমাদের গুরুদেব—আমি যাবো কেন? যাবো না!

রাগে ফুলছে সুশান্তদা। এগিয়ে আসছে আমায় ধরতে। বুঝতে পেরে একতিল দেরী না করে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়েছি।

'হো-হো' করে হেসে উঠেছে সুশান্তদা।

আমার কানে বাজ পড়ার আওয়াজ। এ বাড়িতে এই আমার শেষ আসা। আর আসছি না। কাল ঘরে খিল বন্ধ করে—বসে থাকবো, নয়তো জেঠিমার ঘরে। সুশান্তদার নাগালের বাইরে।

পরের সকাল আসতে আর তর সইল কই! সন্ধ্যেয় যেতে হয়েছে গুরুদেবের কাছে আবার। গুরুদেবের দৃষ্টি আমাকে সারাটা দিন ঘিরে রেখেছে। ওই একই দৃষ্টি।

সকালের দিকে সুশান্তদার ভয়ে যখন হলঘরে গেছি, তখনকার দৃষ্টি।

গুরুদেব হেসে মুখ উঁচু করে তাকালেন। বললেন, পাগলী কোথাকার। তোর অভিমান বড্ড। ক'দিনই বা আর এখানে আছি। না এলে পরে পস্তাবি নিজেই।

আমি ঠাণ্ডা গলায় আস্তে আস্তে বলেছি, আমি এসে কি করবো? বাবা-সুশান্তদা তো রয়েছে।

জোরে হেসে উঠেছেন উনি। পিঠে একটা চাপড় মেরে বলেছেন, তুই যা বলেছিস, ঠিকই। তোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না, না?

মাথা নীচু করেছি, হ্যাঁ, তাই।

গুরুদেব বললেন, আমার চোখ দুটো ভালো করে দেখ দিকিনি—তাই মনে হয় কিনা?

দেখেছি। চোখ কথা কইছে। আমার সর্বাঙ্গে স্নেহের তুলি বুলিয়ে দিচ্ছে।

বাড়িতে এসেও আমার ওই অনুভূতি। গুরুদেবকে কাছে কাছে পেয়েছি। সুশান্তদার ওপর দীক্ষার জন্যে যে হিংসে বাসা বাঁধতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল মনের এক চিলতে জায়গার একটা কোণের আবছা অন্ধকারে, সেটা মুছে গেছে, হারিয়ে গেছে কখন আমার অজান্তে।

গুরুদেবকে দেখবার জন্যে ছটফট করেছি। যেন কতদিন কোন আপনজনের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ ঘটে নি। কিন্তু উপায় কি? সন্ধ্যে ছাড়া আর দেখা হবে না। উনি বিশ্রাম করেন। নিজের

ধ্যানধারণা নিয়ে থাকেন। 'কখন সন্ধ্যে আসে কখন সন্ধ্যে আসে' ক্ষণ গুণেছি কেবল।* মাথায় একটা পাথরভারী বোঝা, সরাতে পারছি না কিছুতেই। সন্ধ্যে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে বুঝি আজ! এত দেরী কেন! কোন দয়ামায়া নেই!

ব্যাকুল হয়ে বাবাকে বলেছি, গুরুদেবের ওখানে যাবার জন্যে কই কাপড়চোপড় ছাড়ছো না?

বাবার কণ্ঠে বিস্ময় মেশানো স্বর।—এখন কিরে। এই তো বিকেল সবে, সন্ধ্যে আসুক!

নিরাশ মনে দেয়াল ঘড়ির সামনের দেয়ালে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে বসে সন্ধ্যে আগমনের প্রতীক্ষা করছি। পিপাসাকাতর চাতকিনীর মেঘের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘড়ির কাঁটা সরা দেখে যাচ্ছি। বড় পেণ্ডুলাম দুলছে ডাইনে-বাঁয়ে। গোল চকচকে চাকতিটা সাদাটে মেঘ হয়ে আসছে। শরতের হালকা ছেঁড়া খোঁড়া মেঘ। উড়ে যাচ্ছে মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার এসে চাকতি ঢেকে ফেলছে।

কতক্ষণ এই কল্পনার খেলা সত্যি বলে দেখেছি জানি না। সহসা মেঘ কেটে একেবারে নীল আকাশ। আকাশের নীলে গুরুদেবের গৌরমুখ।

বাবার ডাক শুনলুম।--তুষার, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, গুরুদেবের কাছে যাবি না? আমি ধড়মড় করে উঠে পড়লুম।

গুরুদেবের ঘরে প্রবেশের মুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। ঘর ফাঁকা। এমন সময় লোক গিসগিস করে। খোল করতাল আর হারমোনিয়ামের সুরে সমবেত কোরাসের গলায় গুরুবন্দনা গমগম করতে থাকে।

গুরুদেব বসে আছেন বাঁ বগলে কাঠের দণ্ডের ওপর অর্ধচন্দ্রের বগলিতে চাপ দিয়ে—বাঁদিক হেলে। চেয়ে রয়েছেন এমনভাবে, যেন আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছেন।

কাছে যেতে মৃদু হাসলেন। পা ছুঁয়ে প্রণাম করলুম আমরা।

—বারণ শুনিস না কেন? তোদেরও যে শক্তি চালাচ্ছে, আমাকেও সেই শক্তি। আমি তোদেরই মতো।

ঘরের চারকোণে চারটে পেতলের মুখঢাকা ধুনুচি। ঢাকনার এক একটা ছিদ্র দিয়ে লিকলিকে ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠছে। ছড়িয়ে পড়ছে ঘরময়। চন্দন গুগগুলের সুবাসে ভরপুর। ঘরখানা দেবতার পবিত্র মন্দির। মন্দিরের দেবতা গুরুদেব।

কোন প্রশ্ন করার আগেই গুরুদেব নিজেই বললেন, তোরা চলে যাবার পর সকলকেই আজ সন্ধ্যেয় আসতে মানা করে দিয়েছি। সব জিনিস সকলের সামনে দেখানো যায় না, বলা যায় না। তড়িঘড়ি রাতারাতি মহাত্মা হয়ে ওঠার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় উল্টা বুঝলি রাম হয় অনেকের। হিতে বিপরীত করে বসে। যারা বোধশক্তি বাড়ানোর পাঠশালায় ধ্যানের অ-আতে আঁক বুলোতে শিখছে সবে, তারা ক-খ লিখতে পারবে কেন?

বগলের বগলিটা নামিয়ে রেখে, গুরুদেব বললেন, তুষারকণাকে ঘর থেকে সরিয়ে দিবি কিনা ভাবছিস? ও ভাবনা আমার, তোর নয়। তুষারকণার আধার ভালো। ওর বোধ-বুদ্ধি যা আছে এ বয়েসে—লোকের মরতে গেলেও হয় না। ও অন্য। আমি যা বলবো, ও শুনুক। আমি শুনিয়ে রাখতে চাই ওকে। আমি যা বলবো—তুই পালন করবি, অভ্যেস করবি। পালন-অভ্যেসের প্রয়োজন নেই ওর। ওর জীবনে এখন বিশ্রামের যুগ চলেছে। পরিশ্রমের যুগ এলে, ওকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে অঘোর, অনেক!

চৌকি থেকে নামলেন গুরুদেব। গায়ের গেরুয়া চাদর, দু'পাট করে পরা গেরুয়া ধুতি খুলে ফেললেন। ভেতরের গেরুয়া কপনিটা রইল স্রেফ।

মেঝেয় পাতা কম্বলের ওপর নিজে ভুজঙ্গাসন করে দেখিয়ে দিলেন। পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে নাই অবধি কম্বলে ঠেকিয়ে রেখে, দু'হাতের তেলোয় ভর দিয়ে মাথাটাকে সাপের মতন উঁচু করে তুলে রাখলেন।

তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে রইলেন শবাসনে। 'বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল রাখা। বুকে দু'হাতের বেড়। ডানহাত বাঁদিকে বাঁহাত ডাইনে।

উঠে বসলেন। বললেন, অঘোর, রোজ এ আসন কিছুক্ষণ অভ্যেস করিস। এতে শুধু খিদেই বাড়বে না। নানা রোগের প্রতিরোধ শক্তিও বাড়বে। আর একটা মস্ত জিনিস লাভ হবে—বুঝলি?

কুণ্ডলিনীশক্তি কুণ্ডলিনীশক্তি—যেটা এত শুনিস—সেই শক্তি জেগে ওঠে। মানুষ সংযত হয়ে ওঠে। জীবনীশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি। আনন্দ আর চেতনায় গড়া এই জীবনীশক্তিই কুণ্ডলিনীশক্তি।

গুরুদেব বলে চলেছেন।

—সাধনাই বল্ আর সংসারই বল্—সবেতে জীবনীশক্তির প্রয়োজন। শরীরে প্রকৃতির ধর্ম যাতে বাসা না বাঁধে। অর্থাৎ জরা থেকে নিজেকে রক্ষে করা বিশেষ দরকার। জরা থেকে নিজেকে রক্ষে করতে পারলে—মন-দেহ চিরতরুণ।

—ভুজঙ্গিনীমুদ্রায় এটা সম্ভব। জপ করতে করতে মুখ ফাঁক করে ঢোঁক গেলার মতো গলা দিয়ে বাতাস গেলা। আর একটা মুদ্রা আছে। সেটার নাম শীতলীমুদ্রা বা কাকী।

কাকের মতন দুটো ঠোঁট সরু করে বাতাস টানা। বাতাস গেলা।

বললেন, এতে আয়ু বাড়ে। যদি কাউকে শেখাস, লোক বুঝে। নিজে বসে দেখিয়ে দিয়ে।

কম্বল থেকে উঠে পড়লেন গুরুদেব।

কাপড় পরে, চাদর গায়ে ঢেকে চৌকির আসনে বসলেন আবার আগের মতন। মুখ-চোখ থেকে একটা স্নিগ্ধ-জ্যোতি বেরিয়ে আসছে।

আমার দিকে চেয়ে আছেন একদৃষ্টে। চোখের কোণে ঠোঁটের ফাঁকে শিশুর হাসি। বললেন, আসন-মুদ্রা তো দেখানো হল, এবার যোগচক্রের ধ্যানের কথা বলি।

নিজের মনকে স্থির করার জন্যে, নিজের আয়ত্তে আনার জন্যে

ধ্যানের বিশেষ প্রয়োজন। ধ্যানে যে শুধু ধারণা শক্তি বাড়ে তা নয়। নিজেকে চেনা যায় দেখা যায়। আর অপরকেও।

মন শরীরের যে অংশে যখন ঘুরে বেড়ায়, তখন সে অংশের ক্রিয়াকলাপে মগ্ন হয়ে যায় মানুষ। মগ্ন হতে হতে এমন হয়ে পড়ে যে, অনিয়মের চূড়ান্ত। শরীর ভাঙে মন ভাঙে। সংসারে সমাজে ঋতু পরিবর্তনের মতো পরিবর্তন থাকবেই। জীবনে সুখ আসবে দুঃখ আসবে, আসবে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, আসবে অমাবস্যার অন্ধকার। ভয় পেলে চলবে না। সব কিছু তুচ্ছ করে বীরের মতো এগিয়ে যেতে হবে।

এই বীরের মতো এগিয়ে যাবার জন্যেই যোগ-যোগচক্রের ধ্যান। মনকে ঠিক করা। দেহের নীচের দিকে যে সব স্নায়ু আছে, সেখানে মনকে পাঠানো মানেই সেখানের স্নায়ুকে সতেজ রাখা। তা বলে এ নয় যে, সেখানকার স্নায়ুকে উত্তেজিত করে উচ্ছৃঙ্খল হওয়া। এমন রঙের ধ্যান আছে শরীরের স্নায়ু-গ্রন্থির জায়গায়—সেখানকার স্বাভাবিক কাজ খুব নিয়মমাফিক হতে থাকে। বরং আরও সংযত-সুস্থ করে তোলা যায়।

এমন ধ্যান—মন সেখানে থেকেও নেই। নীচুর দিক থেকে ক্রমে ক্রমে উর্ধ্বে উঠে একেবারে মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। মানুষ শোক-দুঃখ অশান্তি ভুলে যায়। অজানা আনন্দের স্রোত বয়ে চলে সর্বাঙ্গ বেয়ে। পা থেকে মাথা, মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেহের প্রতিটি প্রধান স্নায়ুকেন্দ্রে ধ্যান। রঙ দেখা আর রঙের চিন্তা—মানুষের মন আশ্চর্য রকমে গড়ে ওঠে এক বিচিত্র জগতের মন হয়ে। এই মন সব মনে প্রবেশ করতে পারে প্রবল ইচ্ছেশক্তির প্রভাবে। সব মনকেই নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী ঘোরাতে ফেরাতে পারে অনায়াসে। একটা বিশুদ্ধ আনন্দের খনি হিসেবে তৈরী করে তোলা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। গুপ্ত মন্ত্র হচ্ছে—অভ্যেস। একমনে নিয়ম করে অভ্যেস। অসাধ্য-সাধন সম্ভব হয়ে ওঠে। এর পেছনে অবিশ্যি আর একটা জিনিস আছে। আন্তরিক চেষ্টা।

গুরুদেবের ডান পাশে চৌকির সমান উঁচু একটা ছোট্ট টেবিল। টেবিলের ওপর জলভরতি শ্বেত পাথরের গেলাস, মন্দির ধরনের পাথরের ঢাকনা চাপা। গুরুদেব ঢাকনাটা খুলে আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলেন।

ঠাণ্ডা জলে গলা ভিজিয়ে, একগাল হেসে বললেন, আচ্ছা অঘোর, তোর মনে হল না গুরুদেবের ঢাকনাটার ওপর এত মায়া কেন? ভাঙলে ক্ষতি কি! সেদিন তো টেবিলে রাখা অত সুন্দর অত দামী, ফ্রান্স থেকে আনানো কাঁচের বাতিদানিটা গুরুদেবের গায়ের চাদর ঠিক করতে গিয়ে হাত লেগে, মেঝেয় ডিগবাজি খেয়ে পড়ে ভেঙে খান্‌খান্‌।

মনোরমা দিদি দৌড়ে এসে বলেছে, গুরুদেব, আপনি বিব্রত হবেন না। গেছে ভালো হয়েছে। ওটার ওপর আমার বড় বেশী মোহ ছিল। ঠাকুর ঘরে সুস্থির হয়ে যদি বসতে পেরেছি একটা দিন।

ঠাকুরের ধ্যান করবো কি—ওই বাতিদানির ধ্যান। কেবল চিন্তা. কেউ না ভেঙে ফেলে কেউ না ভেঙে ফেলে।

গুরুদেব এবার হো-হো করে বেশ জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, কেমন—তাই না?

বাবা কোন উত্তর দিল না।

গুরুদেব বললেন, অঘোর, অজান্তে যে ভুল হয়ে গেছে, মনকে বলেছি, আর যেন না হয় কোনদিন। মন কথা শুনেছে। সেই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছে। চেতনাকে জাগিয়ে রাখলে, অনেক অনিষ্টের পথ থেকে মানুষ রক্ষে পা-য় নিজের অগোচরে। তুলসী দাসজী বড় সুন্দর বলেছেন—'তুলসী য়্যাসা ধেয়ান ধর। জ্যায়সী ব্যায়ান কি গাই। মুহমেঁ তৃণ চানাটুটে। চেত রখকে বছাই।'

—প্রসবের পর যতই না মুখে খড়কুটো কাটুক গাই, নজর চেতনা কিন্তু বাছুরের ওপরই। আমাদের সংসারের সব কিছু করলেও মনকে আনন্দের আলোয় চান করিয়ে আনন্দময় করে তুলতে হবেই। এ

চেতনা যেন জেগে থাকে সর্বক্ষণ। গুরুদেব চোখ বুজে কি যেন কি ভাবলেন খানিক। তারপর আর এক ঢোক জলে গলা ভিজিয়ে বললেন, ভালো লাগে। যতবার বলি, যতবার ভাবি—ততবার নতুন। এ চিরকালের কথা। এ সবার কথা।

—যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর এক ভক্ত বলছেন, প্রভু, তোমাকে কি দেবার আছে আমার?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কেন—তোমার নিজের মনকেই জিজ্ঞেস কর না।

ভক্ত বললেন, প্রভু, জিজ্ঞেস কি না করেই আপনাকে বলছি।

—ভালো করে জিজ্ঞেস করা হয় নি।

—করেছি। আপনার বিশ্বসংসার ঐশ্বর্য। আপনার কমলার মতন স্ত্রী। ভক্তিশ্রদ্ধা সকলের কাছ থেকে এত পেয়েছেন, এত পাচ্ছেন—তার তুলনা হয় না। কোন জিনিসের অভাব নেই আপনার। আমি কি দেবো! নিজের ভেতরটা চিরে চিরে দেখেছি। দেবার কিছু নেই। কোন বিষয়েই অভাব নেই আপনার।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, একটা বিষয়ে অভাব আছে, তুমি চিন্তা করে ভ্যাখো আবার।

চিন্তার অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে খেতে ক্ষীণ আলোর রেখা একটা দেখতে পেলেন ভক্ত আচমকা। হেসে বললেন, প্রভু, করুণাসিন্ধু, পেয়েছি। আমি পেয়েছি। আপনার একটা বস্তুর বিশেষ অভাব। মনের—মন নেই। গোপীদের কাছে। আমার মন অর্পণ করলুম আপনাকে। আপনি গ্রহণ করুন।

শ্লোকটি গেয়ে উঠলেন গুরুদেব—'দত্তং মনো যদুপতে ত্বমিদং গৃহাণ'। কি সুন্দর। মন অর্পণ করা মানেই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। দুঃখ-শোকের ধাতুতে গড়া প্রবৃত্তি-আমির লয়। আমি কিছু বুঝি না বুঝি, ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে, উপদেশ ব্যাখ্যা—সমস্ত আমারই জন্যে। উনি তো আমার চোখে চোখ রেখে রেখেই বলছেন।

গুরুদেব একটু আনমনা হয়ে আছেন। বেশ ক'টা মুহূর্ত কেটে গেল। এখানে দেহ থাকলেও মনটা যেন কোথায় চলে গেছল।

দেখে মনে হল, হঠাৎ ফিরে এলেন বুঝি আবার। জোরে নিশ্বাস পড়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। একটা মানুষ দৌড়ে এসে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে যেমন বলে, সেই রকম বলছেন গুরুদেব।

—যদুপতি নিজের শুদ্ধ মনই। নিজের সংসারী অতৃপ্ত মনকে এই শুদ্ধমনে মিলিয়ে দিতে হবে। তবেই শুদ্ধমনকে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিতে পাওয়া যাবে নিজের মধ্যে। ধ্যানে সেই জিনিসই আসে। এটাই আত্মসমর্পণে আত্মদর্শন। আমি আমাকে দেখছি, আমি আমার মধ্যে আছি। আমি আমার মধ্যে থেকেও নেই। আমি সকলের ভেতর। সকলের ওপর। আমি সর্বময়। সমস্ত নিরানন্দের উর্ধ্বে, আনন্দময়।

চাদরে কপালের ঘামের মুক্তোদানা মুছলেন গুরুদেব।—মেরুদণ্ডের শেষে—শেষ থেকে একটু তফাতে মূলাধারচক্রে ধ্যান করবি। নিশ্বাসের সঙ্গে গোলাপী আলো ভেতরে প্রবেশ করল। গলা বুক পেট তলপেটের নীচে হয়ে মূলাধারে গিয়ে পৌঁছুল। গোলাপী আলোয় লেখা হয়ে উঠল 'লং'। আলো চারদিক ঘুরে চারটে পাপড়ি এঁকে দিল।

—'লং'য়ের ওপরে গোলাপী শিখা উঠছে। শিখা এসে পৌঁছুল তলপেটের কাছাকাছি স্বাধিষ্ঠানচক্রে। গোলাপী নীলচে বিদ্যুৎ আলোয় মিশে গেল। বিদ্যুৎ আলোয় লেখা হল 'বং'। আঁকা হল ছ'টি পাপড়ি। 'বং' থেকে বিদ্যুৎ আলো ওপরে উঠছে। নাভির কাছ বরাবর এসে মণিপুরচক্রে সূর্যের প্রখর তেজে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সূর্যের আলোয় লেখা হল 'রং'। আঁকা হল পাপড়ি দশটি। 'রং' থেকে ওপরে উঠছে সূর্যের আলো। এলো বাঁ দিকের বুকে। অনাহতচক্রে। এখানে সোনালী আলোয় লিখল 'যং'। আঁকল বারোটি পাপড়ি।

—'যং'য়ের সোনালী শিখা ওপরে উঠতে উঠতে থামল এসে কণ্ঠে—বিশুদ্ধচক্রে। শুভ্রজ্যোতি হয়ে উঠল সোনালী আলো এখানে। লেখা হল 'হং'। আঁকা হল ষোলটি পাপড়ি। 'হং'য়ের সাদা আলো উঠছে ওপরে। দুই ভুরুর মাঝখানে—আজ্ঞাচক্রে এসে

উপস্থিত হয়েছে। সাদা আলো এবার চাঁদের স্নিগ্ধ-জোছনা। জোছনা লিখেছে 'ঠং'। এঁকেছে দু'টি পাপড়ি।

—'ঠং'য়ের জোছনা-আলো আজ্ঞাচক্রের পেছনে মনশ্চক্রে এসে হাজির। জোছনা-আলো লিখেছে 'স্ত্রীং'। এঁকেছে ছ'টি আলোর রঙের পাপড়ি। সাদা লাল গোলাপী নীল হলুদ কালো।

—মনশ্চক্রের প্রতিটি পাপড়িতে মন ঘোরাফেরা করে নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করছে। পৃথিবীর গুণের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে কখনও, কখনও জলতত্ত্বের সঙ্গে। কখনও তেজ, কখনও আবার বায়ুতত্ত্ব আর শব্দতত্ত্বে। এই চক্রে মন একই সময়ে দেখে নিজের রূপ, দেখে অন্যেরও—এটি তেজতত্ত্বের ক্রিয়া। তেজ-আলো শরীরে—শরীরের বাইরেও—সর্বত্র ছড়ানো। এইভাবে ভেতরের জল—জলতত্ত্ব—বাইরের জলে ভেসে বেড়ায়। ভেসে বেড়ায় প্রাণের বাতাসে যেমন তেমনি বাইরের বাতাসেও। বায়ুতত্ত্বের ক্রিয়া এটি।

—পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে তিনটি তত্ত্ব বলা হল। রূপ—তেজ, রস—জল, স্পর্শ—বায়ু। এবার গন্ধ আর শব্দের কথা বলি। গন্ধ—পৃথিবীর গুণে মিশে থাকা। এ গুণের গড়ন দেহ, এ গুণের গড়ন পৃথিবী নিজে। অসংখ্য গুণের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে মন কতবার না উঠছে নামছে, নামছে উঠছে। নিজের ভেতরের শব্দ-কণ্ঠস্বর যেমন শুনে চলেছে মন, তেমনি বাইরের অনেক স্বর অনেক শব্দও তো শোনার অন্ত নেই তার। কেমন করে স্থির থাকতে পারে সে। মন তাই এত চঞ্চল।

—মনস্থির করার জন্যই মূলাধার থেকে পৃথিবীতত্ত্বের 'লং' বীজের ধ্যান করে পর পর চারটি তত্ত্বের বীজ-ধ্যানের মধ্যে দিয়ে মনকে মনশ্চক্র অবধি আনা হয়েছে। এখানে সব তত্ত্বকেই দেখছে সে। স্ত্রীং—নিবৃত্তি বীজের ধ্যানে চঞ্চলতা কমেছে। এবার সমস্ত তত্ত্ব মিলেমিশে মনের চোখে একটা স্বপ্ন তৈরী করছে। মনশ্চক্রের ছ'টি পাপড়ির মধ্যে একটি পাপড়িকে স্বপ্ন বলা হয়েছে। এই স্বপ্ন কিন্তু স্বপ্ন নয়। জগতে যা ঘটছে, ঘটেছে, ঘটবে—তার সত্যি প্রতিফলন।

এক কথায় মনের দিব্যদর্শন।

—মনশ্চক্র থেকে মন স্থির-সংযত হয়ে, নিজেকে পরিশুদ্ধ করে মস্তিষ্কে সহস্রার পদ্মে একটি রামধনু রঙের আলোর রেখা ধরে উঠে এলো। লিখল 'ক্ষং', আঁকল হাজার পাপড়ি। একটি শুভ্রস্নিগ্ধ জ্যোতি-বিন্দু ঘুরছে এখানে। বিন্দু স্থির হয়ে গেল আস্তে আস্তে। এটি আকাশতত্ত্ব। বাইরের, ভেতরের আকাশ একাকার। শুধু ওই একটি মাত্র জ্যোতিবিন্দু থেকে চতুর্দিকে ঠিকরে পড়ছে নানা রঙের আলো। মনের দেহের সঙ্গে যোগ থেকেও এখানে দেহের বাইরে সে। অনুভূতির দুনিয়ায় প্রবৃত্তির তাড়নার নানা জ্বালা-যন্ত্রণা আর অশান্তি থেকে তার মুক্তি। অদ্ভুত নতুন স্বাদের আনন্দে নিজেকে হারিয়ে ফেলে মন কিছুক্ষণ।

—যোগচক্রের এ ধ্যানে শরীর মন সুস্থ হয়ে ওঠে। মনই নিজে মানুষের বিবেক-বন্ধুর ভূমিকা নেয় সদাসর্বদা। কোন অন্যায়ের ছোঁয়া লাগে না এ মনে। কোন অশান্ত বাতাস স্পর্শ করতে পারে না। এ মনের ছোঁয়া যে মনে পৌঁছয়—ইচ্ছের অদৃশ্য সুতো ধরে, সে মনও সে-সময় শুচিশুভ্র কল্যাণ-সুন্দর সদা আনন্দময় হয়ে ওঠে।

হাসলেন গুরুদেব বললেন, অঘোর, যদি আর না দেখা হয়, তাই ভালো করে বুঝিয়ে দিলুম। এই একটা ধ্যানেই তোর জীবনের সব পাওয়া সব চাওয়া পূর্ণ হয়ে যাবে রে। আর কিছু দরকার নেই তোর। এক সাধে সব পায় রে, সব পায়। তোর পাওনা তোকেই দিলুম।

যদি আর না দেখা হয়—গুরুদেবের একথা আমার ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠল। আমার চোখে জল। বাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি, বাবার চোখেও।

গুরুদেব বললেন, দেহে যারা ছিল আগে, কেউ কি চিরস্থায়ী হয়েছে? গুণ হয়েছে, দেহ হয় নি। মিথ্যে অভাব ভেবে, একটা হাহাকারের নিশ্বাসে চোখের জল ডেকে আনা কেন? হ্যাঁ, শোন। যা বলব ভাবছিলুম।—একটা ধ্যানের মধ্যে সাতটা চক্রের ধ্যান যদি এক সঙ্গে না করতে পারিস, এক একটা করে অভ্যেস করলেও চলবে।

—মুলাধারচক্রের ধ্যান ভালোভাবে রপ্ত করে স্বাধিষ্ঠানের করবি। অর্থাৎ তখন মুলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান অবধি। এটা ঠিক অভ্যেসে বসে গেলে, মুলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান থেকে মণিপুর। এই নিয়মে পর পর বাড়িয়ে একেবারে সহস্রার। তখন একই সময়ে একসঙ্গে সব ক'টা চক্রের ধ্যান নিয়ম করে, করে যাবি রোজ।

গুরুদেব চেয়ে আছেন। সেই অমায়িক দৃষ্টি আমার ওপর।

আমার মনের অবস্থা হারানো দিনের হারানো বস্তু ফিরে পাবার মতন। গুরুদেব যা যা বললেন—এ তো আমার কাছে বহু পুরনো। অনেক করেছি। কখন করেছি, কোথায় করেছি, বুঝতে পারছি না। আমার কাছে এ সব খুব সহজ-সহজ লাগছে।

গুরুদেবকে আমার বয়সী দেখছি। বলেই ফেললুম, তুমি আর কি বোঝাচ্ছো? এ সমস্ত আমি খুব ভালো জানি তোমার চেয়ে।

একেবারে চৌকিতে উঠে গুরুদেবের পাশে গিয়ে বসে পড়লুল দুম করে। বাবার হাঁ হাঁ করে ওঠা সারই হয়েছে। বাবার চোখ মেয়ের অন্যায়ে বিব্রত। আমার কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। গুরুদেবের হাঁটু ধরে নাড়া দিয়ে বললুম, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো, যা বলেছি—ঠিক। অমন করে দেখছো কি? বোবা তো নয়, যা জিজ্ঞেস করছি—বল না।

বাবা উঠছিল আমাকে নামিয়ে আনার জন্যে। গুরুদেব হাত নেড়ে মানা করেছেন। মৃদু হেসে বলেছেন, তোর অত কিন্তু হবার কি আছে অঘোর? ওর-আমার ব্যাপারে তোর নাক গলাতে যাওয়া উচিত নয়। এতে না সহ্য করব আমি, না সহ্য করবে এই মেয়ে।

আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, হ্যাঁরে আমার বুড়ো-মা। তুই যা বলছিস—ঠিক ঠিক ঠিক।

বিশ্ববিজয় করে চৌকি থেকে লাফিয়ে পড়লুম আমি। বাবার পাশে এসে আগের আসনে বসে পড়েছি নির্দ্বিধায়।

আমার অদ্ভুত আচরণে বাবা হাবাবোবা হয়ে গেছে।

সচেতন হয়ে উঠেছে গুরুদেবের ডাকে। —অঘোর, আজ ছুটি। অনেকক্ষণ ধরে আটকে রেখেছি।

চৌকির ওপর উঠে দাঁড়ালেন গুরুদেব। নামবেন। আমি দেখছি আর আমার বয়সী নয়। বিরাট পুরুষ। আমার চেয়ে কত যে বড়, মাপজোখ করা যাবে না তার।

বাবার প্রণামের পর আমি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছি, গুরুদেব নিষেধ করলেন। —তুই তো আমার মা রে। ছেলে কখনও মায়ের প্রণাম নেয় নাকি! বরং তুই আমার মাথায় একটু হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে যা।

চৌকি থেকে নেমে এসে নীচের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে এমনভাবে দাঁড়ালেন, যাতে আমি হাত পাই।

বাবা আমায় টানছে। আমার আকর্ষণটা কিন্তু গুরুদেবের মাথার ওপরই বেশী। আমিও যেন কেমন হয়ে গেছি। সত্যি সত্যি মা মনে হয়েছে। গায়ে অত জোর এলো কোত্থেকে কে জানে! বাবার হাত ছিনিয়ে গুরুদেবের মাথায় হাত রেখেছি।

গুরুদেব বসে পড়েছেন মেঝেয়। দু'চোখ বুজে বসে আছেন। আমি মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। পাথর-প্রতিমা যেন।

বাবা মনে মনে জপ করছে যা, মুখেও বলছে তাই—অবুঝ মেয়ের সব অপরাধ ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন।

গুরুদেব চোখ মেলে তাকালেন। খুব ধীরে ধীরে বললেন, কে কাকে ক্ষমা করবে অঘোর? আমা.. খুব ভাগ্য যে, মায়ের হাত মাথায় পড়েছে। তোর খুব ভাগ্য, মাকে ঘরে পেয়েছিস, কাছে পেয়েছিস। বাড়িতে গিয়ে এখানকার কথা একবর্ণও উচ্চারণ করবি না বলে দিচ্ছি। মাকে আমার একদম বকাবকি নয়। কাল সন্ধ্যেয় ব্রহ্মস্তোত্র গান। বৌমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে ...সা চাই-ই অতি অবশ্য।

পরের দিন সকালবেলা।

মাকে চিনলুম আমি নতুন করে। বরাবরই জেনে এসেছি মা উদাসীন। কোন কিছুতে লক্ষ্য নেই। না নিজের ওপর, না পরের ওপর। বাবা আর আমার ওপর তো নয়ই। সে ভুলের ঢাকনা

ধারণার ঝাঁপির মুখ থেকে খুলে ঠিকরে কোথায় পড়ে গেল, হারিয়ে গেল কে জানে! ভেতর থেকে একটা নির্ভুলের আলো বেরিয়ে এসে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। মনে সাড়া দিল—মা একটা জড়পদার্থ নয়। মায়ের সর্বাঙ্গ চেতনায় ভরপুর।

গুরুদেব যেতে বলেছেন শুনে, কি খুশী! বলল, বৌ হয়ে এবাড়িতে আসার পর গুরুজনের অনুমতি ছাড়া কখনও কোনদিন ফটকের বাইরে পা বাড়াই নি। বারান্দায়ও চিকের ফাঁকে মুখ বেরোয় নি—সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যের কোন সময়ের জন্যে। রাত্তিরেও না। মা আজ নেই, তাঁর মত নিয়েই চলে আসছিলুম। এখন কি করি?

বাবা বলল, গুরুদেবের আদেশ। আর তা ছাড়া আমি তো তোমায় মত দিচ্ছি।

—তুমিও আমার গুরুজন। তোমার কথা অমান্য করতে পারি না আমি। তবু তোমারও যে গুরুজন রয়েছে বাড়িতে, তাকে না জানিয়ে, মত না নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। বড়দিকে জিজ্ঞেস করে আসি। বড়দি আমায় ছোট বোনের মতন কি ভালোই না বাসে! তুমি আমার পেটে হলে হবে কি—দিদিরই তো মেয়ে। তুমি ওর প্রাণ। গুরুদেবের কাছে যাবো শুনে, দিদি খুব আনন্দ করবে, দেখবে।

জেঠিমার কাছে এসেছে মা।

রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বামুনঠাকুরকে রান্নার পদ বাতলাচ্ছে জেঠিমা—মুশানা, আজ ভালো করে না রাঁধলে, ওবেলা বিদেয় তোমার। বড়বাবুর লিভার খারাপ জানো, মাছের মুড়োয় অত লঙ্কা বাটা দেয় মানুষে! যত সব যমের অরুচি এসে জুটেছে এখানে। ছোটবাবুদের লিভার ভালো, যত খুশি ঝালমশলা দাওনা ওদের মাছ-তরকারিতে। লোহা খেয়েও হজম করবে ওরা। বাপ-মা-মেয়ের কি রাক্ষুসে খাওয়া! আমাকে ফতুর না করে নিশ্চিন্ত হবে না

মুখ ফেরাতে নাকছাবি ফিরল। পুবের রোদে পল কাটা হীরের ওপর ক্ষুদে সূর্য নামল আকাশ খসে। উঠোনে পানের পিক ফেলে চরণ পাইন স্যাকরার উদ্দেশে বলল জেঠিমা।—দেখছো, আগুনের সঙ্গে, আগুন জ্বলতে বসেছি আমি। সময় পেলেনা আর বরফি-ডিজাইন দেখাতে? ধন্যি তোমরা। মাথায় গোবর পোরা। হুঁশিবুদ্ধি নেই এতটুকু।

রকের নীচে উঠোনে দাঁড়িয়ে জোড়হাত করে প্রণামের ভঙ্গিতে বলল চরণ পাইন, বড়মা দয়াময়ী—সবই তো বোঝেন। দোকান খোলার পর বেরোনো মুশকিল খুব। জেঠিমার ঠোঁটে দয়াময়ীর হাসি। বলল, একটুখানি দাঁড়াও।

রান্নাঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আঃ, ঠাকুর যা হয়েছে আমার, কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করে। শুক্তোয় লঙ্কা ফোড়ন! ছ্যা ছ্যা ছ্যা। কোথায় শিখেছিলে এমন রান্না বাছাধন! বিদেয় হও, বিদেয় হও বলছি বাড়ি থেকে।

ওপরে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠল জেঠিমা।—সলমা, সলমা।

ধপাস করে বসে পড়ল রকে! সলমা তালপাতার পাখা নিয়ে এসে হাজির। জেঠিমা চেঁচিয়ে বলল, মরণদশা! জেলেপাড়ার সং যেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছিস কি? বলি একটু হাওয়া করবি তো।

মা এসে গেছে। সলমার হাত থেকে পাখা নিয়ে নিজেই হাওয়া করছে। জেঠিমা দপ করে জ্বলে উঠল মাকে দেখে।—তোমাকে আর লোক দেখানো দরদ দেখাতে হবে না ছোটবৌ।

নিজের বুকে ঘুষি মেরে জেঠিমা কেঁদে উঠল।—এত লোকের মৃত্যু হচ্ছে, আমার হয় না কেন? পাঁচ শত্তুরে মিলে আমায় খেতে বসেছে। আর হাওয়ার দরকার নেই, খুব হয়েছে। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে দিনরাত বেড়াচ্ছেন সব মজা করে! যত জ্বালা আমার। তৈরী ভাত খেয়ে খেয়ে পেয়ে বসেছে আমায়। অন্য লোক হলে, ভাতের বদলে পাতে ছাই বেড়ে দিত।

সলমাকে জল আনতে বলল জেঠিমা, শীগগির আন রে। বুকের মধ্যে বড্ড আনচান করছে।

জেঠিমা শুয়ে পড়ল মেঝেয়। মায়ের মুখ শুকিয়ে গেছে। নিজের কোলে মাথা তুলে নিয়ে বুকে হাত বুলোচ্ছে।

জলে গলা ভিজিয়ে জড়ানো গলায় বলল জেঠিমা, ছোটবৌ রে, আর বুঝি বাঁচবো না আমি বেশী দিন। মায়ের রোগ ধরেছে আমায়। সেই বুক ধড়ফড়। কি যে কষ্ট ছোটবৌ! তুমি কিচ্ছু ভেবনা, তোমার সব গেছে বটে, আমার তো আছে। তুষির বিয়েতে গা সাজিয়ে দেবো আমি। আমার গায়ের যত গয়না আছে, সব ছোটবৌ, সব।

মায়ের চোখে জল ঝরছে। হাতের উল্টোপিঠে মুছে বলল, দিদি, তুমি ভেবনা অত। নিজের শরীরের ওপর লক্ষ্য রাখ একটু। তোমাকে দেখলে, মনে হয়—মা যান নি, রয়েছেন।

—না ছোটবৌ। আমি শুনছি, মা আমায় ডাকছেন। দেখো, বেশীদিন রাখবেন না।

জেঠিমাকে একটু পরে ঘরে নিয়ে আসা হল। মায়ের সেবায় জেঠিমার হাসি ফুটেছে। গুরুদেবকে দর্শন করতে যাবে শুনে, হাসি মিলিয়েছে। বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

বলেছে, লোকে যা বলে—সত্যিই তাই। এক গাছের ছাল কি লাগে একগাছে? না, লাগে না। এখানে আমার আপনজন কেউ নেই দেখার। ছোট বোনটা না হয় দিন কতক এসে থাকুক। মরণের সময় তবু মুখে জল দেবে।

তীব্রতীক্ষ্ণ কণ্ঠেই বলল মাকে, তা যাবে যখন মনস্থির করে ফেলেছো, তখন এ দাসীবাঁদীকে শুনিয়ে আর লাভ কি! সকলে স্বর্গের রাস্তা পরিষ্কার করছে। কে জানে স্বর্গটর্গ আছে, না ভান। আমি ভূতের বেগার খেটে মরছি দিনরাত। অদৃষ্টে ধিক্ আমার! মুখের দিকে চেয়ে ভালোমানুষ সেজে আর বসে থেকে লাভ কি ছোটবৌ? আমাকে শ্রীখণ্ডী খাড়া করে যার যা ইচ্ছে মিটিয়ে নাও। কোন ভয় নেই। সকলকে বলবো'খন, ছোটবৌকে আমিই যেতে বলেছি।

মায়ের কথায় বিনয়।—তুমিও চলনা দিদি।

—থাক, খুব হয়েছে! একটা বিবেচনা বলেও কি বস্তু নেই তোমার! কেমন করে বললে! একটু আগে ধড়ফড়িয়ে মরে যাচ্ছিলুম। ওঠো দিকিনি। আমার বুকের যন্ত্রণা আর বাড়িয়ো না বসে বসে শেল বেঁধানো কথা বলে।

জেঠিমাকে নিয়ে সকালের নাটক সকালের দৃশ্যের যবনিকা পাত হয়ে গেছে মায়ের মন থেকে তখুনি। কোন কথার কালো মেঘ মায়ের মনের কোণে জমেনি এতটুকু। একেবারে নির্মেঘ নীলাকাশ। সারাটা দিন মা বেশ আনন্দেই ছিল। সন্ধ্যের মুখে বাবা আমি মা বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি মনোরমা-মাসিদের বাড়িতে যাব বলে—গুরুদেবের দর্শনের জন্যে। পরপর তিনটে হাঁচির আওয়াজ শুনলুম! ওপরে তাকাতেই দেখি, বারান্দায় বুক ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেঠিমা। দৃষ্টি আমাদের তিনজনের ওপর। আঙুলে জড়ানো পাকানো শাড়ির খুঁটটা নাকের ভেতর। বাবা-মায়ের হাঁচি-টিকটিকির বাধার কোন বালাই-ই নেই। মা আমার ডান হাতখানা জোর করে টেনে ধরে বেরিয়ে গেল।

এসেছি মনোরমা-মাসির বাড়ির দরজায়।

গেটের সামনে ভরতি লোক মনোরমা-মাসি সুন্দর সাজে সেজেছে। গেরুয়া সিল্কের জরিপাড় শাড়ি পরনে। জামারও ওই রঙ। হার চুড়ি নাকছাবি কানের টপ সব মুক্তোর। এমনিতেই সুশান্তদা ফুটফুটে সুন্দর। শান্তিপুরী ধুতি পরেছে। সিল্কের পাঞ্জাবি। মেসোমশাইয়েরও ওই একই সাজ। সদরে দাঁড়িয়ে তিনজনে সবাইকে অভ্যর্থনা করছে। ছোটদের অভ্যর্থনার ভার সুশান্তদার, পুরুষমানুষদের মেসোমশাই আর মেয়েদের ভার মাসিমার ওপর। এদের সাজগোজের পাশে মা বাবা আর আমি একদম বেমানান। মায়ের খুব সাদাসাপ্টা। সরু চুড়ি একগাছা করে হাতে, আর গলায় একটা সরু হার। একখানা দিশী লাল দাঁতপাড় শাড়ি।

বাবার আদ্দির পাঞ্জাবি আর কাঁচী ধুতি।

আমাকেও শাড়ি পরিয়ে দিয়েছে মা, নীল রঙের। আমার হাতে গলায় নাকে কানে কোন গয়নাই নেই।

মা যে এমন সুন্দর কথা বলতে পারে, তা এই প্রথম শুনলুম। সুশান্তদার চিবুক ধরে আদর করে চুমু খেয়ে মা বলল, কাপড় পরে কত বড়ই না হয়েছ, একেবারে বাবু হয়ে গেছ! সুশান্তদাকে চুমু খেতে দেখে নিজের মুখও আমি বাড়িয়ে দিয়েছি আদর খাবার জন্যে। কখনও তো পাইনি। সাধ মিটেছে আমার। মা আমায় ফিরিয়ে দেয় নি।

মনোরমা-মাসির সঙ্গে আমরা হলঘরে এসে বসলুম।

বাইরের লোকে ভেতরের লোকে হলঘর ভরতি হয়ে উঠেছে। গুরুদেবের চৌকিতে সেই গেরুয়া চাদর পাতা। পরনে গেরুয়া বসন। তাঁর সাজের কোন পরিবর্তন দেখলুম না। ঘরের চারকোণে ধুনুচির ধোঁয়া হাওয়ায় আল্পনা এঁকে চলেছে। ঘরের ঝাড়লণ্ঠনের আলো ছাড়াও গুরুদেবের চৌকির দু'পাশে চকচকে পিলসুজের ওপর ঝকঝকে প্রদীপ বসানো। চৌকির দু'পাশে আসন পেতে বসে তানপুরার তারে আঙুল ছোঁয়াচ্ছে দু'জন। ওদের দু'পাশে বসে আরও দু'জন পাখোয়াজে বোল তুলছে। ঘরখানা কোন পুণ্যতীর্থের দেবমন্দির হয়ে উঠেছে। দরাজ-গম্ভীর গলায় দু'চোখ বুজে গুরুদেব স্তোত্রগান গেয়ে চলেছেন, অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি স্থূল দেহ বিবর্জিতম্...অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি জ্যোতির্জরামরণবর্জিতম্...।

স্তোত্রগান বুঝি না বুঝি ভালো লাগছে। দু'চোখ বুজে আসছে। ভেতরটা আমার আনন্দে ভরে উঠছে। আমার মতো অবস্থা সবারই বোধহয়। গানের কথা আর সুর ছাড়া কারো জোরে নিশ্বাসের আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

স্তোত্রগান শেষ হয়ে যেতেও সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে। গানের রেশ আমাদের মনে-প্রাণে বেজে চলেছে। কিছুক্ষণ পর গুরুদেব গানের ব্যাখ্যা শুরু করলেন—জরা মরণের ঊর্ধ্বে জ্যোতি-

স্বরূপ ব্রহ্ম আমি। এই চিন্তায় মানুষ ব্রহ্মময় হয়ে ওঠে। পৃথিবীর কোন তাপই তাকে দগ্ধ করতে পারে না কখনও…। সংসারে থেকেও তোমরা সবাই এই মনোভাব যদি আনো তাহলে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে ভুলকালামের সৃষ্টি হয় না, অশান্তির সৃষ্টি হয় না। নিজেদের তৈরী করা অভাবে কষ্ট পেতে হয় না।

আরম্ভ হল গুরুপ্রণাম। এক এক করে গুরুদেবকে প্রণাম করছে এক একজন। ওঁর আশীর্বাদ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, আসছে অন্যজন। প্রণামের সময় এলো আমাদের। মাকে প্রণাম করতে দিলেন, দিলেন বাবাকে। কেবল আগের দিনের মতন বাধা দিলেন আমায়। আমার নিজের হাতটা টেনে বুলিয়ে নিলেন নিজের মাথায়। আমার পিঠের পেছনের শিরদাঁড়া বেয়ে কি যেন নেমে গেল সরসর করে।

মনোরমা মাসি ইশারায় আমাদের চলে যেতে বারণ করল। ঘরের সবাই চলে গেলে গুরুদেবের সঙ্গে কি যেন কথাবার্তা হল। সকলকে পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা তিনজন ঘরের এককোণে দাঁড়ালুম। মা বাবা আমি।

এখন আমরা তিনজন আর মনোরমা মাসি মেসোমশাই সুশান্তদা —ওরা তিনজন, মোট ছ'জন রয়েছি এ-ঘরে। এমন কি বাজিয়েরাও কেউ নেই। গুরুদেবের কাছে চৌকির সামনে বসলুম আমরা। মনোরমা মাসির কানে কানে খুব আস্তে কি যেন বলল মা। মাসি ঘাড় নেড়ে জানাল গুরুদেবকে বলতে।

জোড়হাত করে গুরুদেবের দিকে চেয়ে মা বলল, মার্জনা করবেন বাবা। আমার বড় জায়ের শরীর ভীষণ খারাপ। আপনি আশীর্বাদ করুন, সুস্থ হয়ে ওঠে যেন।

হেসে উঠলেন গুরুদেব। বললেন, বেটি, আপনভোলা হয়েই তুই চিরদিন যেন এমনি থাকিস। ওদের নিয়ে মাথা ঘামাবিনি কোন দিন। ওদের ছলচাতুরী আর অভিনয়ের ফাঁদে যেন পড়িস নি কখনও। তুই অঘোর তুষি—তোরা ওদের দুনিয়ার নয়। ওরা যা

চেয়েছে তাই পেয়েছে।

মা কি বলতে যাচ্ছিল, মনোরমা মাসি বাধা দিয়ে বলল, তোমার জায়ের কথা ছাড়। নিজের কথা একটু জেনে নাও। মা মুখ খুলল না আর, বসে রইল চুপচাপ।

মনোরমা মাসি গুরুদেবের চৌকিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়ে বলল, বাবা শত হলেও আমরা সংসারী তো! আমাদের জ্বালা আপনাদের পোয়াতেই হবে। আশীর্বাদ করুন, যেন ইচ্ছে পূর্ণ হয়। আপনি অন্তর্যামী, বুঝতেই তো পারছেন আমি কি প্রার্থনা চাইছি।

গুরুদেব একবার সুশান্তদার দিকে তাকালেন একবার আমার দিকে। আবার সুশান্তদার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হয়ে গেলেন তিনি। কোথায় গেল মুখের জ্যোতি! আমার মনে হল, সমস্ত আলো নিভে গিয়ে ঘন অন্ধকার নেমে এলো ঘরের মধ্যে।

সেই অন্ধকারে শুনছি আমি গুরুদেবের অমৃতবাণী। মনোরমা মাসির প্রার্থনার আশীর্বাদ নয়, প্রশ্নের উত্তরও নয়। গুরুদেব বলছেন, সকলের বক্তব্য শুনবে ধৈর্য দিয়ে, মন দিয়ে। সকলের ওপর সহানুভূতি দেখাবে। সাধ্য অনুযায়ী সেবা করতে পেছপা হবে না। আত্মপ্রচার করবে না কখনও। সদাসর্বদা আনন্দময় হয়ে থাকবে। তোমাদের কাছে কেউ এলে সে যেন সেই আনন্দের স্পর্শ পায়। তোমাদের কথাবার্তায় আচারে-ব্যবহারে যেন বুকভরা শান্তি নিয়ে বাড়ি ফেরে।

মনোরমা মাসি বলল, বাবা, আমার প্রার্থনার তো কোন উত্তর দিলেন না।

এবারেও গুরুদেব নিরুত্তর। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তারপর চৌকি থেকে উঠে গেলেন।

আমার ডানপাশে মনোরমা মাসি বসে। আমাকে বুকে টেনে নিল। একটা গরম নিশ্বাস জোরে ঝরে পড়ল আমার মাথায়। সিঁথির এলোমেলো চুল কেঁপে উঠে ছড়িয়ে পড়ল কপালে।
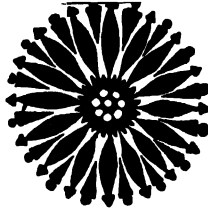
দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যে একটা বছর কেটে গেছে জলের মতন তা ভাবাও যায়না। বাড়িতে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড! শ্রাদ্ধবাড়ি কি বিয়েবাড়ি বোঝবার উপায় নেই। নহবতের বাজনার ওপর ঠাকুরমার খুব মোহ ছিল। যখন কাশীতে গেছল, তখন গঙ্গার ধারে ভোরের হাওয়ার সঙ্গে নহবতের বাজনার স্মৃতি ভুলতে পারেনি। কোন বিয়েবাড়িতে নহবতের বাজনা শুনলে ঠাকুরমা স্থান কাল পাত্র ভুলে নহবত খানার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ত। তন্ময় হয়ে শুনত।

শ্রাদ্ধের সময় শ্রাদ্ধবাসরে তাই নহবতের আসর বসিয়ে চতুর্দিকে জাহির করছে জেঠিমা। আজ মা নেই, কিন্তু তাঁর আত্মা তো আছে! স্বর্গ থেকে শুনুক। আশীর্বাদ করুক এই অভাগিনীকে। মায়ের আত্মার শান্তির জন্যে তাঁর বড়বৌ—আদরের বৌ যে কিছু করতে পারছে, এটা তাঁরই আশীর্বাদ। শ্রাদ্ধের বেদীর কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষোৎসর্গের সময়—হাপুস-নয়নে কেঁদে সারা হয়েছে। জেঠিমাকে ধন্যি ধন্যি করেছে জ্ঞাতিগুষ্টিরা—লোকের পেটের মেয়েও এমন করেনা, যা করল বড়বৌ।

বাৎসরিকীতেও সেই শ্রাদ্ধের আয়োজন সেই নহবতের আসর।

শ্রাদ্ধবাড়ি নয়তো, যেন গমগমে বিয়েবাড়ি।

রতনবাই এসেছে, জেঠিমাই আনিয়েছে। ঠাকুরমা নাকি রতন-বাইয়ের গান শুনতে ভালোবাসত। এ-বাড়ির বিয়ে-থাতে অনেকবার এসেছে।

ফুলতোলা ফিতের পাড় বসানো রেশমী শাড়ি রতনবাইকে মানিয়েছে ভালো। এবাড়িতে এলে আমার কাছে ছুটে আসে। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে। একদিন তো বলেই বসেছিল, কান দুটো ন্যাড়ান্যাড়া ঠেকছে কেন, বিঁধটা যে বুজে যাবে। নিজের

কান থেকে হীরের টপ খুলে আমার কানে পরাতে যাচ্ছে, ওপাশের বারান্দা থেকে এপাশের বারান্দায় ঝাঁপিয়ে পড়ল জেঠিমার শ্যেনদৃষ্টি। জেঠিমা হাঁ-হাঁ করতে করতে ছুটে এলো। রতনবাইয়ের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল টপদুটো। বলল, ওদের কি জিনিসপত্র রাখার অভ্যেস আছে। আমার কাছে দাও, আমি ঠিক সময় মতো সাজিয়েগুজিয়ে দেব। মা টা তো মানুষ নয় জানো।

আমার বড় কষ্ট হয়েছে। আমি যে হীরে কত ভালোবাসি, জেঠিমা তা বুঝল না! রতনবাই চলে যেতে দেখেছি, জাঠতুতো বোন মমতাদির কানের লতিতে সেই হীরের টপ।

মায়ের কাছে এসে কেঁদে কেঁদে বলেছি সব। আমার লতিতে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। বলেছে, দিদি তো বড়, দিদিই আগে পরবে। তারপর তুমি পরবে। তোমার জেঠিমা তোমায় খুব ভালোবাসে। কাঁদতে কাঁদতেই মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছি।

রতনবাই, সেই রতনবাই আজ এসেছে। আমার দিকে হাসি মুখে এগিয়ে আসছে। জেঠিমা এসে টেনে নিয়ে গেল। বুকের ভেতর থেকে সিল্কের ব্যাগ বার করে একটা মোহর দিল রতনবাই ঠাকুরমার শ্রাদ্ধের জন্যে। বুকে জড়িয়ে ধরে রতনবাইকে জেঠিমার সে কি আদর! তুমি আমার বোন! রোজ না খেয়ে গেলেও আজ একটা কাঁচাগোল্লা না খাইয়ে ছাড়ছিনে, আমার মাথার দিব্যি।

রতনবাই হেসে বলেছে, মিষ্টি আবার কেন দিদি, আপনার এই মিষ্টি মুখই তো আমার প্রাণ মন হৃদয় ভরিয়ে দিচ্ছে।

জেঠিমা অভিমানী সুরে বলল, সে হবেনা ভাই। আমার মরামুখ দেখবে যদি না খাও।

রতনবাই জিভ কেটে বলল, ছি ছি দিদি! এক্ষুণি দিন, আমি খাচ্ছি। এত ভালোবাসা কোথায় পাব! দু'চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠেছে রতনবাইয়ের।

মিষ্টিমুখ করিয়ে শ্রাদ্ধবাসরে এনে রতনবাইকে দিয়ে গান গাইয়েছে জেঠিমা। প্রথমে গাইতে বলেছে জেঠিমার প্রিয় গান—

আই সখি, দুলাহা কে রূপ দেখি ···। রতনবাই রাজী হয় নি।—এ আসরে এ গান নয় দিদি। আমাকে ক্ষমা করবেন। রতনবাই গেয়েছে, জীওন নৈয়া ডুবতি শ্যাম/মুঁহে কোন্ লাগাওয়ে পার !···

গান আমায় পাগল করে তোলে। আমার রক্তমজ্জায় সুরের উজান বইয়ে দেয়। গুনগুন গেয়ে ওঠে আমার ভেতর। হয়তো বা নিশ্বাসও। তা নাহলে আমার মনের গান আত্মতন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে বাইরের কান কেমন করে শুনতে পায় আমার নিজের গলা।

যে কোন গান শুনি আমি, মনে বসে যায় এমনভাবে, তখুনি গলা ছেড়ে প্রাণখুলে গেয়ে ফেলি। এখনও তাই করে বসলুম। অর্থাৎ রতনবাইয়ের গান হুবহু অনুকরণ যাকে বলে—আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো। রতনবাইয়ের তখন বিদায়ের পালা। পানের ডিবে থেকে খিলি তুলে রতনবাইয়ের মুখে পুরে দিচ্ছে জেঠিমা। মুখ ফেরাল রতনবাই আমার দিকে। একদৃষ্টে দেখছে। দু'চোখে ভরভরতি হাসি।

—গানের বেলায় আমার কোন লজ্জাসরম নেই। কে শুনছে কে না শুনছে, কে মুগ্ধ হচ্ছে কে ভেংচি কাটছে। কোনদিকেই লক্ষ্য থাকে না। শ্রাদ্ধবাসরের লোক উৎকর্ণ হয়ে শুনছে, আমি সচেতন হয়ে উঠলুম রতনবাইয়েব স্পর্শে। আমার চিবুক ধরে বলল, গলাটা ভারী সুন্দর—কিন্নরীকণ্ঠ যাকে বলে! আমরা সেধে সেধেও এ-রকম গলা করতে পারিনি। ভগবান তোমায় ঢেলে দিয়েছেন। শিখতে চাও, তাহলে তোমায় আমি রোজ রোজ এসে শিখিয়ে যেতে পারি।

এখানে জেঠিমা কিন্তু এসে পড়েনি। কোন বাধাও দেয় নি। কারণ বুঝতে পেরেছি তখুনি। দু'জন ভদ্রলোককে আদর-আপ্যায়ন করতে শশব্যস্ত। তাঁদের শরীরের ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করতেও। তাঁরা কিন্তু আমার দিকেই চেয়ে আছেন। জেঠিমা অন্য ধারে নিয়ে যাবার জন্যে কি সব বলছে, আমি বেশ বুঝতে পারছি। তাঁরা ঘাড় নাড়ছে, এদিকে এগিয়ে আসছে। অগত্যা জেঠিমাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়েও আসতে হচ্ছে।

ওঁরা দু'জনে এসে আমার কাছে দাঁড়ালেন, সঙ্গে জেঠিমা। গোলগাল মোটাসোটা ভদ্রলোকটি উঁচু দাঁত বার করে হেসে বললেন, আহা! যেন প্রতিমা!

জেঠিমার দিকে ফিরে বললেন, আপনার দাদা তো এই মেয়েটিরই কথা বলেছেন, এটি তো আপনারই মেয়ে। হ্যাঁ, বলেছিলেন যা, নিজের ভাগ্নী বলে একটু কমিয়েই বলেছিলেন। আমাদের পছন্দ কথা দিয়ে যাচ্ছি।

জেঠিমা হ্যাঁ-না কোন উত্তর দিল না। মুখখানা কালো হয়ে উঠল। একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে বলল, আসুন, একটু জলযোগ করে যান দয়া করে।

আমার কানের পাশ দিয়ে একজন বিদ্রূপ করতে করতে চলে গেল—কোন্ সময়ে কোন্ রাগরাগিণী বাজাতে হয়, তাও জানে না। ভৈরবী হলে তবু ক্ষমাঘেন্না ছিল। বাতাসে সকালের মেজাজটা এখনও রয়েছে। তা নয়, সূর্য-অস্তের সুর বাজিয়ে চলল নহবত—পূরবী।

জেঠিমা এর পর থেকে আমাকে আরো বিষনজরে দেখতে লাগল। পরে শুনেছি, সেই বিয়ে আমার ভেঙেছে। ভেঙেছে জেঠিমার রঙের বর্ণনা দেওয়ার জন্যে—সাদা ধবধবে রঙটা আমার শ্বেতী রোগ। মমতাদিকে দেখানের জন্যেই জেঠিমা ওদের নেমন্তন্ন করেছিল। এক ঢিলে দুইপাখি মারা যাকে বলে। ঠাকুরমার শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন আর বিয়ের দেখাদেখি।

মমতাদির জন্যে অনেক অনুনয় করেছে জেঠিমা। কিন্তু তাঁরা মমতাদিকে আমাদের বাড়িতে দেখতে এসেও পছন্দ করেননি। আমাকেও সে সময় ওঁদের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রেখেছে জেঠিমা নিজের ঘরের ভেতরে, চোখের কড়া শাসনে। বলেছে, মমতাকে দেখতে কোন লোক এলে খবরদার ঘর থেকে বেরোবে না। ধিঙ্গী মেয়ে, পাকা পাকা কথায় নয়ে তো যোলো হয়ে দাঁড়িয়েছ। দিদির সর্বনাশ আর নাইবা করলে ঘর থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে। রূপের তো ওই ছিরি!

বারান্দায় দাঁড়ালে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব। মা-টাও শিক্ষা দেয় না!

মা বলেছে, একটু গুরুদেবের ছবির দিকে চেয়ে থাক। আমি তাই করেছি।

সব জিনিস সওয়া যায়না। সহ্যেরও একটা সীমা আছে। একবার দুবার হয়। তা নয়, বারবার এই শাসন হেনস্থা। বারবার মা-বাবাকে নিয়ে টানাটানি। আমি সহ্য করতে পারিনি। আমার জিদ আমার দুষ্টুবুদ্ধি দারুণ উত্তেজনা এনেছে আমার ভেতর। জেঠিমার ওপর আমি বিদ্রোহী হয়ে উঠলুম। রাহু কি মঙ্গল কি শনি, কোন্ গ্রহ মাথায় চেপেছিল জানি না। আমার সদাসর্বদা সংবাদ নেবার স্পৃহা আমাকে গোটা বাড়িটায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত।

চেষ্টা করলে যে যা চায়, সে পায়ও বোধহয়। আমার বেলায় তো তাই হয়েছে। জানি না আমার ওপর জেঠিমার দুর্ব্যবহারের জন্যে, না সলমাকে মাঝে মাঝে অকারণ গালমন্দ করার জন্যে সলমা বিরূপ হয়ে উঠেছিল খুব। জেঠিমার সামনে দেঁতো হাসি হাসলেও, মনে মনে জেঠিমাকে জ্বালাতেই চেষ্টা করেছে।

আমাকে ডেকে কত কথাই না বলেছে। তোমার এমন রূপ, ওই রূপ দেখে নাকি মমতাকে কেউ পছন্দ করছে না। তোমার ওপর কি হিংসে! এমন ব্যাপার জন্মে দেখিনি বাপু! কোন্‌দিন কে মমতাকে দেখতে আসছে, সলমাই আমাকে কানে কানে ফিস ফিস করে বলে গেছে। আমার মাথার দুষ্টু ভূতটা উন্মত্ত উল্লাসে নেচে উঠেছে। লোকে বলে, নীল শাড়ি পরলে আমি অপরূপা হয়ে উঠি। নীল আকাশের কোলে জ্যোৎস্নায় গড়া মেয়ের মতো। দেখলে, চোখ ফেরানো যায় না, মন ফেরানো যায় না।

বিকেলে মমতাদিকে দেখতে আসবে। সকাল থেকে আমার কি প্রস্তুতি পর্ব। একবার নীল শাড়ি একবার চাঁপা শাড়ি মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছি, পরিয়ে দাও। দেখি কোন্‌টা আমায় ভালো মানায়। দু'হাতে চাঁপা আর নীল শাড়ি নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেছি গোলাপী লাল সবুজ নিয়ে এসেও মিলিয়েছি। এসব ঠাকুরমার

দেওয়া। এক এক সময় এমন হয়েছে—কোন্‌টা রাখি, কোন্‌টা পরি! শেষ অবধি নীলই আমাকে টেনেছে। পরিয়ে দিয়েছে মা পরিপাটি করে।

মাঝে মাঝে শাড়ি পরা আর সাজগোজের খেয়াল কেন পেয়ে বসে আমায়—মা কিছু জানে না। আমিও আমার মনের কথা বলিনি। মা জানে, খেয়ালী মেয়ের এও একটা মনের খেয়াল।

এমন দেবীর মতো মায়ের পেটে কি করে এমন দস্যি দুষ্টুমেয়ে জন্মেছিল, এখন ভাবতেও নিজেরই লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে। আমি যেখান দিয়ে বাইরের লোকজন ওঠে, সেই বড় সিঁড়ির চত্বরে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাকে ভয় জেঠিমার। ঘর থেকে বেরিয়ে বলেছে, যা ভেবেছি তাই। এখানে কেন? আমি পশ্চিমের সিঁড়ি দিয়ে একতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছি। যারা আসছে, তারা দেখুক আমায়। কেমন করে আটকাবে জেঠিমা!

পাত্রপক্ষের লোকেরা এসেছে। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পরে নিজেদের মধ্যে নীচুগলায় কি বলাবলি করেছে। তারপর ওপরে উঠে মমতাদিকে দেখে মুখ ভার করে বেরিয়ে গেছে। আমি আনন্দে গেয়ে উঠেছি—'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না/সেই জানারি সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা ··'। একেবারে সপ্তম সুরে, একতলা দোতলা তিনতলা—উদারা মুদারা তারা।

ঘর মোছার নোংরা জল বালতি ভরতি করে জেঠিমা তো একদিন রেগেমেগে ওপর থেকে ছুঁড়ে দিল। আমি পালিয়ে বেঁচেছি। আমার শাড়ি ভেজেনি, মাথায় পড়েনি। গর্জনের পরেই বর্ষণ হয়, কিন্তু জেঠিমা তো অন্যজগতের। বর্ষণের পরই গর্জন শুরু হয়ে গেছে—সুভাষিণীর পেছনে লাগা! এর প্রতিশোধ কেমন করে নিতে হয় সুভাষিণী জানে। এ বাড়ির বড়বৌ বলে আর শাশুড়ীর দায়িত্ব ঘাড়ে আছে বলে বড়বৌ সব সহ্য করে যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের থেকে এ-বাড়ির বড়বৌ-এর সহ্যশক্তি বেশী। শ্রীকৃষ্ণও শিশুপাল বধ করে-ছিলেন। শয়তানীকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করব। তবে

আমার নাম সুভাষিণী-বৌদি। নিশ্চয় এর পেছনে মিচকে মরা বাবা আর ডাইনী মা'র হাত আছে! নইলে এইটুকু মেয়ের এত বুদ্ধি হবে কি করে! ঠিক সময় এসে নাচবে-গাইবে! আমার বাড়িতে এ-রকম ঢলানিপনা সহ্য করব না। মানকুল সব যেতে বসল।

জেঠিমা যাই বলুক, যাই করুক, আমি কিন্তু আনন্দে ডগমগ। বিছানায় গিয়ে উবুড় হয়ে পড়ে হেসে কুটিকুটি হয়েছি।

জেঠিমার বুদ্ধির তারিফ আমাকে করতেই হবে। আমার আনন্দ, আমার হাসি সাজগোজ সমস্ত বন্ধ হয়ে গেল।

দিনকতক ধরে জেঠিমা অন্য মানুষ হয়ে গেছে। বকাবকি ছেড়েছে। আমাকে কি আদর! মমতাদিকে জল খাওয়াবার আগে মোহনভোগের ডেলা, দুধের গেলাস মুখের গোড়ায় ধরেছে। আমি ভাবলুম, জেঠিমার আগের সেই ভালোবাসাই আবার ফিরে এসেছে আমার ওপর। ভুল ভুল, সব ভুল।

জষ্ঠি মাসের পয়লা কি দোসরা হবে। সেটা মঙ্গলবার। জেঠিমা একখানা চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ি পরে আমাদের ঘরে হাজির। গোলাপী আকাশে তখন সূর্যের নরম-মধুর জেল্লা ছড়িয়ে পড়ছে। আমি ঘুম থেকে উঠেছি সবে। জেঠিমার কপালে লাল টকটকে সিঁদুরের আধলা একটা। বলল, জয়-মঙ্গলবার আজ, পুজো দিতে যাব। চ তুষি, তোকেও নিয়ে যাব।

ফিটনে চেপে জেঠিমার সঙ্গে গেছি আমি জয়মঙ্গল-চণ্ডীর পুজো দিতে। কতদিন এরকম কাছে পাইনি। আবেগ-আবেশ চাপতে না পেরে জেঠিমার কপালের সিঁদুর টিপ থেকে সিঁদুর নিয়ে নিজের কপালে পরেছি। একটুও বকেনি জেঠিমা। শান্ত-সুন্দর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছে।

যেখানে এসে গাড়ি থামল, কি সরু গলি! একটার বেশি দুটো মানুষ পাশাপাশি যেতে পারে না। দু'পাশে টিনের চাল আর খোলার চালের বাড়ি। ছিটেবেড়া আর মাটির দেয়াল।

জেঠিমা আমাকে হাত ধরে উপদেশ দিতে দিতে নিয়ে চলল।

—দেখিস, এপাশে কাঁচ, ওপাশে ইঁট, ওদিকে নোংরা। আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে মাঝে মাঝে জড়িয়ে ধরছি। মায়ের কথা মনে পড়ছে·· জেঠিমা তোকে খু-উ-ব ভালোবাসে।

আমি বললুম, জেঠিমা, তুমি আমায় খু-উ-ব ভালোবাস, তাই না! উত্তর দিল না, হাসল শুধু। এ-গলি ও-গলি সে-গলি হয়ে যে বাড়িতে প্রবেশ করলুম আমরা, দরমার দরজা! ঢুকে ভেতরে এসে দেখলুম কিছুই প্রায় দেখা যায় না। কি দুর্গন্ধ! অনেক নজরটজর করে দেখলুম, বসে রয়েছে এক বুড়ি। গাল ঝুলেছে, চোখ ঝুলেছে।

জেঠিমা বুড়ির কানের কাছে মুখ এনে বলল, সিদ্ধামা, এই মেয়েটির কথাই তোমায় বলেছিলুম। বুড়ি চোখ তুলে দেখল আমায়। মেলা চোখের কি চাউনি! বুকের মধ্যে যেন ছুঁচ বিঁধল আমার। দাঁত বের করা মড়ার মাথা আমার সামনে ধরে নিজের দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, দেখছিস মড়া কি রকম কথা বলে! কি ভয় কি ত্রাস আমার! ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললুম। সঙ্গে সঙ্গে শুনেছি ঘর কাঁপানো অট্টহাসি। মেয়ের গলায় পুরুষের কণ্ঠস্বর। আমার আশেপাশে কেউ নেই। বুকের যন্ত্রণা বেড়েছে। আমি জেঠিমাকে জড়িয়ে ধরেছি প্রাণপণে।

বাড়ি ফিরে এসে ভীষণ জ্বর।

মড়ার মুখ আমি দেখতে চাইনি, দাঁতের কড় কড় শুনতে চাইনি। নিয়ে যাও। সিদ্ধামাকে আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। চীৎকার করে বলেছি প্রলাপের ঘোরে।

জেঠিমা এসে আমায় বলেছে, এমন হাস্কারাশের মেয়ে তো দেখিনি। ঠাকুর-দেবতা দেখাতে গিয়ে একি জ্বালা আমার! এ কি অপযশ! কোথায় মড়ার মাথা দেখল, কোথায় দাঁত কড় কড় করল! এ রকম ফুলটুসি মেয়ে জানলে কে নিয়ে যেত বাপু! ভালো ঝকমারি করেছি। বিনা দোষে কলঙ্ক! এ-মেয়ে হাতে আমার হাতকড়ি পরাবে বাড়িতে বেশিদিন থাকলে। মা কালী সিদ্ধামার দয়ায় ভালো হয়ে উঠলে বাঁচি। নাকে-কানে খত। পরের মেয়েকে নিয়ে আর কোথাও নয়।

মা বলেছে, তোমার কি দোষ বড়দি! তুমি অত চিন্তা কোরো না! তোমার আবার বুকের অসুখ! জ্বরজ্বালা হলে বিকারের ঘোরে মানুষ অনেক কিছু ভুল-ভাল বকে। জেঠিমা ধরা গলায় বলেছে, তুমি বুঝলে বলে ভাই! নাহলে আমার কি অবস্থা বলত আজ!

জেঠিমার সিদ্ধামায়ের কাছে কালীমার কাছে, প্রার্থনা করায় কিনা জানি না, দিন চারেক বাদে আমি ভালো হয়েছি। গান শুনতে শুনতে আমি যখুনি চোখ খুলেছি—দেখেছি, হয় মায়ের মুখ নড়ছে নয়তো বাবার। কখনও বাবার গলা কখনও মায়ের গলা। —নমামু কঁরু ম্যাঁয় গুরু চরণম। সদগুরু চরণম শ্রীগুরু চরণম··।

এরপর আমার বিয়ের জন্যে উঠিপড়ি চেষ্টা শুরু করে দিল জেঠিমা। আমারই আগে হওয়া প্রয়োজন, মমতাদির আগে। এ বাড়ি থেকে বিদায়ের পালা চুকিয়ে ফেলা উচিত আমারই।

আমার বিদায় হতে হতে একটি মহাপ্রাণের বিদায় যে হয়ে যাবে, নিষ্ঠুর-নিয়তি নিরালায় বসে বসে যে হাসছিল, তা কারই বা গোচরে আসে?

একটা মতিচ্ছন্ন পেয়ে বসল জেঠিমাকে। খুব ধনী ঘরের সম্বন্ধ, লোভ সামলাতে পারেনি। আমায় দেখতে এসেছে বাড়িতে। দেখাল মমতাদিকে। এ-ক্ষেত্রে আমি কিন্তু ইচ্ছে করেই কিছু করিনি আগের মতো। আমায় লুকিয়ে সব কিছু হয়েছে। যেমন আসি তেমনি হঠাৎ করে এসে পড়েছিলুম পাত্রী দেখানোর সময়। জেঠিমার চোখে বিরক্তি-রাগ।

পাত্রপক্ষ চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, ঘটকের কথার সঙ্গে দ্বিতীয় মেয়েটিই মেলে, অর্থাৎ আমি। ওই মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করলে রাজী, না হলে নয়।

চিঠি পেয়ে পাগলের মতো ক্ষেপে উঠেছে জেঠিমা। আমি তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে। মনোরমা মাসি সুশান্তদা এসেছে আমাদের বাড়িতে। মাসি মায়ের কাছে বসে, সুশান্তদা আমার পাশে। জেঠিমা ঘর থেকে বেরিয়েই ঠাস করে এক চড় আমার রগে। —সর্বনাশী

কোথাকার, আমার সর্বনাশ করতে বসেছে! বারণ শোনে না কো! বোঁ করে মাথাটা ঘুরে উঠেছে আমার। চোখে অন্ধকার দেখেছি। পড়ে যাচ্ছি, সুশান্তদা হাতটা ধরে ফেলেছে। রেগে উঠে দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছে—আপনি মারলেন কেন অমন করে? জেঠিমার গলার আওয়াজ শুনেছি চোখ বুজে বুজে। —বেশ করেছি, তোর এতে নাক গলাবার দরকার কি? বাইরের ছেলে, মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি।

চেঁচামেচি শুনে মা মনোরমা মাসি ছুটে এসেছে। জেঠিমা চীৎকার করে উঠেছে—এত বড় স্পর্ধা! যার শিল যার নোড়া—তার ভাঙব দাঁতের গোড়া। নিশ্চয় ওরা তোমার বাড়িতে গিয়ে আমার নামে নিন্দেবান্দা করে। নইলে বাইরের ছেলে সাহস পায় কি করে! আমি চাই না কোন বাইরের লোক বাড়ির ব্যাপারে মাথা গলাক। এতই যদি দরদ, নিয়ে যাও না ছোটবউ ছোটকর্তা আর ওই দজ্জাল খাণ্ডারণীকে!

মনোরমা মাসি খুব অপমানবোধ করেছে। সুশান্তদাকে নিয়ে চলে গেছে।

তারপরের দিনে মোক্ষম রায় দিল জেঠিমা। অপরাধ, এত কাণ্ডের পরে ওদের বাড়িতে আবার গেছি কেন। জেঠিমাকে অপমান করতে পারে যারা, তাদের সম্পর্ক কিসের! এখানে বংশের ইজ্জতমানের প্রশ্ন। কেউ যদি ও বাড়িতে যায়, তাহলে জেঠিমা আর এ বাড়িতে থাকবে না। দেখা যাক কে বেশি আপনার? যে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখছে সে, না যারা দুশমনি করছে? জেঠিমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন, বাড়ি বয়ে এসে বনেদী ঘরকে এ অপমান করা বরদাস্ত করতে পারতেন না কখনও। সেই মায়ের আসনে বসে আছি আমি। মা আমার ভেতরে ঢুকেই এসব বলাচ্ছেন—শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে বৌমা। অন্যায়ের শাসন নিশ্চয়ই করবে। তা সে যত আপনজনই হোক। তাতে যদি কাউকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে হয় তাও করবে। খানদানী বংশের

ইজ্জত রাখার জন্যে যে কোন কাজ আমার নাম করে করে যাবে। জানবে সেটা আমারই করা।

মনোরমা মাসির বাড়ি যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল আমাদের। ওদের আসার পথও বন্ধ।

এসব ব্যাপারে মা আবার আগের মতোই চুপচাপ। আগের মতোই উদাসীন! মাঝে ক'দিন কাছে পেয়েছিলুম। আবার হারিয়ে গেল। আর বাবা? সারাদিন ধ্যানজপেই মগ্ন। আর আমি? না পারছি উদাসীন হতে না পারছি ধ্যানজপ করতে। মন বারবার ছুটে গেছে মনোরমা মাসির বাড়ি। যেন কয়েদখানায় বন্দী আমি। বারান্দায় দাঁড়িয়েছি আকাশ দেখব বলে। নীচের দিকে তাকাতেই চোখে পড়েছে সুশান্তদাকে। রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে, ছল ছল চোখ। বেশিক্ষণ চোখে চোখ রাখতেও হয়নি। সেখানেও জেঠিমার চোখ—শনির দৃষ্টি। ছাদে উঠেছিল। ওখান থেকে দুম দুম করে নেমে এসে চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেছে আমায় ঘরে।

এ-দৃশ্য সুশান্তদার চোখে পড়েছে কিনা জানি না। পরে দেখার চেষ্টা করেছি ঘরের জানলা দিয়ে, লুকিয়ে চুরিয়ে। পাইনি। আগের মতো দু'বাড়ির ঝিয়েদের যাওয়া-আসা চলেছে গোপনে। সভ্যতা-ভদ্রতা অহংকার ঠুনকো আভিজাত্যের পাঁচিল ওদের আটকাতে পারেনি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমিও হয়ে যাই ওই ঝিয়েদের মতো। সভ্য-ভদ্র ঘরে জন্মানো—এ যেন আমার জীবনে এক অভিশাপ।

সলমার মুখেই শুনেছি আমি সুশান্তদা নাকি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। জ্বর ছাড়ছে না দিন সাতেক হল। একবার চোখে দেখার জন্যে হানটান করেছি। বলেছি বাবাকে। বাবা গুনগুন করে গুরু-বন্দনা গেয়েছেন কেবল।

শুনেছি, বিকারের ঘোরে সুশান্তদা বারবার চীৎকার করে উঠেছে, জেঠিমা, যদি কোন অন্যায় হয়ে থাকে, তুষারের বদলে আমাকে সাজা দাও। ওকে তুমি মেরো না, আর মেরো না। থেকে থেকে

বলেছে, তুষার তুমি এসেছ! একটু মাথায় হাত বুলোও। তোমার লাগেনি তো?

একি সাজা আমার! মায়ের বাবার—সবার চোখের আড়ালে কলঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে কেঁদেছি। কত দেবতাকে ডেকেছি—সুশান্তদা ভালো হয়ে উঠুক। কই, শুনল না তো আমার কথা কোন দেবতা! কাল-টাইফয়েড ধরেছিল সুশান্তদাকে। একুশ দিনের দিন সুশান্তদাকে না নিয়ে সে ও বাড়ি ছাড়ল না। মৃত্যুর আগে সুশান্তদা বলে গেছল, তার দেহ যেন তার তুষারকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

কথা মতো বাড়ির কাছ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু দেখা আমার হয় নি। বাধা কেউ দেয়নি, জেঠিমা আসেনি এ ঘরে। তবু আমি দেখতে পাইনি। সুশান্তদা নেই শোনার পর যেন কেমন হয়ে গেছলুম। বেহুঁশ হয়ে কতক্ষণ পড়েছিলুম, জানি না।

সুশান্তদার কথা মনে হলে, মনে পড়ে যায় কামাখ্যায় প্রসূনের জ্বরবিকারের কথা। অসুস্থ প্রসূন হয়ে উঠেছে অনেক সময় সুশান্তদা।

সুশান্তদার চলে যাওয়ায় পরের অধ্যায়—সে এক অতি বাস্তব। সেখানে আমি ভেঙে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছি।

জেঠিমার ইচ্ছে, নয় যেন না পেরোয় আমার। মমতাদির বিয়ে চুলোয় গেল। আমার জন্যেই পাগল। বিয়ের খুব তোড়জোড় চলতে লাগল। জেঠিমাকে কোন বেগ পেতে হয়নি। আমাকে তো এক দেখাতেই অনেকের পছন্দ হয়েছিল। এবারও হল তাই। পাত্রপক্ষের লোকেদের আর তর সইছে না। বয়েস কম শুনেও না। ছেলের মা তো বলেই বসল, মেয়েছেলের বাড় কলাগাছের বাড়। ঠিক মানিয়ে যাবে। হরিপালে বাড়ি ছেলেদের। অবস্থা মন্দ নয়। জেঠিমা বলেছে বাবাকে, এর থেকে আর কি ভালো পাত্র পাবে ঠাকুরপো।

এত সাদাটে গায়ের রং, লোকে বলে শ্বেতী। তার ওপর পাগল—আবোল-তাবোল বলে, মড়ার মাথার স্বপ্ন দেখে। আর সুশান্তর ব্যাপার! এ-সব জানলে কে আর জেনে শুনে মেয়েকে ঘরে নেবে! দূরের পাত্র তবু ভালো!

উদাসীন মা আবার সচেতন হয়ে উঠল একটু। জানি না, বিয়ের ব্যাপার-স্যাপার শুনে কিনা। প্রায়ই, সে কি দিন কি রাত আমাকে বুকে চেপে ধরেছে। আমার আগে সাত সাতটা তো চলে গেছে। বিয়ে হয়ে চলে যাব শুনলেই মা এ-রকম করেছে। বারে বারে আমার কানে শুনিয়েছে একটি কথাই—শ্বশুরবাড়ি গিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ী সকলের সেবা করবে। স্বামীকেও দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা জানাবে। মেয়েদের জীবনে স্বামীই সর্বস্ব।

'স্বামী সর্বস্ব' শুনে মাথাটা আমার ঝিম ঝিম করে উঠেছে। সবকিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। মনোরমা মাসি আমাকে তার ঘরেরই বউ করতে চেয়েছিল। কিন্তু হল কই! স্বামী হিসেবে আমি একজনকেই নিয়েছিলুম। আমার কেবল মনে হয়েছে, আমি বিধবা, আমার স্বামী চলে গেছে। যত বিয়ের দিন এগিয়ে এসেছে, তত প্রাণের-মনের কষ্ট বেড়েছে আমার। দম আটকানো অসহ্য কষ্ট! প্রাণটা বেরিয়ে গেলে বাঁচি।

তা বুঝি সহজে বেরোবার নয়, আমার মতো মেয়ের নয়ই। এখনও যে অনেক কিছু বাকি আছে।

এলো সেই দিন। অনেকের কাছে বিয়ের শুভলগ্ন আমার কাছে মরণ-ক্ষণ হয়ে দাঁড়াল।

ছাঁদনাতলায় বর এলো। বাতাসে উলুধ্বনি আর শঙ্খধ্বনি।

সুরসিকা এয়োতিরা বরকে দেখে রঙ্গতামাশায় মেতে উঠল। নাচের ভঙ্গিতে বরের সামনে কেউ বা গেয়ে উঠল—'দেখা হবে ছাঁদনাতলায়, বলে গেছে ইশারায়। ঘটা করে বর এসেছে, চুপিসারে দেখে পালায়'।

এত রহস্য, এত আনন্দ আমি কিন্তু এতটুকু ভোগ করতে পারছি

না। . পানে মুখ ঢেকে আলপনা আঁকা পিঁড়িতে বসিয়ে নিয়ে আসা হল আমায় ছাঁদনাতলায়। বর বড় কি কনে বড় রব উঠল। পিঁড়ি ধরে তুলে ধরা হল বরের মাথার ওপরে। নামিয়েছে, এবার শুভদৃষ্টি হবে। বরের মুখের দিকে আমি তাকাতে পারছিনা। চতুর্দিক থেকে একটাই শব্দ শুনছি, চাও চাও চাও। এত লজ্জা কিসের! আমার কিন্তু লজ্জা আসেনি। মনের কথা কে বুঝবে, কাকে বলব! চারকোণে চারটে কলাগাছের ঘেরের মধ্যে পাতা শিলের ওপর দাঁড়িয়ে সুশান্তদা। চোখে জল। ঝরে পড়ছে ঝর ঝর করে। আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারলুম না। দু'চোখে হাতচাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছি। জ্যাঠামণি আমার দু'হাতে জোর করে মালা দিয়ে মালা বদল করিয়েছে। ছাঁদনাতলায় আর আমার স্বামীকে দেখা হল না। চার-চোখের মিলনও হল না। বিয়ের সময় ঘটের ওপর যখন দু'হাত এক করে মালার বাঁধনে বেঁধে রাখা হয়েছে, পুরোহিত-ঠাকুর মন্ত্রপাঠ করছে, তখনও কিন্তু চোখ তুলে তাকাতে পারিনি। পেছন থেকে এসে কে যেন দু'চোখ চেপে ধরেছে। ও মুখ দেখতে দেবে না কিছুতেই।

বিয়ের পরদিন বিদায়ের সময় মা আবার উদাসীন হয়ে গেছে। বাবা শুধু মৌনমুখে চেয়ে থেকেছে। কেঁদেছে জেঠিমা, গেট অবধি এসেছে। গা ভরতি গয়নায় সাজিয়েছে আমায়—কান নাক পা—বলতে গেলে মাথা থেকে পা অবধি সোনায় মোড়া।

চকমেলানো দোতলা বাড়ির ভেতরে শান বাঁধানো পুকুর। জল নয়তো, যেন বড় একখানা ফটিক হাওয়ায় থরথর করে কাঁপছে। পাড়ে দাঁড়িয়ে কতবার দেখেছি কিলবিল করে বেড়াচ্ছে কত রকমের মাছ। এ-বাড়ি এ-পুকুর আমার শ্বশুর করে যাননি। করে গেছেন দাদা-শ্বশুর। ভেতরে শিবমন্দির কালীর মন্দির শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। শাক্ত বৈষ্ণব শৈব সকলেরই মিলন। আমি বাড়ির একমাত্র বৌ। দেওর নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে অনেকদিন, কোন খোঁজখবর পাওয়া যায় নি।

ছোটর জন্যে শ্বশুর-শাশুড়ী ক্ষীণতনু।

স্বামী বেশিরভাগ সময় কলকাতায় থাকে। বাবা-মায়ের আদরের ধন। আমিও ওদের তিনজনের চোখের মণি হয়ে উঠলুম।

আমি ওদের চোখের মণি হলুম বটে ; কিন্তু আমার চোখের মণি সুশান্তদা এখনও। সদাসর্বদা চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও কখনও আমার মনে হয় পাশে পাশে, পেছনেও দাঁড়িয়ে রয়েছে। শাশুড়ীর সঙ্গে আমি কৃষ্ণের মন্দিরে বসেছি কখনও। কখনও কালীর কখনও শিবের মন্দিরে। পুজো দেখেছি, আরতি দেখেছি। কিন্তু ঠাকুরের মুখেও সুশান্তদার মুখ ভেসে উঠতে দেখেছি।

আমি জ্বরে পড়লুম। সুশান্তদার মতো আমারও টাইফয়েড। আমি ভাবলুম যাব, সুশান্তদার কাছে আমি সত্যি সত্যি যেতে পারব। তা আর হল কই! জ্বরের ঘোরে আমিও সুশান্তদা সুশান্তদা বলে চীৎকার করে উঠেছি। দেখেছি যেন সুশান্তদা এসে মাথায় হাত বুলোচ্ছে। আমার জ্বরবিকারে ভয় পেয়ে গেল শ্বশুর-শাশুড়ী। মাকে খবর দিয়ে আনাল। মা আমার খুব সেবা করেছে। মনে আছে বিকারের ঘোরে আমি ঘর থেকে বেরোতে চেয়েছি। মা বুকে চেপে আগলে রেখেছে। মায়ের আরেকটা ব্যাপারেও চোখ খুলে গেল আমার। মা সেবা করতে জানে। বাঁচিয়ে তোলার মৃতসঞ্জীবনী আছে ওই সেবার মধ্যে।

ন'বছর বয়েসে বিয়ে। আরও ন'বছরের জীবন আমার কেটেছে শ্বশুরবাড়ি-বাপের বাড়ির ইতিকথা নিয়ে। আঠারোয় তিন বছরের সৌরভকে বুকে নিয়ে চলে এসেছি কলকাতায়, স্বামীর সঙ্গে।

কলকাতার কথা কামাখ্যার কথা তিব্বতেরও কিছু কথা আগেই বলেছি। যদিও এখনও তিব্বতের অনেক কথা বাকি। তার আগে ওই নয়ের পর আঠারোর মধ্যে ক'টা দাগ কাটা যাতনার দৃশ্য আমার জীবনঅধ্যায়ে এসে আচমকা হাজির হয়েছে।

নরেশ মাইতি আমাদের নায়েব ছিল—শ্বশুরবাড়ির। কাকদ্বীপের কাছে কচুবেড়িয়ায় ওদের দেশ। ওখানে মহাসমারোহে গাজন উৎসব

প্রতি বছরই মানুষের মনকে টেনে নিয়ে যায়। উৎসবের মহিমাকীর্তন শুনে শ্বশুর-শাশুড়ী যেতে রাজী হলেন। আমাকেও নিয়ে আসা হল কচুবেড়িয়ায়। তখন আমার বয়েস বারো কি তেরো।

বটগাছতলা থেকে একটু দূরে পুকুর। তিনদিন ধরে পুকুরপাড়ে ঢাকঢোল বেজেই চলেছে। কিনা পুকুর থেকে শিব তোলা হচ্ছে! প্রতিবছর চৈত্রসংক্রান্তির দিনে এই পুকুরে পাথরের শিব বিসর্জন দিয়ে রেখে দেওয়া হয়।

পুকুর জোড়া টানা জাল বিছানো। জেলেদের মাছধরার মতো জাল টেনে টেনে পাথরের শিব তোলা হল তিনদিনের মাথায়। শিব মাথায় করে নাচতে নাচতে গাছতলায় নিয়ে এলো ভক্তেরা। বট-গাছের তলায় মাটির গর্তে স্থাপনা করল শিবকে। তারপর বটতলা ঘিরে তাণ্ডব নৃত্য সকলের! মোটা মোটা ঘুঙুর বাজছে না তো, যেন ঝাঁঝর। বাজনার তালে তালে ধুলোর ধোঁয়ায় একটা পাতলা পর্দা পড়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। শিবকে দেখতে পাচ্ছিনা, ওদেরও দেখতে পাচ্ছিনা। এ তো গেল সকাল-বিকেলের কথা।

সন্ধ্যের মুখোমুখি হ্যাজাকের আলো জেলে এ-পাড়ার লোকের সঙ্গে ও-পাড়ার লোকের গানে গানে প্রশ্ন-উত্তর চলতে লাগল। এ পাড়ার লোক হাত নেড়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে গেল ও-পাড়ার সীমানায়। বাঁশী বাজছে কাঁসি বাজছে ঢোল বাজছে। গাইয়ে গাইছে, তোদের শিব ন্যাংটা নেশাখোর/রাতের বেলায় ঘুমের ঘোরে তোরাই সিঁধেল চোর।

এপার পেছিয়ে গেল। ওপার হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এলো। তার মধ্যে মেয়ের বেশে অনেক ছেলেও ঘোমটা টেনে কোমর দুলিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছে আর গাইছে।

মরি হায় হায় হায়!
লজ্জায় মাথা কাটা যায়
সুন্দরী পার্বতী পেয়ে তবু অন্য মেয়ে চায়।
চোরের মায়ের বড় গলা
আবার সোনার দুর্গারে শাসায়।

এবার দু'পার একসঙ্গে মিলে গিয়ে কি হুল্লোড় কি গান! সকলের গলায় গলা মিলিয়ে।

কাকে গাল দিচ্ছি মোরা
ভোলা যে দুজনেরই পিতা।
ক্ষমা কর ভোলানাথ
ধিনতা ধিতাং ধিতা।

প্রথম দিনের এই পর্ব দেখলুম। নতুনের স্বাদ পেয়েছি, ভালো লেগেছে। এক নতুন জগতে এসে পড়েছি চেনাজানার জগত থেকে। শ্বশুরমশাই বললেন, নরেশ মাইতি বলেছে, ঝাঁপটাই আসল। সংক্রান্তির দিনে হবে, পরশু। ওটা না দেখিয়ে ছাড়ছিনা আপনাদের।

নরেশ মাইতির স্ত্রী খুব যত্নআত্তি করছে আমাদের। বড় বাতাসা মোয়া জলখাবার। দুপুরে পুকুরের মাছ মোটা চালের ভাত। রাত্তিরেও তাই। যখন পরিবেশন করে তখনই সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে নরেশ মাইতির স্ত্রীকে। খেতে না পারলেও ওর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। মিষ্টি কথায় এমন করে 'একটু নিন না বলে' যে, কিছুতেই না বলা যায় না। মনে হয়, নিজের মা-মাসিই বা হবে বুঝি। মাটির বাড়ির টালির চাল, তাহলেও বেশ ছিম-ছাম। মেঝে দেয়াল মাটির পোঁচে নিকনো, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এই বাড়িতেই একটা ঘরে রিহার্সাল হচ্ছে কালীর নাচের। গাজনের মূল সন্ন্যাসীকে 'ভক্তা' বলে এরা। ভক্তার ভাই-ই প্রতিবছর সংক্রান্তির দিনে কালীর আবেশে নাচতে নাচতে বটতলা থেকে পুকুরের মাঝ অবধি যায়, আবার ফিরে আসে বাজনার তালে তালে। এক দুই তিন···পাঁচ ছয় সাত—এইভাবে বা?? ?াতেক।

কি লাফানো, প্রায় আধতলা সমান! গোটা গায়ে কালো ভুষি মাখা, নকল দু'হাত—খাঁড়া ধরা আর অভয় মুদ্রা। নিজের দু'হাতে বরমুদ্রা আর মুণ্ডু। লাল ঘাগরা পরা, মাথায় পরচুল, কপালে ত্রিনয়ন, দাঁতে চেপে ধরেছে লাল রঙ মাখানো টিনের নকলকে জিভ। আমি এই নকল কালীকে দেখলুম। এমনি চেহারায় খুব কালো নয়। নাচতে

নাচতে ও যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে! আর ওর দাদা মাথাটা ধরে নাড়া দিচ্ছে কাঁধ দুটো ধরে ঝাকুনি দিচ্ছে, ওকে সচেতন করে তুলছে। পরশু নাচতে হবে।

অভ্যেস করার সময়ও দেখছি ও সত্যি সত্যি কালী হয়ে উঠছে।

ঘরে কালী বনে যাওয়া আর কালী-নাচের রিহার্সাল চলছে। বাইরে গাজনের বোলান গান গাইতে গাইতে ছেলেরা চলেছে। হাসিমস্করার গান। হাসির ফোয়ারা উঠছে গানের কথার সঙ্গে।

খুকির মা ঢেঁকিতে
যায় না ধান ভাঙতে
খাবার বেলায় মোটা মোটা গ্রাস…।

গাজনের বিকেল।

মাঠঘাট ভরে গেছে লোকে। হোগলার চালের দোকান সারি-সারি। মেলা বসেছে। রকমারি জিনিস—মণিহারী মেঠাইমণ্ডা বেতের চুবড়ী রেশমী চুড়ি আরো কত কি!

বটতলায় বাঁশের ভারা বাঁধা উঁচু করে। ভারার সামনে মাটিতে ছোট ছোট করে কাটা কলার পেটোর ওপর সাজানো ছোট কাটারি আর বঁটি। বাঁশ বেয়ে গাজনের সন্ন্যাসীরা ওপরে উঠল ক'জন, 'ভোলা মহেশ্বরের চরণে সেবা লাগে' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল কলার পেটোর ওপর। হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। ওদের মুখে 'জয় জয় ভোলা মহেশ্বর' ধ্বনি। আশ্চর্য, কারো কোন আঘাত লাগেনি পেটে! শুধু পেটে কেন, দেহের কোন জায়গায়ই নয়। এক কণা রক্তের ছিটে নেই কোথাও। দর্শকরা বাবার নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। পশুপতিনাথের জয়। শিবশম্ভুর জয়। পার্বতীবল্লভের জয়।

ভারার ডান পাশে কাঠের আগুন জ্বলছে। নিভিয়ে দেওয়া হল ছাই ফেলে। এবার দেখছি অদ্ভুত-অবিশ্বাস্য দৃশ্য। সেই আগুন রাঙা-উত্তপ্ত কাঠের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সন্ন্যাসীরা এপার থেকে ওপারে চলে গেল। ওরাও দাঁড়িয়ে উঠে জোড় হাতে শিববন্দনা

করল। 'ও বাবা, পাতকীতারণের চরণের সেবা লাগে, মহাদেব!'

এবারে ঝুলন।

ভারার বাঁশে ওপর দিকে পা বাঁধা নীচে মাথা ঝুলছে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল সন্ন্যাসীর। মাথা দুলছে উত্তর দক্ষিণ, দক্ষিণ উত্তর···। মাথা থেকে হাতখানেক নীচে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। আগুনের তাপ লাগছে মুখে, মাথায়। একটু পরেই সন্ন্যাসীকে টেনে তুলে নিল ভারার ওপরে 'ভক্তা' সন্ন্যাসী।

শুরু হল কালীনাচ।

যাকে দেখেছিলুম রিহার্সালে নাচ অভ্যেস করতে, সেই শুরু করল। ঘরে দেখেছিলুম একরকম, এখানে একেবারে আলাদা। নাচতে নাচতে দেহ ওর এত হাল্কা হয়ে যাচ্ছে, অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছে, যেন আকাশে উঠে যাবে। ওপরে উঠছে নীচে নামছে···ওপরে উঠছে নীচে নামছে ওপরে উঠছে···।

নাচের নেশায় মাতাল ওই লোক। কিছুতেই থামাতে পারছে না কেউ। সন্ন্যাসীরা এসে সবাই মিলে ওকে চেপে ধরল। নাচের আগে ওর মুখের ভেতর শিবের যে প্রসাদী ফুল বেলপাতা ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তা টেনে বার করতেই ও বেহুঁশ হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে ওই মানুষ, মুখে কোন ক্লান্তির ছাপ নেই। ঘুমিয়ে ওঠার সুন্দর-সুস্থ মুখ!

একটা হৈ হৈ শব্দ চতুর্দিকে। অশুভ আশঙ্কার আবহাওয়া সৃষ্টি করে ফেলল নিমেষে।

দেবভাবে অসুরের প্রকোপ পড়ল বুঝি। মেলার জুয়ায় মারপিট বেধেছে দু'দলে। কিছু লোকের মাথা ভেঙেছে—রক্তারক্তি কাণ্ড! আমার বুক ধড়াস ধড়াস করে উঠল। মাথা ঘুরছে, বসে পড়লুম। বড্ড মন কেমন করছে জ্যাঠামণির জন্যে। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে, বাবাকে নয় মাকে নয়, জ্যাঠামণিকে।

কচুবেড়িয়ার গাজন উৎসব দেখে হরিপালে ফিরেছি। কিন্তু ফিরেই কলকাতায় আসতে হয়েছে আমায়। খবর পেলুম জ্যাঠামণি দারুণ অসুস্থ!

দিনের বেলায় রাতের নিঝুম জেঁকে বসেছে বাড়িতে। সকলের মুখে একটা বিষাদের ছায়া। দু'জন ডাক্তার বিষণ্ণমুখে মাথা নীচু করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। জেঠিমার রোষ থেকে জ্যাঠামণি অনেক সময় বাঁচিয়েছে আমাকে। জেঠিমাকে বকাবকি করতেও শুনেছি নিজের কানে।—আহা, অমন লক্ষীমন্ত মেয়েটার ওপর তোমার এত হিংসে কেন! মমতা এত গায়নাগাটি পরে, তুষির জন্যে তোমার প্রাণ এতটুকু কাঁদে না বড়বৌ।

জেঠিমা খেঁকিয়ে উঠে বলেছে, অত যদি দরদ, তুমি পরাও না কেন! আমি তো বারণ করিনি। এই যে রতনবাইকে অত সাজাচ্ছ, বাধা দিয়েছি কি? এমন সাবিত্রী-সতী স্ত্রী পাবে কোথায়!

শুনলুম, জ্যাঠামণি কলতলায় পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছল। জ্ঞান ফিরেছিল ডাক্তারদের প্রাণপণ চেষ্টায়, কিছুক্ষণের জন্যে। আমার আর রতনবাইয়ের নাম করেছে বার বার। মাথার কাছে গয়না টাকার ব্যাগ আনিয়ে রেখেছে আমাদের দু'জনকে দেবে বলে।

আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। মাথার কাছে যা কিছু ছিল —সমস্ত সরিয়ে ফেলেছে জেঠিমা। সলমার মুখে শুনে আমি জোড়-হাতে প্রার্থনা করেছি। এক এক দেবতার নাম করে—মা কালী মাদুর্গা শিব কৃষ্ণ তোমরা আমার জ্যাঠামণিকে বাঁচিয়ে তোল।

কিচ্ছু হল না। চোখের সামনে থেকেও চোখ খুলল না জ্যাঠামণি। রতনবাই কাঁদতে কাঁদতে এসেছে। আমার মতো তারও অবস্থা। জেঠিমা চোখের জল মুছছে। বাঁ হাতে মুছছে আর ডান হাতে

জ্যাঠামণির মাঝের আঙুল থেকে দামী রুবীর আংটিটা খুলছে। রতন-বাই মানা করল, দিদি ওটা আর খুলবেন না। ওঁর সঙ্গে থাকুক।

জেঠিমা জোরে কেঁদে উঠল, আমি কি নিয়ে থাকব? ওঁর এই শেষস্মৃতি বুকে আঁকড়েই তো থাকব বোন। বলে, আংটি খুলে আঁচলের গেরোয় বাঁধল জেঠিমা।

জ্যাঠামণি চলে যাবার মাস ছয়েক যেতে না যেতেই আগের থেকে আটগুণ দাপট বেড়ে উঠল জেঠিমার। হাতে মাথা কাটা যাকে বলে! টেকা দায় হয়ে দাঁড়াল বাড়িতে।

বাড়ি ভরতি তার বাপের বাড়ির লোক! বাবা-মায়ের চূড়ান্ত অযত্ন হেনস্থা প্রতি মুহূর্তে।

মুখ বুজে সহ্য করেছে বাবা, বাবার অভ্যেস। মা যাও-বা দু-একটা কথা কইত আগে, এখন একেবারে বোবা হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এলো মায়ের। এখন মনে হয় নিজের মৃত্যুকে নিজে বরণ করে নেবার জন্যে, জেঠিমার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল মা অনেকদিন। মায়ের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে, সে সুযোগ এসেছে জ্যাঠামণির বার্ষিকী শেষ হয়ে যাবার পর।

খাবারদাবার দেওয়ার ব্যাপারেও সময়ের ঠিক-ঠিকানা নেই! জেঠিমার যখন মর্জি তখন দেওয়া হবে। একবেলা আধবেলা দিতে ভুল হওয়াও শুরু হয়ে গেল। মুখ ফুটে চায়নি বাবা। অভিমান না ধ্যানে আত্মতন্ময় তা আমি আজো বুঝিনি। মাও মৌন, কোন প্রতিবাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে কিনা তা জানি না। কেমন করে পেটের খিদে চেপে রাখে ভেবে কুলকিনারা পাই না। কোন সাধনার শক্তিতে, না শরীরের সমস্ত অনুভূতি মৃত্যু হয়ে গেছে বলে! এ যে জ্যান্তে মরা!

মা-বাপের কষ্ট আমি প্রাণে প্রাণে মনে মনে অনুভব করেছি! শুধু অনুভব করাই সার হয়েছে। কিছু সাহায্য করতে পারিনি।

জেঠিমার কোন অনিষ্ট করিনি আমরা। তবু কেন এত কোপ! মা বাবা আমি সকলেই শেষ হয়ে যাই—এই কি চায়!

যেখানে বিয়ে হল, পড়তি দশা। তাদেরই দিলেথুলে মঙ্গল। আমার বাবার জন্যে সাহায্য পাবার কোন আশা নেই। শ্বশুরবাড়ির বাড়িঘর জমিজায়গা সব যে হালকা বালির বাঁধের মতো কেউ-ই জানতুম না। হয়ত বা জেঠিমা জানত, জেনেশুনেই করেছে। শরিকী মামলা-মোকদ্দমায় কলকাতাবিলাসী বড়ছেলের টাকার চাহিদা আর কলকাতায় থাকার খরচ তাও যোগাতে হয়েছে এই অগোছালো সংসার থেকে। কলকাতায় কি কাজ করে স্বামী, কিছুই জানি না। বাড়িতে আসেও কম। যেটুকু বিষয়আশয় আছে, সেদিকেও কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ব্যয়টা তার কর্তব্য নয়, আয়টা তার হকের দাবী। আসবে নেবে, বাবা-মার সঙ্গে ঝগড়া করবে। স্বামী কি জিনিস, স্বামী আমাকে জানতেই দেয়নি কোনদিন। মায়ের কাছে শুনেছি স্বামী দেবতা, সেই শিক্ষাই পেয়েছি। দেবতাকে শ্রদ্ধা করতে গেছি, ভক্তি করতে গেছি। শ্বশুর-শাশুড়ীর চোখে জল দেখে সে শ্রদ্ধা উবে গেছে। আচারে ব্যবহারে ভয় ধরেছে। আমি ভয়ই করেছি তাকে। স্বামী কেন, সময় সময় মনে হয়েছে ও আমার কেউ নয়।

বকেয়া খাজনা বাকি পড়ার জন্যে জমি লাটে ওঠার যোগাড় হয়েছে। শাশুড়ী জলভরা চোখে করুণমুখে বলেছে, বৌমা, কোন কিছু কি উপায় করা যায় না? কি বলতে চেয়েছেন, আমার না বোঝার কথা নয়। বাক্স খুলে বিয়েতে জেঠিমার দেওয়া গয়না তুলে দিয়েছি শাশুড়ীর হাতে। বলেছি, দেখুন, যদি কিছু করা যায়।

গয়নার কথা যখন শুনলুম আমি, আকাশ থেকে পড়েছি। বুকে আমার দুমদুম করে হাতুড়ি পেটার যন্ত্রণা! জেঠিমা কেন এমন করল, না দিলেই তো পারত। আমি তো চাইনি, মা তো চায়নি, বাবা তো চায়নি। তবে এ নির্মম রহস্য কেন আমাকে নিয়ে! দু'হাতে/দু'গাছা লাল রুলি দিয়ে দিলেই তো হ'ত। গয়না কষতে গিয়ে স্যাকরাও অবাক! এত বড় ঘরে এতখানি প্রবঞ্চনা! রূপোয় সোনার জল ধরানো সমস্ত।

অপমানে লজ্জায় মনে হয়েছে, ধরিত্রী তুমি দ্বিধাবিভক্ত হও!

তোমার মধ্যে প্রবেশ করে আমি আমার মানসম্ভ্রমকে বাঁচিয়ে রাখি। কি করে এদের মান রক্ষে করা যায়, কি করে বাপের বাড়ির মান রাখি। চলে এলুম কলকাতার বাড়িতে। চুপ করে থাকতে পারিনি। বলেছি দু'কথা জেঠিমাকে। মুখ ফসকে যা বেরোনো উচিত নয়, যে ভাবে মানুষ আমি, তাই বলে ফেলেছি—জেঠিমা, এত হিংসে তোমার কেন আমার ওপরে? তোমার বুকের মধ্যে কালকেউটের এত বিষ কেন? কেন তুমি এরকম ব্যবহার করলে?

জেঠিমা রণচণ্ডী মূর্তি ধরেছে। ভণ্ডের মেয়ে চোর-জোচ্চোরই তো হবে! উল্টে চাপ আমার ওপর! ভেবেছিস কি, তোর এই কথায় আমি ভয় পেয়ে নতুন গয়না গড়িয়ে দোব? অভাব হয়েছে চাইতে পারিস, ভিক্ষে করতে পারিস। তা নয়, চোটপাট কত!

আমি বললুম, কথা দিয়ে তুমি যতই কথার প্যাঁচ কাটো, তুমি নিজের ভেতরকে জিজ্ঞেস কর, তুমি কি? সেখানে এভাবে কথা বলার ক্ষমতা তোমার নেই।

জেঠিমার চীৎকারে তিনতলা বাড়ির প্রত্যেক তলায় ভূমিকম্পের কাঁপুনি।—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! এত বড় স্পর্ধা! মা মেয়ে বাপ শ্বশুরবাড়ির লোক সব দল পাকিয়ে আমার নামে কলঙ্ক রটানো, ষড়যন্ত্র পাকানো। আমার মুঠোয় এমন জিনিস রয়েছে, তোদের জেলে পুরে দিতে পারি। ফের যদি একটা কথা শুনি, জিভ টেনে ছিঁড়ব, তোদের সবাইকে দরোয়ান দিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দোব।

মাকে আমি চিনেও যেন চিনতে পারিনি। মা যে কি, এক এক সময় এক এক রকম দেখি। উদাসীন, কিন্তু এক একবার মা আবার এক এক বিষয়ে অংশ নিয়েও ফেলেছে। বাড়িতে লঙ্কাকাণ্ড চলছে শুনে দুর্বল শরীর নিয়ে মা এসে আমাকে বলল, তুষি! কেন এসেছিস জ্বালাতে! কেন কেন কেন? এক্ষুণি যা আমার চোখের সামনে থেকে। মায়ের চেয়েও যে জেঠিমা বেশি, তাকে এমন অপমান আমার মেয়ে হয়ে! কে তোকে আনতে গেছে,

কে তোকে আসতে বলেছে? বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বলছি।

মায়ের সর্বশরীর অসম্ভব রকম কাঁপছে। গাল বেয়ে টস টস করে জল পড়ছে। পড়ে যাচ্ছিল, আমি ধরে ফেললুম। আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, চোখ ফেটে জল আসছে। মা আমাকে এমন করে বলতে পারল? মাকে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে এসেছি। বসিয়ে দিয়েছি খাটে। হাঁপাচ্ছে। বললুম, মা, তোমাদের সবার আপদ আমি! আমি চলে যাচ্ছি এখুনি। তুমি শান্ত হও। মায়ের ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠেছে। কাঁপা হাতদুটো বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছি ওই বুকে। আমাকে চেপে ধরেছে, জোরে জোরে, আরো জোরে। ওই বুকে মিলিয়ে যাচ্ছে আমার বুক, কতদিন পাইনি। সব জ্বালা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

বিপদের ঘূর্ণিঝড়ে আমার মন ঘুরেই চলেছে। বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। মনে হল, বুকের ভেতর যে উথালপাতাল ঢেউ উঠছিল, হঠাৎ থিতিয়ে গেল।

লুকিয়ে এসেছে ঘরে সলমা।

আমার ওপর সলমার খুব সহানুভূতি। আমার শ্বশুরবাড়িতে গয়না নিয়ে অপমান-লাঞ্ছনা সইতে হবে আমায়—এটা সলমা বেঁচে থাকতে হতে দেবে না। আমাদের বাড়ির নিমক খেয়ে বেঁচে আছে, আর তারও তো কিছু আছে এতদিনের কামাইয়ের পয়সায়। দিদিমণির জন্যে দেবে বলে ঠিক করেই ফেলেছে। এতে যদি না হয়, আরো একটা মতলব এসে গেছে মাথায়—সেটা কাজে না ফলা পর্যন্ত সলমা মুখ খুলবে না। দেখা যাক, নসিব বড়, না চেষ্টা বড়!

সলমাকে বলেছি আমি, জেঠিমা যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে, তোর আর রক্ষে নেই তাহলে। সলমা, তুই নিজে বাঁচ, আমার বরাতে যা আছে, আমাকেই ভোগ করতে দে।

সলমার গলায় ক্ষোভ ক্রোধ বিরক্তি ঘেন্না ফেটে পড়ল।

—বড়বৌদি ঠকিয়ে গেল তোমাদের। নিজের বেলায় আঁটিসুঁটি পরের বেলায় দাঁতকপাটি। তোমার মানা শুনতে পারবুনি দিদিমণি। খ্যামা কর। পারবুনি বলতেছি।

সলমা গেছে আমাদের পুরনো বামুন নিধুর কাছে। নিধুবামুনকে জেঠিমা তাড়িয়ে দিয়েছে ঠাকুরমা মারা যাবার পর। খুব বিশ্বাসী, ঠাকুরদার আমলের লোক। জেঠিমার মনের অভিধানে নিধুবামুন বিশ্বাসঘাতক চোর। ঠাকুরমার মন রেখে রেখে অনেক কিছু হাতিয়েছে।

সেই নিধুবামুনই আমার অবস্থা শুনে কাণ্ডারীর ভূমিকায় এসে দাঁড়িয়েছে। অঘটন ঘটা যাকে বলে তাই ঘটিয়েছে।

সলমাই পথের নিশানা দেখিয়ে দিয়ে নিয়ে গেছে ওকে। যেখানে নিয়ে গেছে, যার কাছে নিয়ে গেছে—সে বাড়ি আমি চিনি না, তবে সে বাড়ির মানুষটিকে চিনি। মমতার একটি চাক্ষুষ উদাহরণ। আমার নিরাভরণ কান দেখে যে একদিন নিজের কানের দামী হীরের টপ খুলে পরিয়ে দিতে গেছল। রতনবাই।

রতনবাই আমার দুর্গতির কথা শুনে নীরবে কেঁদেছে খানিক। চোখ মুছে ধরা গলায় বলেছে, মোড়ের কালী মন্দিরে নিয়ে আয় নিধু তুষিকে। দুপুরে কেউ থাকে না। বুঝিয়ে বলিস ও বাড়িতে আর যেতে ইচ্ছে করে না। বড়বাবুকে দিদি চাননি, চেয়েছেন সোনাদানা ঐশ্বর্য। তা না হলে, বারণ সত্বেও আংটিটা টেনেহিঁচড়ে খুলে নিলে। আমার বুকটা ফেটে গেছে তখন। মানুষটাই চলে গেল, দিদির কাছে মানুষের চেয়ে আংটিটাই হয়ে উঠলো বেশী!

ভরদুপুরে সলমার সঙ্গে চুপিচুপি গেছি আমি মন্দিরে!

গিয়ে দেখি, আগে থেকেই এসে বসে রয়েছে রতনবাই। আমাকে দেখে হাসতে চেষ্টা করেও হাসতে পারল না। দরদর করে চোখের জল ঝরে পড়ল। উঠে এসে জড়িয়ে ধরেছে।

কান্না থামতে বলেছে, তোমার জ্যাঠামণির মতন মুখের আদল

এসে গেছে অনেকটা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে।

বলেছে, তোমার জ্যাঠামণি অনেক দিয়ে গেছেন আমায়। দ্বিধা সংকোচ করবে না এতটুকু। জানবে, তোমার জ্যাঠামণিই দিচ্ছেন তোমায়। সত্যিসত্যিই কিছু দেবার ইচ্ছে তো ছিল তাঁর খুব। তোমার জেঠিমা দিতে দিলে কই। তাঁর শেষ কথাটাও অমান্য করতে বুক কাঁপল না। মাথার কাছে রাখা জিনিস সরিয়ে ফেলল নির্ভয়ে।

রতনবাইকে জেঠিমা বলেই ডেকে ফেলেছি আমি। এই আমার আসল জেঠিমা।

রতনবাই দু'প্রস্থ গা-সাজানো গয়না দিয়েছে আমায়। বলেছে, একটা সেট তোমার শ্বশুরকে দেবে সম্পত্তি রক্ষের জন্যে, আর একটা তোমার নিজের জন্যে যত্ন করে রাখবে। ভবিষ্যতের জন্যে—কখন কি দরকারে লাগে, তা তো বলতে পারা যায় না। ভবিষ্যতের জন্যে হলেও তুলে রেখে দিও না যেন সিন্দুকে। ব্যবহার কর—ভোগ কর।

ভাগ্যে না থাকলে ভোগ হয় না বোধ হয় কারো। শ্বশুরের হাতে গেছে এক সেট। আর এক সেট গেল আমার পতিদেবতার শ্রীচরণে। অবিশ্যি এক সঙ্গে নয়, সময়ের অনেক তফাতে।

যখন আমার নিদারুণ দুর্দিনে রতনবাইকে প্রয়োজন হয়েছে, সাহায্যের জন্যে নয়, গান শিখে, গান শিখিয়ে না হয় জীবিকা চালাব, তখন কাছে পাইনি। রতনবাই তখন কলকাতায় থাকে না। সর্বস্ব হাসপাতালে দানধ্যান করে দিয়ে চলে গেছে রাজস্থানের অজগাঁয়ে। সন্ন্যাসিনীর জীবনযাপন করছে রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সামনে ভজন গেয়ে গেয়ে। আমার দুঃখের বার্তা তার শান্তির স্বর্গে পৌঁছে দিতে চাইনি আর। হ'ক আমার যত কষ্ট, হ'ক আমার যন্ত্রণা, হ'ক আমার চরম অভাব।

মনে মনে শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি রতনবাইকে। বলেছি, তুমি দেবী। তোমার মতন কি হতে পারব না কখনও?

···একবার শ্বশুরবাড়ি একবার বাপের বাড়ি। টানাপোড়েনে পড়েছি আমি। মায়ের শরীর বড় তাড়াতাড়ি ভাঙছে। জ্যাঠামণির বার্ষিক-কাজ হবার আগেই ডাক্তাররা ভয় পেয়েছে। আর বুঝি ধরে রাখা যাবে না। সে ফাঁড়া কেটেছে মানে মানে।

জেঠিমারও দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না।—কাজকর্ম না পণ্ড হয় শেষে! কেনাকাটায় এক কাঁড়ি গেছে একে। সমস্ত বরবাদ হয়ে যাবে। মানইজ্জতের ব্যাপার। ছোটবৌ এমন ফ্যাসাদে ফেলবে কে জানত আগে! জানলে, দিন পেছিয়ে দেওয়া যেত না হয়।

জেঠিমা ক'দিন ধরে খুব যত্নে রেখেছে মাকে। ফলের রস গ্লুকোজ আর ওষুধ ইনজেকশনে বাঁচিয়ে রাখতে হবেই। নার্স রেখেছে, মায়ের প্রাণবায়ু না বেরিয়ে যায় চট করে। নিয়ম করে খাওয়াতে আর লক্ষ্য রাখতে নার্সের পায়ে ধরে আর কি! ডাক্তারদের তো ভগবানের স্তুতি।—আপনারা আমাদের ভগবান। সব পারেন। বাঁচিয়ে রাখুন অন্তত ক'টা দিন।

মায়ের শুকনো মুখে হাসির নির্যাস এসে এত জমল কেমন করে! হেসেছে, দিনরাত হেসেছে। ঘুমিয়ে না পড়া অবধি। চোখ চেয়েও হাসি, চোখ বুজেও হাসি। অনবরত হাসির গোলাপী রঙ পাতলা ঠোঁটে মাখানো।

মায়ের উত্থানশক্তি রহিত হয়ে পড়তে জেঠিমা মাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল। মা চায়নি যেতে। নিজের জ্বালা নিয়ে ভায়েদের জ্বালানো কেন?

আমার মামার বাড়ির দুরবস্থার সীমা-পরিসীমা নেই। মা গরীব ঘরের মেয়ে। মামারা দিন আনে দিন খায়। মামারা বনেদী বংশের ধ্বংসস্তূপ। সুন্দরী দেখে ঠাকুরদা বৌ করে ঘরে এনেছে। মা আসার পর ঠাকুরদার লোহার ব্যবসায় আকাশছোঁয়া বাড়বাড়ন্ত হয়েছে নাকি! ঠাকুরদা মাকে মা-লক্ষ্মী বলেই ডাকত। যদিও মায়ের অন্য নাম ছিল। স্নেহময়ী।

গরীবের ঘরের মেয়ে বলে জেঠিমার তরফ থেকে অনেক বিদ্রূপবাণ

এসে বিঁধে বিঁধে ক্ষতবিক্ষত করেছে মাকে। —আমাদের রাজা বাপ, বাড়ি রাজপ্রাসাদ। বংশের নাম শুনলে, বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। শ্বশুরের বুদ্ধি বলিহারি! আমার পাশে ছোটবৌ! এ যেন হীরের পাশে কাঁচের টুকরো। উনি আমাতে-ওতে সমান করতে চেয়েছেন। কাঁচ যদি হীরে হ'ত, পেঁচা যদি কোকিল হ'ত—তাহলে তো আর ভাবনা থাকত না। সকলেই কোকিলের সাধ মেটাত পেঁচা পুষে।

জ্যোতিষীরা বলেছিল, মা নাকি সুখে মরবে। সুখে ম'ল, কি দুঃখে ম'ল—মায়ের মৃত্যু দেখে বোঝা গেল না কোন কিছু। যারা মায়ের বিষয়ে জ্যোতিষীর বচন শুনেছে—অনেক বুড়োবুড়ি—দূর-সম্পর্কের আত্মীয় মাকে দেখতে এসে বলেছে, জ্যোতিষীর গণনা ধ্রুব-সত্য দেখা যাচ্ছে। বৌমার হাসিমুখই তার প্রমাণ। আর রাজরানীর সেবাশুশ্রূষা চলছে। ভাগ্য বটে।

জ্যাঠামণির বার্ষিকী শেষ হয়ে যাবার দিনচারেক বাদে মা-ও শেষ হয়ে গেছে। সকলের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েছে। ফুলে ফুলে খাট সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শ্মশানে। জেঠিমার এই রকম নির্দেশই দেওয়া ছিল।—ছোটবৌ পুণ্যাত্মা—এয়োতির চিহ্ন মাথায় নিয়ে কেমন সবাইকে কলা দেখিয়ে দর্পের সঙ্গে ড্যাঙডেঙিয়ে চলে গেল।

জেঠিমা মাথা চাপড়ে কেঁদেছে, হায়, আমার পোড়া কপাল! ঠাকুরপোর যা চেহারা হয়েছে, ওকে নিয়ে আমার বড় ভয়।

জোড়হাত করে শূন্যে দৃষ্টি মেলে বলেছে, ঠাকুর, আর যেন কারো কিছু দেখতে না হয় আমায়। তার আগে তুলে নাও।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকেবুকে যাবার পর বাবাকে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়ার জন্যে জিদ ধরল জেঠিমা। —ঠাকুরপো, তোমায় খুলে বলতে আমার কোন বাধা নেই। তুমি ছাড়া মনের কথা কষ্ট কাকে আর বলি! বুঝবে কে?

—রোজ রাতে স্বপ্ন দেখি, মা ডাকছে তোমায়, তোমার দাদাও

ডাকছে। ঘুম ভেঙে বুক ধড়ফড় করে মরি। গলা শুকিয়ে কাঠ। অথচ সর্বশরীর ঘামে ভিজে জবজবে। কোনদিন সকালে উঠে শুনবে, বৌদি হার্টফেল করে, মরে পড়ে রয়েছে।

বাবা বলেছে, বৌদি, এসব কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না।

—রোজই যে আমার এই জ্বালা হয়েছে ভাই। চোখেপাতায় এক করতে পারছি নে মোটে। যেই দু'চোখ বুজেছি, একটু ঘুম এসেছে সবে—অমনি ওই স্বপ্ন। আমি পাগল হয়ে যাবো ঠাকুরপো। তুমি বাঁচো, তুমি বাঁচো। এখান থেকে সরে গিয়ে অন্তত প্রাণে বাঁচো। মা-বড়বাবু মরে গিয়েও যেরকম পেছনে লেগেছে—তোমায় বাঁচতে দেবে না কিছুতেই। আমি গুণিন দিয়ে গুণিয়ে দেখেছি, প্রেতাত্মার কোপ-দৃষ্টি তোমার ওপর।

—আমার মরণ-বাঁচন যাই হোক—তুমি ভেব না। তোমার আর কিসের মোহ ভাই এ বাড়ির ওপর! আপনজন তো সবই চলে গেল এক এক করে। তুমিটা তো এখন পরগোত্রের, পরের বাড়ির। দোহাই ভাই, তুমি না হয় বাইরে গুরুর আশ্রম-টাশ্রমে গিয়ে থাকো। এমন নির্লিপ্ত পুরুষ, বংশের গৌরব তুমি। তুমি সন্ন্যাসী। এ প্রেতাত্মার পুরী তোমার বসবাসের নয়।

—তোমায় ছাড়তে আমার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু না ছাড়লে যে রক্ষে করতে পারবো না। জেঠিমার চোখে' পাতা বেয়ে দেশজোড়া বন্যার জল উপচে পড়তে লাগল।

চিরকাল শুনে আসছি কান্না সংক্রামক। কাউকে কাঁদতে দেখলে, আমার অজান্তেই চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। আমার অবস্থা বাবার হতেও তো দেখেছি। জেঠিমার চোখের জল আমার চোখেও টলমল করছে।

কিন্তু বাবার চোখে হাসির উজান। চোখে হাসি ঠোঁটে হাসি, মুখময় হাসি। বাবা সান্ত্বনা দিল জেঠিমাকে।—ভয় নেই। আশ্বাস দিল, তুমি যেটা বলছো ঠিকই। জীবনের ওপর লক্ষ্য রাখার লোকও তো পৃথিবীতে বেশী নেই। হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমে। আমার ভাগ্য

ভালো, তুমি আছো। তুমি বেঁচে থাকো। গুরুদেবের ওখান থেকে শীগগির চিঠি আসবে। ওখানেই চলে যাবো আমি। নিশ্চয়ই যাবো। তোমার ইচ্ছে আমি মাথা পেতে নিয়েছি। পূর্ণ হবেই।

গোপনে জিজ্ঞেস করেছি বাবাকে—গুরুদেব চিঠি দেবেন, জানলে কেমন করে?

বাবা বলেছে, আমার মন বলছে রে তুষার।

সত্যি সত্যিই চিঠি এসেছে দিন দশেকের মাথায়।

—হরিদ্বারে কুম্ভমেলা। গুরুদেবের আস্তানা বানানো হচ্ছে তাঁবু ফেলে। বাবা পত্র পাবার পরই দেরী না করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে যেন, অতি অবিশ্যি চলে আসে।
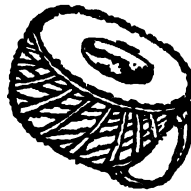
বাবার সঙ্গে এসেছি হরিদ্বারে আমিও।

মন চায়নি একা ছেড়ে দিতে। শ্বশুরবাড়ির মত নিয়েই আমার আসা। কোথাও যাবার আদেশে শ্বশুর-শাশুড়ী আমার অমায়িক। বাবাও অরাজী হয়নি। জানে আমার মনের অবস্থা। এই বয়েসে অনেক বয়েস পেরিয়ে এসেছি আমি, নানান অভিজ্ঞতার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে।

সংসারের কুটিল চক্রের ঘায়ে ঘায়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে বহু আশা বহু আকাঙ্ক্ষা। ধারণাতে ছিল না যা, স্বপ্নেতে ভাবিনি যা, তাই দৌড়ে দৌড়ে এসে সজোরে এক একটা করে ধাক্কা মেরেছে বুকে। হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। হরিদ্বারে এসে নতুন পরিবেশ, নতুনের স্বাদ আমাকে অন্য মানুষ করে তুলেছে।

চতুর্দিকে সাধুসন্তদের তাঁবু, তিনদিকে পাহাড় ঘেরা। শাঁখ-ঘণ্টা বাজছে, আরতি হচ্ছে। স্তোত্রগান বাতাস ফুঁড়ে কানে এসে

বাজছে। ধুপ-ধুনো গুগ্‌গুলের সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে গঙ্গার জলে নীলধারায় আর ব্রহ্মকুণ্ডে।

ব্রহ্মকুণ্ডের পুবদিকে নীল পর্বতের নীচে দিয়ে নীলধারা বয়ে চলেছে—গঙ্গাই অন্য নামে। নীলধারা আর গঙ্গার মাঝখানে রোড়ী। রোড়ী দিয়েই সাধুসন্তরা এসে ব্রহ্মকুণ্ডে পূর্ণকুম্ভের স্নান সারবে। রোড়ী আর ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যিখানে গঙ্গার ওপরের সেতু দিয়ে এসেও ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করবে অনেকে।

ভীড়ে ভীড়।

কত দেশের কত ভাষার কত প্রকৃতির লোকজনে ভরে গেছে এই তীর্থস্থান। দেশের ভেদ নেই, জাতের বালাই নেই। একই জলে সকলে একাত্মা হয়ে যাবে। হয়ে যাবে ভাই ভাই—এক বিশ্বপিতার সন্তান। চানের সঙ্গে সকল ভেদাভেদের মুক্তি হয়ে যাবে। মানুষ হয়ে উঠবে পূর্ণ শুদ্ধ মুক্ত সুন্দর।

গুরুদেবের তাঁবুতে বসে বসে ওঁর মুখ থেকে এই অমরবাণীই শুনছি। শুনছি, কুম্ভস্নানের প্রবর্তনের ইতিহাস।—সপ্তম শতকে রাজা হর্ষবর্ধনের আমলে হিন্দু-বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মিলন-সম্মেলন শুরু হয়। হর্ষবর্ধনই শুরু করেন প্রয়াগে। ছ' বছর অন্তর অন্তর এই সম্মেলনে যোগদান করত নানা দেশের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়।

ইতিহাস বলে, এই সম্মেলনের পরেই পুরাণের কুম্ভমেলার প্রচলন হতে থাকে বেশি করে। তিথি-নক্ষত্র-রাশির মিলনে বারো বছর পর পর পূর্ণকুম্ভ মেলা হরিদ্বারে। চৈত্-সংক্রান্তিতে বৃহস্পতির কুম্ভরাশি আর রবির মেষরাশিতে মিলনই পূর্ণকুম্ভ স্নানের মহাক্ষণ। প্রথম স্নান শিবরাত্রে—দ্বিতীয় চৈত্-অমাবস্যায় আর তৃতীয় বা প্রধান মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে—চৈত্-সংক্রান্ত।

—বারো দিন দেবাসুর যুদ্ধে সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উঠেছিল, সেই অমৃত ভরা কলসীকে যে চার জায়গায় রাখা হয়েছিল, তারই একটি হরিদ্বার। শোক জরা ব্যাধি মৃত্যুর ওপরে অমৃত্যু—অমৃত। অমৃত-লাভ অমর জীবনের সন্ধান পাওয়াই নিজের মধ্যে পূর্ণকে পাওয়া।

নিজে পূর্ণ হয়ে ওঠা।

গুরুদেব পূর্ণকুম্ভের ধ্যান বলেছেন!

—মাথার ওপর পূর্ণিমার চাঁদ, স্নিগ্ধ জোছনা ঝরে পড়ছে। মাথা কণ্ঠ হৃদয় নাভি—মেরুদণ্ডের শেষ সীমানার পর অবধি চাঁদের আলোয় গড়া ঘট। সেই ঘটে মাথার চাঁদের মধ্যিখান থেকে শুভ্র জ্যোতিবিন্দু ঝরে পড়ছে—টপ টপ টপ…। একদম মেরুদণ্ডের শেষ সীমানার পর রজতশুভ্র শিবলিঙ্গের মাথায় পড়ছে। ওই শিবলিঙ্গ আমি হয়ে যাচ্ছি। আবার আমার মাথায় পড়ছে জ্যোতি-বিন্দু। দেহকুম্ভ ওই শুভ্র-জ্যোতিবিন্দুতে সিক্ত হয়ে ভরে উঠলো। ওই জ্যোতির সায়রে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে চান করছি আমি।

এই জ্যোতির্ময় দেহে নেই কোন মলিন ছোঁয়া। নেই কোন প্রবৃত্তির তাড়না, নেই কোন অন্ধকার রাজ্যের কালো ছোপ। আছে শুধু মৃত্যুহীন আনন্দের সুতোয় সারি সারি জ্যোতিবিন্দুর মালা গাঁথা। এটা আত্ম-কুম্ভ স্নান। জীবভাবের মুক্তি, দেবভাবের আর্বিভাব। কুম্ভে জলে ডুব দিয়ে স্নান না করলেও, ভেতরের কুম্ভ-জ্যোতিতে মনকে স্নান করাতে পারলেই মনের মুক্তি, মনের লয়।

গুরুদেব হেসে বললেন, জলও মানুষের জীবন। নদীও জীবনী-শক্তি, প্রাণশক্তি। বিশেষ তিথি-নক্ষত্রে সে জলও বিশ্বপ্রাণের ছোঁয়া পেয়ে অমৃত হয়ে ওঠে মুহূর্তে। কিন্তু সেই ভাবটাকে ধরে রাখাই সার্থক স্নান।

রাত্রির শেষ প্রহর।

মশালের আলো নিয়ে এগিয়ে আসছেন নানা সন্ন্যাসীরা। নিরাবরণ দেহ, মাথায় জটা, অঙ্গে বিভূতি। তরুণের দেহে নিষ্পাপ শিশুরা চলেছে ব্রহ্মকুণ্ডের পুণ্যস্নানে। কারও হাতে ভালা-দেবতা —বল্লম—শক্তির প্রতীক। শক্তিকে স্নান করানো হবে প্রথমে। শত্রুজয়ে এই শক্তিই একসময় হাতিয়ার ছিল সন্ন্যাসীদের। ঘোড়ার

পিঠে দু'টি জয়ঢাক বাজাতে বাজাতে আসছেন নাগা সন্ন্যাসী। আসছেন জরির ঝলমলে বিজয় পতাকা নিয়ে একজন সন্ন্যাসী। আরো একজন গেরুয়া পতাকা নিয়ে।

এবার নকল যুদ্ধের ঘোড়সওয়ার আর পদাতিকদের মহড়া নিতে নিতে আসছে সন্ন্যাসীরা। আখড়ার নাম লেখা নিশান বাতাসে কেঁপে উঠছে। কাড়া-নাকাড়া—যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠছে। ত্যাগের গেরুয়া পতাকা নিয়ে হাতীর ওপরে সন্ন্যাসী। জরিদার মখমলের বড় বিজয় পতাকা হাতীর ওপর ধরে বসে আছেন সাধু-মহাত্মা।

সন্ন্যাসীদের গেরুয়া বসন পরনে। সোনা-রূপোর লাঠি হাতে এগিয়ে চলেছে ব্রহ্মকুণ্ড লক্ষ্য করে। ধূপধুনোয় ভরতি ধুনুচির ধোঁয়া বাতাসে মেশাতে মেশাতে এগিয়ে আসছেন সাধুরা। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করছেন ব্রাহ্মণপণ্ডিত। চামর দোলাচ্ছেন, চন্দন ছড়াচ্ছেন।

রূপোর-সোনার পাল্কী, ভেতরে ফুলের সাজে সাজানো সন্ন্যাসীদের ইষ্টদেবতা—সূর্য গণেশ গায়ত্রী গজানন দত্তাত্রেয় কার্তিকস্বামী কপিলমুনি। পাল্কীর দু'পাশে দু'জন চামরের বাতাস করছেন দেবতাদের। পাল্কী চলেছে ধীরে ধীরে।

আর একদল নাগা সন্ন্যাসী আসছেন। গেরুয়া পরা। অবধুতরা আসছেন, আসছেন ব্রহ্মচারীরা। হাতী চলেছে পাল্কী চলেছে, জরিদার ছাতার নীচে বসে রয়েছেন আখড়ার আচার্যদেব। আচার্যদেবের দু'পাশে চামরের বাতাস দুলে উঠছে।

লাঠি হাতে রক্ষক-সন্ন্যাসী। আবার দিগম্বর—নাগারা। অবধূত ব্রহ্মচারী জুনাগড়ের সন্ন্যাসিনী—অবধূতানীরা।

গুরুদেবের পেছু পেছু বাবা আমি—আমরাও চলেছি ধীরে ধীরে।

এত লোক এত নিশ্বাস তবু মনে হয়েছে, আমি একা, শুধু আমারই নিশ্বাস পড়ছে। আগে থাকতে শুনে এসেছি বলে কিনা জানিনা, ব্রহ্মকুণ্ডের জলকে ত্রিতাপ শান্তির জল মনে হয়েছে। শোনার প্রভাব বিস্তার করুক আর না করুক, এই মুহূর্তে আমার

দেহ-মনের শত সহস্র বিষের জ্বালা জুড়িয়ে যাচ্ছে। একেই কি মুক্তি বলে ? জানিনা। জানি কেবল আমি খুব পেয়েছি, খুব শান্তি পাচ্ছি। মনে মনে প্রার্থনা করছি, ব্রহ্মকুণ্ডের জল দু'হাতে অঞ্জলি ভরে নিয়ে, আজকের এই ক্ষণের শান্তি যেন আমি চিরকাল পাই। পায় যেন বাবা, পায় যেন প্রত্যেক মানুষ। প্রার্থনার শেষের ক'টা কথা কে যেন আমার ভেতর দিয়ে ভেতরেই বলাল।

বাবার মুখ স্বর্গসুখের প্রশান্তিতে ভরে গেছে। গুরুদেবের পুণ্য-সরল হাসি।

চান সেরে বুকভরা অনাবিল আনন্দ নিয়ে ফিরে এসেছি তাঁবুতে। ভজন চলছে, ভাণ্ডারা চলছে। সাধু-সন্ন্যাসীরা সেবা করছেন, সেবা নিচ্ছেন।

আমি খাবো কি ! ভজনের কলিটি আমার পেট ভরিয়ে রেখেছে। হাতে করতালি বাজিয়ে মধুরকণ্ঠে দু'চোখ বুজে ভাবময়ী মহিলা গাইছেন—প্রভু, তুম বিনা ম্যাঁয় পল না রহাউ···। প্রভু, তুমি হৃদয়ে তুমি মনে তুমি প্রাণে। তুমি ছাড়া এক মুহূর্ত আমি নই। আমি থাকতে পারিনা···।

যে ক'টা দিন তাঁবুতে থেকেছি, অমরালোকেই থেকেছি। বাবার শরীর আগের তুলনায় অনেক সুস্থ-সবল, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। আমার খুব থাকার ইচ্ছে, ফেরার ইচ্ছে চলে গেছে মন থেকে। গুরুদেবের কথায় অভিমান হয়েছে। বাবাকে রাখতে চাইলেন উনি। বললেন, এবার তোর বাবার জীবনে আর এক রাজ্যের লীলা-খেলা চলবে—সেটা শান্তির। অঘোর যাবেনা, যেতে চাইলেও আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারব না। ছেড়ে দেবো না।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, কেন ?

—দুর্ভোগের অঙ্কে যবনিকা পড়ে গেছে ওর। তোর কি ইচ্ছে—আবার ফিরুক ? তুই-ই বল না।

জেঠিমার কথা মনে পড়েছে, সংসারের নির্যাতন মনে পড়েছে। বড় বিভীষিকার দুনিয়া দেখেছি আমি ও বাড়িতে। আমার গলা

থেকে একটা ভয়মাখানো আর্তস্বর বেরিয়ে এলো—না, না, না, আমি তা বলিনি। এখানেই থাকুক বাবা। শুধু একটা অনুরোধ, আপনি আমায় আমার কথা খুলে বলুন। বাবার মতো আমার কি দুর্ভোগের নাটকের যবনিকা পড়েনি এখনও? আমায় ফিরিয়ে দেবেন বলছেন, লোকের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন বলছেন!

গুরুদেবের হাসিমুখ আনমনা। কোথা থেকে একটু ঘুরে এসে, কিছু দেখে এসে যেন বললেন। আমার চোখে চোখ রেখেই বলেছেন, সময় আসেনি এখনও, এখনও দেরী আছে।

সেই সময় আসেনি, সেই দেরী আছে, আর শুনতে পারছিনা আমি। এ-তো শুনেছি আগেও। সকলের সময় হচ্ছে। আমারই সময় না এগিয়ে পেছিয়ে যাচ্ছে কেবল। জিদ অভিমান আবার পেয়ে বসল—আদুরে মেয়ের মন অনাদর তাচ্ছিল্য ভেবে। ঠিক আছে, যত দুঃখু-কষ্ট আসুক, আমি মাথা পেতে নেবো। আমি যুদ্ধ করব, আমি এদের দেখিয়ে দেবো এরা কত অকরুণ।

গুরুদেবকে বললুম, আপনি আমাকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।

বাবা কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, তুষার, বড্ড অভিমান তোর! আমি ঠোঁট ফুলিয়ে বললুম, থাক, অভিমান নিয়েই যেন আমি মরি। আর কাউকে কিছু বলতে হবেনা আমায়।

একটু জোরেই বললুম আমি, বাবা, জেঠিমার কি জয় হল না এতে? জেঠিমা চেয়েছিল তুমি বাড়ি থেকে চলে যাও, তারই মনস্কামনা পূর্ণ করলে শেষে! এটাও বুঝতে পারলে না! মৃদু হেসে বলল বাবা, সবই জানি, সবই বুঝেছি পাগলী। তোর জেঠিমা যে সাধনা নিয়েছে, তার সিদ্ধিলাভ হয়েছে। তার সিদ্ধিলাভ হোক। কেন মিছিমিছি আমি বাধা হয়ে থাকব? যা পেতে চেয়েছে, তা পেয়েছে। আমি ওসব চাইনি কখনও, আমি যা চেয়েছি, তা পেয়েছি। মন খারাপ করিস নি তুষার। গুরুদেব যা বলেছেন, মনে রাখিস।

আকাশের মেঘ চোখে নেমে আসে যখন, যত বোঝানোই হোক না কেন, তার কাজ সে করে যাবেই। চোখে বৃষ্টি নেমেছে আমার।

সে বৃষ্টি রাস্তা ট্রেন কলকাতা হরিপাল—শ্বশুরবাড়ি অবধি চলেছে থেকে থেকে।

মা হতে চলেছিলুম আমি। এবার মা হলুম সত্যি সত্যি। প্রথমেই তো বলেছি, পরিণত আমার মন। পনেরো হলে কি হবে, সৌরভের মুখ দেখে মনে মনে আমি পঁচিশে পড়েছি। শ্বশুরবাড়ির অবস্থা অভাবের ঝড়ে ভেঙে পড়ছে আরো দিন দিন। আমার ভাবনা কেবল সৌরভকে নিয়ে। এই দুখের শিশুকে কেমন করে বাঁচাব আমি! যেটুকু আয়, সেটুকু নিয়ে কলকাতায় পৌঁছুনোই স্বামীর দায়িত্ব। স্ত্রী-পুত্র মরুক বাঁচুক, মা-বাবা থাক না থাক—এ-দায়িত্ব তার নয়, ঈশ্বরের।

একটা শান্তি পেয়েছি আমি জীবনে। শ্বশুর-শাশুড়ী আমার শ্বশুর-শাশুড়ীরই মতো। ভালোবাসা দিয়ে মমতা দিয়ে সহানুভূতি দিয়ে দিবারাত্র ঘিরে রেখেছেন। এদের জন্যে আমার কম মনঃকষ্ট নয়। কিন্তু সমুদ্রপ্রমাণ অভাবে আমি তো একটা শিশিরকণা মাত্র। রতনবাইয়ের গয়নার দ্বিতীয় সেট আমার দারুণ অভাবে পার করার তরী। যত্নে রেখে দিয়েছি।

শ্বশুর-শাশুড়ীকে দিতে চেয়েছি অনেকবার। ওঁরা এ গয়না—আংটিটা পর্যন্ত নিতে চান নি। বলেছেন, বৌমা, একটা সেট তো দিয়েছই। আর কেন! ওটা থাকুক অন্তত। অদৃষ্টে যা আছে হোক। আমরাও তো তোমাকে কিছু দিতে পারিনি। ছেলেটাও তো মানুষ হল না, কিছুই বুঝল না। একটা কিছু হলেও বুঝতুম। গুণ্ডা-বদমাইস হয়ে গেলেও, তবু একটা কিছু হয়েছে। নিজের দেহের শক্তিটা অন্তত বৃদ্ধি করেছে। এ যে তাও নয়, একেবারে অপদার্থ। না ঘরের না পরের।

শাশুড়ী বলেছেন, বৌমা, যে ভুল করেছি, তোমাকে খুলে না বললে আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। বাউণ্ডুলে ছেলেকে ঘরবাসী করবো বলেই রূপেগুণে—এমন পয়মন্ত মেয়েকে এনেছিলুম। ভুল করেছি। নিজের ছেলেকে ফেরাবার জন্যে তোমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছি বৌমা। ক্ষমা চেয়ে তোমাকে বিব্রত করতে চাইনি। চাইতে পারলে, তোমার মুখ দিয়ে 'করেছি' বেরোলে—ম'লেও আমার শান্তি হ'ত। আমি যা করেছি, এ যে নরকেও স্থান হবে না আমার।

সুখেদুখে কাটছিল একরকম। বড় ননদ এসে শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিয়ে গেল। আর রাখা যায় না এ দুরবস্থায়। বড় ননদরা অবস্থাপন্ন। শাশুড়ী আমাকে ছাড়তে চাননি, সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। সৌরভের বাবা বাধা দিয়েছে। মা-বাবা যাচ্ছে মেয়ের বাড়ি, এতে মান-অপমানের কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আমার স্ত্রী যাওয়া মানে, আমার সমস্ত আত্মসম্মান নষ্ট হয়ে যাওয়া। জান দেবো, তবু মান দেবো না।

দুঃখের ওপরে হাসি। শাশুড়ী আড়ালে ডেকে বললেন, বৌমা, পাতা চাপা বরাত হলে হাওয়ায় উড়ে ভালো ভাগ্যই বেরিয়ে পড়ে। দ্যাখো, এবার বুঝি তে'ার বরাত সুপ্রসন্ন। ছেলে আমার জেগে উঠেছে হয়ত। ইজ্জতজ্ঞান এসে গেছে যখন, তখন দায়িত্ববোধও আসবে। বরাবরই তো বলে, কলকাতায় কাজ খুঁজছি, ব্যবসা করব —হয়ত একটা কিছু কিনারা হয়েছে। তা না হলে আত্মসম্মানটা আসে কোত্থেকে ?

বুক মোচড়ানো নিশ্বাস ফেললেন শাশুড়ী।

—দেখা যাক, শিব কালী শ্রীকৃষ্ণ কাউকে তো মানত করতে বাকি থাকেনি। না রেখেছ তুমি, না রেখেছি আমি। দেবতাদের কৃপা হলে সব কিছুই সম্ভব। কানার দৃষ্টি ফিরে আসে। বোবার বোল ফোটে।

কানার দৃষ্টি ফিরে আসে কিনা আমার জানা নেই। বোবারও বোল ফোটে কিনা তাও আমার দেখা নেই। মানতের লোভে

দেবতাদের মন টলেনি। ওরা নির্বিকার ওরা নিস্পৃহ। জানিনা আমার বেলায় এই ভাব কিনা।

পাতা চাপা বরাত আমার নয়, বরাত পাথর চাপা।

মন্দিরসুদ্ধ দেবত্তরচত্বর বাদ দিয়ে ভদ্রাসনটুকু পর্যন্ত স্বামী বেচে দিল তড়িঘড়ি। কলকাতায় নিয়ে এসে উঠল। হাত পড়ল আমার গায়ের গয়নায়—রতনবাইয়ের গয়না। আমার দু'হাতে লাল কাঁচকড়ার রুলি সার। সোনার রুলির প্রতিশ্রুতি প্রতিদিনই দিয়ে চলেছে স্বামী। সৌরভের সোনার হার রূপোর মল আসবে। এ আশাও রোজ পাচ্ছি। তিন বছরের দামাল ছেলে ভাড়াবাড়ি ভাড়াঘর তোলপাড় করে তুলেছে। উঠছে পড়ছে, জিনিস ভাঙছে। কাঁদছে হাসছে, চীৎকার করছে।

কোথা থেকে টাকা আসবে, কারবার কি কাজ কিছুই বলেনা সৌরভের বাবা। আমি জিজ্ঞেস করিনি. জিজ্ঞেস করতে মন চায়ও নি।

অবাক হয়ে গেলুম একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে। ঘোড়ার ছবি আঁকা ছোট্ট বইখানা বুকে নিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল আমার সংসারের কর্তা। ঘোড়ার পেছনে ছুটে ছুটে টাকাকড়ি বুদ্ধি সবই ছুটে গেছে বাইরে। ছড়িয়ে গিয়ে জমা হয়েছে নিজের কাছ থেকে অন্যের সিন্দুকে।

দুর্গতি সইতে হয়েছে আমায় অনেক। বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ার জন্যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। দাসীবৃত্তিও করতে হয়েছে। রাতারাতি বড়লোক হবার জন্যে যক্ষিণী-সাধনায় স্বামী আমায় যক্ষিণীর ভূমিকায় অভিনয়ে নামিয়েছে, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও। কেমন করে যক্ষিণী সাজানো হ'ত আমায়, সে কথা তো আগেই বলে গেছি।

এরপর আমার গৃহত্যাগ। পথে দুর্ঘটনার মুখোমুখি কামাখ্যার তীর্থনাথ আর কিরণশশীর সঙ্গে দেখা…।

…তিব্বতের শ্রীঅর লামার কথা বলতে গিয়ে আমার বাবার কথা এসে গেছে। এসে গেছে ছোটবেলার অনেক লাল নীল সবুজ কালো রঙের দিনের কথা।

তিব্বতের কথায় আবার ফিরে আসছি আমি।

বিদায় চেয়েছিলুম শ্রীঅর লামার কাছে। বাবার মতো এত ক্ষমা সহ্য করতে পারছি না আর আমি। আমি চলে যাবই, বিদায় দেন নি লামা। আমার হাত ধরে নিয়ে গুম্ফার দিকে এগিয়ে চলেছেন।

হাতটা জোরে টেনে সরিয়ে নিলেন রাস্তার এ ধারে। বললেন, অবাক হলে কি হবে! কিছু কি দেখতে পেয়েছ, কিছু কি বুঝতে পারছ?

বিচিত্র মানুষের বিচিত্র কাণ্ডকারখানা। লামাকে নিয়ে অনেক অভিজ্ঞতাই আমার হচ্ছে. আমি চুপ করেই রইলুম। মনে মনে বললুম, না। চেয়ে রয়েছি। লামা অন্যের মনের কথা নিজের মনে শোনেন। অন্যের চোখের তারায় তার মনের কথা পড়ে নেন। কাজে কাজেই মুখে আর কিছু আমি উত্তর দিলুম না। আমিও চেয়ে রইলুম।

দূরে আঙুল দেখিয়ে লামা বললেন, আঙুলের নিশানা ধরে ত্যাখো, দেখতে পাবে। চোখকে আলসে করে রেখ না। দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দাও, কাছ থেকে দূরে। দৃষ্টির সঙ্গে মনকেও পাঠিয়ে দাও। অনেক দূরের জিনিস অনেক কাছ থেকেও দেখতে পাবে তখন, ত্যাখো।

আমি দেখলুম, পাশাপাশি নয়, পর পর তিনটে হলুদ রঙের খুব ছোট্ট বিন্দু দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে।

লামা আমাকে বললেন, তোমার কি মনে হয় ওই বিন্দু তিনটের প্রাণ আছে? প্রাণ না থাকলে আসছে কেমন করে? মনে হয় কি

বিন্দু না আর কিছু? যাই হোক, সেও বা তুমি বুঝবে কি করে? তুমি জানোনা. আগে ত্মাখোনি। তোমার জীবনে এই প্রথম দেখা, প্রথম জানা হবে।

কৌতূহল উৎকণ্ঠা আনন্দ আমাকে অস্থির করে তুলছে। কি দেখব কি জানব, কি বুঝব।

হলুদ বিন্দু তিনটে প্রায় মাঝ বরাবর এগিয়ে এসেছে। লামা আমাকে রাস্তার ধার থেকে আরো পেছনে সরিয়ে দিলেন। কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বললেন, ওরা কাছে এসে পড়ল বলে। ভয় পেওনা, আশ্চর্য হয়ো না, আবেগের বশে মুখ দিয়ে যেন কোন শব্দ বেরিয়ে না আসে, নিজেকে সংযত রাখবে। নিশ্বাসের আওয়াজ পর্যন্ত যেন না শোনা যায়। গেলে সর্বনাশ অনিবার্য, কেউ রুখতে পারবে না। তিন তিনটে শুদ্ধপ্রাণ দেহ ছেড়ে যাবে তখুনি।

এমন কথা জীবনে শুনিনি। এরকম বিপদে পড়তে হয় জানলে কে আসত তিব্বতে, আমার বুক ঢিব ঢিব করছে। গাঁয়ের ঢেঁকি পড়ছে যেন। তিনটে শুদ্ধপ্রাণ দেহ ছেড়ে যাবার আগেই আমার প্রাণ যাবার দাখিল। দরকার নেই আমার সাধনভজনের। বুঝতে পারছি এখন একথা মনে এনেও লাভ নেই। কেন তিব্বতে এসেছিলুম জানিনা। তীর্থনাথকে জেনেছিলুম অত বড় মিত্র আমার নেই। এখন দেখছি, আমার এই বিপদের মূলকারণ একমাত্র উনি। উনি না পাঠালে আজ এই ভয়াবহ, অবিশ্বি আমার কাছে, পরিবেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন অস্থির হয়ে পড়তুম না। এ যেন আমারই জীবনমরণ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত।

এদেশে একটার পর একটা রহস্যেঘেরা পরদা দেওয়া এক একটা গোপন ঘটনা এর আগে আমার চোখে পড়েছে। দেখার পরে ভয়ও ধরেছে। সে ভয় লামাই কাটিয়েছেন, সামলেছেন আমাকে।

এবারে স্বতন্ত্র ব্যাপার। আগে থাকতেই লামার কথা শুনে ত্রাসে আমার সর্বশরীরে কাঁপুনি। লামা বুঝতে পেরেছেন। উনি আমার কব্জিটায় জোরে চাপ দিলেন। ওঁর মোটা মোটা আঙুলের স্পর্শে

আমার কব্জির শিরা-উপশিরায় অদ্ভুত শিহরণ জেগে উঠল একটা। একটা শান্ত-সংযত মন যেন চলে এলো আমার মনে। থামল কাঁপুনি। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ভয়ের ছায়া। আমার নিশ্বাস পড়ার আওয়াজ আমি শুনতে পাচ্ছিনা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, আর দেখছি।

অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখছি! দেখছি, তিনটে বিন্দু নয়, তিনজন হলুদ টুপি হলুদ আলখাল্লা পরা লামা। মনে হচ্ছে, মাটিতে পা পড়ছে না। বাতাসের বেগে বাতাসে ভেসে ভেসে চলেছেন ওঁরা। চক্ষের নিমেষে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। আবার দেখছি তিনটে বিন্দু। দূরে দূরে—আরো দূরে চলে যাচ্ছে। অদৃশ্য হয়ে গেল।

আশ্চর্য জিনিস দেখার যে কি আনন্দ—তা আমি পেয়েছি। তীর্থনাথকে মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়েছি। আপনি আমার অতি-মিত্র। তিব্বতে না এলে এ দেখার সৌভাগ্য আমার হ'ত না। লামাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মনে মনে—অপার করুণা আপনার। জানাচ্ছি বাবার গুরুদেব আত্মানন্দকে। কত না অভিমান করেছিলুম তখন, যখন বলেছিলেন তিনি, সময়ে হবে দেরী আছে। আমার সময় হয়েছে কিনা জানি না, কিছু হয়েছে কিনা বুঝতে পারছিনা। তবে এই জগতের আর একটা জগত, আর সেই জগতের মানুষরা যে ঘোরাফেরা করে কত আশ্চর্যভাবে—সেটা জানার দেখার সময় যে এসে গেছে, এটা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছি।

গুম্ফায় ফিরে এসে লামা আমায় বললেন, এত দ্রুত, যেন বাতাসে ভেসে আকাশে ভেসে চলেছে—এটা যোগসাধনার কুম্ভকের ফলে। দেহ খুব হালকা হয়ে যায়। এসাধনার ক্রিয়াকলাপ শেখা বেশ সময়-সাপেক্ষ। তাছাড়া একটু কঠিনও বটে। একটু জোরে আওয়াজ কানে বাজলে, বাজপড়ার আওয়াজ শুনে, হৃৎপিণ্ডের শব্দ বন্ধ হয়ে যেতে পারে মুহূর্তে। এর চেয়ে বরং ধ্যানেতে নিজেকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া ভালো। দূরের 'জিনিস দেখে ফিরে আসা যায়,

শোনা যায় দূরের কথা। যাকে বলে দূরদর্শন, দূরশ্রবণ।

মনে মনে ভেবেছি আমি, আমি তো এদেশের নয়। তাই বুঝি লামা নিজেদের গোপন-সাধনা কিছু শেখাতে চান না। কঠিন সাধনার ভয় দেখিয়ে সহজ ধ্যানধারণা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চান।

গুহার ভেতর যোগসাধনার আর যোগীদের হাতে আঁকা অনেক সুন্দর ছবি ঝোলানো। আমি এসব শিখব এরকম হব—আমার কত আশা! সে আশা পূরণ হওয়া দুরূহ ব্যাপার দেখছি এখন। সহজকে সহজ করে পাওয়া আমার ভালো লাগেনা। হয়ত বা ছোটবেলা থেকে ঘাত-প্রতিঘাতের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে মনটা ওই রকমই হয়ে গেছে। কষ্ট না পেলে যেন কিছুই হল না।

লামা যোগীদের ছবির দিকে তাকালেন। গুহার এমোড় থেকে ওমোড় অবধি দু'চোখ ঘুরে এলো। বললেন, তোমার সব আকর্ষণ গেছে, কিন্তু একটা এখনও যায়নি। এটা মন থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে না গেলে, শেখালে—নিশ্চিত জীবন নিয়ে টানাটানি।

আমার ভেতরে বিরক্তির চাপা আক্রোশ ফুলে ফুলে উঠছে। বললুম, আপনারাই তো বলেন—মৃত্যু বলে কিছু নেই। আত্মা অমর। আত্মা আসে যায়। তবে এত মরণের ভয় দেখাচ্ছেন কেন? ওসব ভয়টয় নেই আমার। আপনি শেখাবেন না, সেইটাই বলুন।

আচমকা রেগে উঠলেন লামা। আমি দেখিনি কোনদিন, ভাবিও নি। প্রচণ্ড রাগ! এ মানুষের এমন হওয়াও কি সম্ভব! আমি স্তম্ভিত।

লামার মুখচোখ লাল। বজ্রগম্ভীর স্বর। ধমক দিয়ে বললেন, তুমি কি আমার কাছে শিখতে এসেছ, না আমি তোমার কাছে শিখতে এসেছি? আমি যেটা ভালো বুঝব তাই করব। থাকতে হয় থাকো, চলে যেতে হয় চলে যাও। নয় অন্য লামা ঠিক কর।

পাহাড় থেকে খসে পড়া চুড়োর মতো তুঙ্গে ওঠা আমার আদরের চুড়ো মাটিতে পড়ে ভেঙে খান খান। ভেঙে খান খান হলেও, লামার ওপর এতটুকু রাগ অভিমান ক্ষোভ—কোন কিছুই হল না। নিজের

কাছে নিজেকে কেমন আশ্চর্য ঠেকছে। জিদ—প্রবল জিদ আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। আমি যাব না। দেখি, লামা কি করে তাড়ায়, কেমন করে তাড়ায়!

লামার সর্বশরীর কাঁপছে। রাগে নয়, রাগ কখন জল হয়ে গেছে। হাসির ধমকে। মুখ টিপে কি হাসি! হাসতে হাসতেই বললেন, চলে যেতে বলেছি কি তোমাকে! তোমার ভেতরের দ্বিধা-সংশয় অবিশ্বাসকে।

আমি প্রণাম করলুম—এইভাবে পিটিয়ে পিটিয়ে আমার ভেতরটাকে তৈরী করে নিন।

আমার তীর্থনাথের—গুরুদেবের ঋক স্তোত্রগান মনে পড়ছে। আমি নিশ্বাসে নিশ্বাসে উচ্চারণ করছি। ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শ্রীনুয়াম দেবা···। দেবতা, আশীর্বাদ কর তোমরা, যেন সদাসর্বদা আমার কান মঙ্গল কথাই শুনতে পায়। চোখ মঙ্গলবস্তুই দেখতে পায়। ভুলেও যেন কারো কোন কথার মধ্যে অকল্যাণকে খুঁজে না পাই। কারো কোন দেখার মধ্যে অহিত-অসুন্দরকে উঁকি মারতে না দেখি।

কোথাও কিছু নেই, ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে আমাকে নিয়ে বেড়ানোর শখ হল শ্রীঅর লামার। চমরীর চামড়া আঁটা কাঠের ফ্রেমে—'কা' —নৌকো। নৌকোয় বসে আছি আমি আর লামা, স্রোতে চলেছি। যে তীরে এসে ভিড়ল, সেখানে একটি সুন্দর বিহার দেখা যাচ্ছে। সম্-য়ে-মঠ।

শান্তরক্ষিতের ইচ্ছেয় সম্রাট ঠি-সোঙ-দে-চন্ তৈরী করে দেন। চারদিকে পাঁচ-ছ'হাত উঁচু দেওয়াল ঘেরা। চারকোণে চারটে দরজা।

আমরা পুবকোণ দিয়ে প্রবেশ করলুম। চারকোণে চারটে ইঁটের স্তূপ। মধ্যিখানে কাঠের তৈরী তিনতলা প্রধান বিহার। সাতশো একাত্তরে শুরু হয়ে তেষট্টি খ্রীষ্টাব্দ অবধি—বারো বছর ধরে তৈরী হয়েছে। আগুনে পুড়ে গেছল একবার, সেটা একাদশ শতাব্দীর আগে। আবার নতুন করে তৈরী হয়েছে।

নীচে বিহারের ভেতর সুন্দর বুদ্ধমূর্তি' বাইরে শান্তরক্ষিতের একপাশে সম্রাট, আর একপাশে তাঁর শিষ্যের। দোতলায় উঠে দেখলুম, অমিতায়ুর মূর্তি। দোতলায় একতলায় প্রদীপ জ্বলছে। বুদ্ধমূর্তির সামনে কাঁচের বাক্সে ঢাকা বিরাট কঙ্কাল—শান্তরক্ষিতের।

লামা আমাকে ভারত-গৌরবের ইতিহাসের অমৃতবাণী শোনাচ্ছেন। আমি ওই বিশাল কঙ্কাল দেখছি আর শুনছি।

…নালন্দার আচার্য শান্তরক্ষিতকে তিব্বতে নিয়ে আসেন তিব্বতের সম্রাট। তিনি দেশে ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর আদেশে রাজা রাজ্যশাসন করতেন। শতবর্ষ পূর্ণ করে তিনি দেহত্যাগ করেন। সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দার আচার্য শান্তরক্ষিতের সময় থেকে শুরু করে একাদশ শতাব্দীর বিক্রমশিলার আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সময় পর্যন্ত, ভারতের শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য সবেরই প্রভাব পড়েছিল তিব্বতের ওপর। আজও তাঁদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছে তিব্বতীরা, তাঁদের স্মৃতিকে বুকে ধরে।

আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন লামা। আমি চমকে উঠলুম। তারপরেই লজ্জায় মাথা হেঁট! বললুম, কম ঝগড়াটে নন তো আপনি। আপনি যোগী আপনি সন্ন্যাসী আপনি মহৎ—কথার ভরও সয়না একটু। মনে মনে ভেবেছিলুম, অন্যদেশের লোক বলে গোপন কিছু শেখাতে চান না। সেটা পরিষ্কার করে দিলেন এখানে নিয়ে এসে।

এবার লামার মুখে অল্প হাসি। আমি খিল খিল করে হেসে উঠলুম বাচ্চা মেয়ের মতো।

লামা বললেন, এঁরা দুজনেই রাজবংশের ছেলে। মগধের 'সহোরে' মাণ্ডলিক রাজবংশেরই দুই হীরেমাণিক—শান্তরক্ষিত আর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। আমার বুকের মধ্যে আনচান করছে। বাবাকে মনে পড়ছে। আত্মানন্দের টিহরী গাড়োয়ালের আশ্রমেই, বাবার শরীর ত্যাগের খবর পেয়েছি আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে। তখন সৌরভের বছর দুয়েক। আশ্রম থেকে চিঠি এসেছে—বাবাকে দেখার আপসোস যেন আমি না করি। কোন রোগজ্বালা হয়নি। রাত্রির শেষ প্রহরে যেমন নিয়ম করে ওঠে, জপধ্যানে বসে, মৃত্যুর দিনেও তাই করেছে বাবা। পরে দেখেছে সকলে প্রাণহানি নিস্পন্দ দেহ।

শান্তরক্ষিতের কঙ্কাল দেখে আমার মনে হচ্ছে, বাবার কঙ্কালকেও যদি এইভাবে রাখা হ'ত! তবু গিয়ে আমি দেখতুম স্পর্শ করতুম। আমি ধন্য হতুম। এক সময় তাঁর প্রাণ তাঁর সাধনা ওই কঙ্কালকে জড়িয়েই না কত বছর কাটিয়েছে! সে পবিত্র স্মৃতি তো আর নেই, আর কখনও পাওয়াও যাবেনা। চোখের জল রুখতে পারিনি আমি চেষ্টা করেও।

মনে ভয়, লামা বুঝি এখুনি না ক্ষেপে ওঠে আবার। এখনও সাধারণ লোকের মতো মোহ তোমার! কি ছাই সাধনা শিখবে তাহলে! মনকে ঠিক কর আগে। আমারই মনের কথার হুবহু প্রতিধ্বনি শুনলুম আমি লামার মুখেও।

বিহার থেকে বেরিয়ে আসছি আমরা। অতীশ দীপঙ্করের কথা শোনাচ্ছেন লামা আমায়।······রাজা কল্যাণশ্রী আর রানী প্রভাবতী-দেবীর দ্বিতীয় পুত্র দীপঙ্কর। একষট্টি বছর বয়েসে লাসায় আসেন। তারপর তেরো বছরে অনেক কিছু করে গেছেন। তন্ত্রের অনেক কিছু লিখে গেছেন।

সেঁ্য-থঙ বিহারের তারামন্দিরে তিয়াত্তর বছর বয়েসে তিনি দেহ রাখেন। তাঁরই প্রিয় শিষ্য—শেষ নিশ্বাস ত্যাগের সময় যিনি শিয়রে বসেছিলেন, সেই ডোমতোন-পার প্রচার করা তান্ত্রিকধর্মই আমরা অনুসরণ করে চলেছি।

তারামন্দিরে একুশ রকমের তারামূর্তি রয়েছে এখনও। পুজো

করেছেন দীপঙ্কর, পুজো করেছেন ডোমতোন-পা। মন্দিরের সামনে আটশো-ন'শো বছরের লাল চন্দন কাঠের তৈরী পুরনো বড় বড় থাম, মন্দিরের পেছনে তিনটি পেতলের স্তূপ। একটিতে দীপঙ্করের ভিক্ষাপাত্র একটিতে সিদ্ধ কারোপার হৃৎপিণ্ড অপরটিতে প্রিয় শিষ্য ডোমতোন-পা'র চীবর—সন্ন্যাসীর ছেঁড়া কাপড়।

লামার বলার ধরণ এমন, কল্পনায় চোখে অতীত স্মৃতি দেখছি আমি। একটা টিলা পেরিয়ে তারামন্দির। দেখছি পেতলের স্তূপ, মন হু হু করে উঠছে আবার। আবার বাবা এসে দাঁড়াচ্ছে চোখের সামনে, এবারে চোখ উপছে জল ঝরেনি। নিজেকে অতিকষ্টে সংযত রাখতে চেষ্টা করেছি, মনকে ঘোরাতে চেষ্টা করেছি।

লামা আমায় সযত্নে শিখিয়েছেন দূরদর্শন দূরশ্রবণ দূরগমনের ধ্যান। উনি আমায় সাবধান করে দিলেন প্রথমে—এ ধ্যান কিন্তু সকলের জন্যে নয়। যারা ছোটবেলা থেকে অনেক কিছু ছাখে কল্পনায়, ভবিষ্যতে মিলেও যায় সত্যি হয়ে সেই দেখা, স্রেফ সেই আধারেই এ ধ্যান ফলবতী হয়ে ওঠে। আমি জানি, তুমি সেই আধার। তাই তোমাকে এই ধ্যান দেবার প্রতিজ্ঞা করেছি মনে-প্রাণে। আর তাছাড়া এ ধ্যান তোমার পক্ষে উপস্থিত বিশেষ প্রয়োজন। যে আসবে তাকে দেখতে হবে এখান থেকেই। তারপর ধ্যানেও যেতে হবে তার কাছে। রক্তমাংসের শরীরেও যেতে হবে।

গুম্ফার ভেতরে দু'খানা কম্বলের আসন বিছানো। ঠিক মুখোমুখি নয়, কোণাকুণি। উত্তরের কোণে লামার, দক্ষিণের কোণে আমার এমনভাবে, যেন দু'জনকে দেখাদেখির ব্যাপারে কোন অসুবিধে না হয়।

প্রথমে লামা আমার দুটি ভুরুর মাঝখানে—কপালে তাকালেন একদৃষ্টে। আমার মনে হচ্ছে, ওই দৃষ্টি থেকে একটা আলোর রেখা আমার মাথার মধ্যে প্রবেশ করে পদ্মের পাপড়ি আঁকছে। আমি চেয়ে আছি ঠিকই, কিন্তু ওই পর্যন্ত। দেখছিনা নিজেকে, দেখছিনা

লামাকে। দেখছি, দু'চোখ বুজে দেখছি শুধু নিজের মাথার মধ্যে পর পর তিনটি পদ্ম সাজানো।

লামার বাণী শুনছি।

প্রথম পদ্মের রং নীল। পদ্মের মধ্যিখান থেকে সবুজ মৃণাল ওপরে উঠেছে। মৃণালে দুলছে গেরুয়া রঙের পদ্ম। পদ্মের মাঝখান দিয়ে আর একটি সবুজ মৃণাল উঠেছে, ওপরে শুভ্র শ্বেতপদ্ম। মাঝের পদ্মটি দুলছেনা আর—তিনটিই ধীরস্থির।

মনে করতে হবে নিশ্বাসের সঙ্গে প্রবেশ করছে ভেতরে 'হং' বীজ। নীল পদ্মের ওপরে, মৃণালের ভেতর দিয়ে একটা নীল জ্যোতির বিদ্যুৎ শ্বেতপদ্মের ওপর অবধি উঠে গেল। নিশ্বাস পড়ার সঙ্গে 'সঃ' বীজ বেরিয়ে যাচ্ছে। শ্বেতপদ্মের ওপর থেকে নীল জ্যোতির বিদ্যুৎরেখা মৃণালের ভেতর দিয়ে নেমে এলো নীচে, নীলপদ্মে।

এইভাবে 'হং-সঃ' নিশ্বাসে ভেতরে প্রবেশ আর বেরিয়ে যাওয়া। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি পদ্মের মৃণালের মধ্যে দিয়ে নীল জ্যোতির বিদ্যুৎ রেখারও ওঠানামা চলবে কিছুক্ষণ। তারপর শ্বেতপদ্মের ওপর নীল জ্যোতির বিদ্যুৎরেখায় লেখা ফুটে উঠবে 'হং-সঃ'।

'হং-সঃ' মিলিয়ে গিয়ে এজায়গায় উদয় হল নীল জ্যোতির বিদ্যুৎ-বিন্দু। বিদ্যুৎ-বিন্দু থেকে ছড়িয়ে পড়ছে ছটা। ছড়িয়ে পড়ছে ওপরে আরো ওপরে, মাথার বাইরে। এই ছটা থেকে বেরিয়ে আসছে সোনালী আলোর ঢেউ। বেরিয়ে আসছে নীল আলোর পদ্মপত্র, বেরিয়ে এলে আলোর তুমি—স্নিগ্ধ-সাদা আলোর। সোনালী ঢেউ এগিয়ে যাচ্ছে দিক থেকে দিগন্তে। সেই ঢেউয়ে পদ্মপত্রের ওপরের তুমি এগিয়ে চলেছ দূরে দূরে···আরো দূরে।

ঢেউয়ের ছন্দে ছন্দে বীণার ঝংকার উঠছে বেজে 'ক্ষং' 'ক্ষং' 'ক্ষং'···।

আবার ফিরে আসছ তুমি। ফিরে এলে আগের জায়গায়—যেখান থেকে বেরিয়ে ছিলে। ফিরে এলো নীল পদ্মপত্র, ফিরে এলো সোনালী ঢেউ। আবার আগের মতন ঢেউ পদ্মপত্র, তুমি বেরিয়ে আসছ। আবার প্রবেশ করছ।

নিস্তব্ধ-নিঝুম রাতে শেষ প্রহরের আগে ধ্যান করবে, যতক্ষণ পারো। তোমার যাওয়া-আসার অভ্যেস করতে করতে, চলার পথে অনেক কিছুই দেখতে পাবে ধীরে ধীরে। অনেক কথা শুনতে পাবে।

এধ্যান আমার খুব মনোমত। ধ্যান—ধ্যান-ই মনে হল না। উনি বসে থেকে পরপর তিনবার বলে বলে করালেন। তারপর নিজে নিজেই করতে বললেন। আমি করেছি, নিখুঁত ভাবেই করেছি। শরীরে থেকেও শরীর থেকে বেরিয়ে গেছি, আলোর ঢেউয়ে একটা যোগসূত্র রেখে। আবার সেই যোগসূত্র ধরে ফিরেও এসেছি সহজে। আগে অনেক ধ্যানধারণা প্রাণায়াম করেছি, কিন্তু এতখানি খুশী হইনি। পরিতৃপ্তি এসেছে আমার। না চাইতেই সব কিছু পাওয়া হয়ে গেছে বুঝি।

লামার দিকে তাকিয়ে দেখি, লামা হাসতে গিয়েও হাসতে পারলেন না।

একটু বিমর্ষ হয়ে গেল মুখ। মাথায় হাত দিয়ে বললেন, তোমার সাধ পূর্ণ হবে। সবচেয়ে আর একটা বড় আঘাত আসবে জীবনে। তুমি প্রস্তুত হয়ে এগোবে, তারপর তোমার মুক্তি। ছড়িয়ে পড়বে তুমি সকলের মাঝখানে।

আমি বুঝিনি তখন আমার মুক্তি আসছে কোন্ আঘাতের হাত ধরা ধরি করে।

রাতের পর রাত অভ্যেস করেছি আমি। কোন ফাঁকফাঁকি ছিল কিনা জানিনা। লামা এসে আমাকে প্রায়ই ভর্ৎসনা করেছেন, নিজেকে ঠিক রাখতে চেষ্টা কর। এত চঞ্চল হচ্ছ কেন?

আমি অবাক হয়ে গেছি কথা শুনে। বলেছি, চঞ্চল হলে অন্তত কিছুটা অস্বস্তি ভোগ করব তো! তা আমার হয় কই! আপনি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছেন।

লামা স্নেহেতে বিষ্ণুমূর্তি, শাসনে মহারুদ্র। রুদ্রমূর্তি ধরে বললেন, প্রতিটি অঙ্গ যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে, মন যখন মিশে থাকে

তাতে, তখন কেমন করে মানুষ বুঝবে সে চঞ্চল হচ্ছে কেন? সে তো নিজেকে হারিয়ে ফেলে তখন। জ্ঞানের কথা কানেতে প্রবেশই করেনা। বধিরের অবস্থা। যে পথে তোমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, সে পথ আলোর পথ, মনস্থিরের পথ। সেই নিশানায় পৌঁছুনোর জন্যে কোথায় তোমার আকুল কান্না! কোনদিন দেখিনি। নিজেকে জানার সাধনা থেকে তুমি সরে যাচ্ছ। এ রাস্তায় যেটা মস্ত অপরাধ, ক্ষমার অযোগ্য।

আমি ভেবে কোন কুলকিনারা পাইনি। ভেতরে অনুভূতির সূক্ষ্ম তার কেঁপে উঠল, ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। কানে বাজছে বেসুরো সুর।—আমি সরে যাচ্ছি··আমি ক্ষমার অযোগ্য।

লামা চলে গেছেন, বাদবিসম্বাদ করতে আমার ইচ্ছে হয়নি। বড় মনমরা হয়ে পড়েছি। ভেতরে একটা বিষাক্ত সাপ নিজের বিষের যন্ত্রণায় বিষ ঢালার জন্যে মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, না নিজেকে সচেতন করে তোলার জন্যে সীমাহীন প্রেরণা? বুঝিনা। মনে মনেই বললুম, এবার এলে লামাকে আমিও ছাড়ছিনা। উপযুক্ত গুরু, উপযুক্ত শিক্ষকের উচিত কি? খালি শাসন! স্নেহের পরশ দিয়ে দোষত্রুটি দেখিয়ে সংশোধন করে দেওয়াটা কি কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না? ওই অবধি। কোনদিন একথা মুখ ফুটে বলতে পারিনি। আমি নিজে যেন অন্য আমি হয়ে যাচ্ছি, বেশ বুঝতে পারছি। আমার দম্ভ আমার তেজ কোথায়—আগেকার মতো? লামাকে দেখে বলতে ভুলে গেছি। সমস্ত জল্পনা-কল্পনা করাই আমার সার হয়েছে।

দূরদর্শন দূরগমন দূরশ্রবণ-সাধনা আমি নাকি ঠিকমতো করতে পারছিনা কিছুতেই। নিত্য লামার বকাবকি। মাস ছয়েক সাধনার পরেও লামার ধ্যানেজ্ঞানে আমি অসহ্য হয়ে উঠলুম।

অসহ্যের প্রকাশ চরমে পৌঁছুল একদিন।

আমি ধ্যান করছি, লামা নিজে এসে হাজির। এত তন্ময়তা এসে গেছল, ওঁর উপস্থিতি আমি বুঝতে পারিনি। ঠাস করে গালের

ওপর পড়েছে ওঁর ওই মোটা আঙুল আর মোটা তালুর চড়। চমকে উঠেছি। বুকের ভেতর দম আটকানো যন্ত্রণা। চোখে অন্ধকার দেখছি। কয়েক মুহূর্ত। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলেছি, যে নিজে অকারণে রেগে ওঠে, ক্রোধ সামলাতে পারেনা, নিজের শাসনে যে নিজের মনকে আনতে পারেনা—সে অপরকে কি শেখাবে ? সে অনুপযুক্ত লোক।

রাগে আমার সর্বশরীর ফুলছে। সাধুর বেশে এরা দানাদত্যি! লামা ক্রমশ বেড়েই চলেছেন। এর পরের পরিণতি হয়ত আমার অপঘাত-মৃত্যু—এঁর হাতে। লামা আমাকে বললেন, অনেকখানি এগিয়ে গেছ তুমি। কেন সামান্যর জন্যে একটা মহাবিপদকে ডেকে আনছ ? তুমি কি করছ, তুমি নিজেও জাননা। যে আঘাত আজ পেলে তুমি আমার কাছে, যদি সে বিপদ কাটে এতে তাহলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশী হতুম। তা বুঝি হবার নয়।

আমার স্বর তীব্র-তীক্ষ্ণ। বললুম, এরকম করে আমাকে অন্ধকারে রাখছেন কেন ? এ অধিকার কে দিল আপনাকে ? আপনার দেবতারা না আমি ? 'কি করছি আমি জানি না'—খুলে বলার সাহস নেই আপনার ?

শান্ত গলায় বললেন লামা, আগে থেকে অনেক সময় অনেক ব্যাপার খুলে বলা উচিত নয়। তবু বলছি—আলোয় ভেসে তুমি, তোমার মন যেখানে যায়, যার কাছে যায় তুমি ভালো রকমই জানো। সে অস্থির হয়ে পড়ছে, পাগলের মতো হয়ে পড়ছে তোমায় দেখে। প্রতিরাতে প্রথমে স্বপ্ন, তারপর তন্দ্রার ঘোরে তোমায় দেখে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এটা তোমার ভালো কাজ হচ্ছেনা।

আমি চুপ করে রইলুম। সত্যি আমি যাই যার কাছে, দেখেছি তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, সে পাগলের মতো হয়ে উঠছে। কি করব, সে ছাড়া যে কারো কাছে আমার যেতে ইচ্ছে করে না। আমি বুঝতে পেরেছি আমার অন্যায়। অপরাধী মুখ করে বিনয়ের

স্বরে বলেছি, ওর কাছ থেকে মন ঘোরাতে পারছি না প্রভু! আপনি-ই ঘুরিয়ে দিন, আপনি একটু সাহায্য করুন।

এভাবে সাহায্য করবেন জানলে কে সাহায্য চাইত! নিজে খানা খুঁড়লুম, নিজে পড়বার জন্যে!

লামা বলেছেন, সোনালী আলোর ঢেউ বেশিদূর পাঠিও না, আমার গুহা তো কাছাকাছি, আমার গুহা অবধি পাঠাবে। আর তাছাড়া, আমিও তোমার ধ্যানের সময় তোমার কাছে আসব। উপস্থিত তোমার মনটাকে এভাবে তৈরী করে নাও। তারপর দূর-গমনের ধ্যানটা শুরু করবে আবার।

ওঁর কথা মতো ধ্যানেতে আমি ওঁর গুহায় গেছি প্রতি রাতে। আবার ফিরে এসেছি নিজের গুহায়। প্রতি রাতের এই সূক্ষ্ম চিন্তাধারায় আমি যখন বিভোর, তখন ধ্যানে সবার আগেই লামা এসে হাজির হয়েছেন আমার গুহায়। আমি অবাক হয়ে গেছি, কিছুটা বিরক্তও। উনি এত ঘন ঘন আসবেন কেন? রক্ত-মাংসের শরীরের লামা যখন এসেছেন, তখন আমি নিষেধ করেছি। এভাবে আপনি রোজ আসবেন না। আমার ধ্যানে আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন—নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন। পরীক্ষায়ও আমি উত্তীর্ণ হয়েছি। আপনার গুহায় কখন কিভাবে শুয়ে আছেন, কিভাবে বসে আছেন, কি করছেন সবই তো পরদিন বলার সঙ্গে সঙ্গে সত্যি প্রমাণ হয়ে গেছে। সে প্রমাণ আপনিও মেনে নিয়েছেন।

লামা ঘাড় নেড়ে বলেছেন, এখনও বাকি। আমার আসা-যাওয়াটা আমার ওপরই ছেড়ে দেওয়া ভালো। নিজের হাতে নিতে যেও না।

আমি উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছি। গুহা ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করেছে। এটা কি! উচুস্তরে উঠলে এরকমই ঘটে নাকি সাধু-সন্ন্যাসীর! লামার কি এটা মোহ আমার ওপরে! বারণ শুনছেন না। ধ্যান করতে বসলেই, লামা আসবেন। আর আমার ধ্যানমগ্ন চোখে সমস্ত জায়গা জুড়ে বিরাজ করবেন উনি। এ কেমন কথা। আমার দূরে

যাওয়ার সব পথই যে বন্ধ করে দিচ্ছেন উনি। এত আগলানো কেন? নিজের ইষ্টদেবতার ধ্যান ছেড়ে আমার ধ্যানে মগ্ন থাকবে এমন একটি শক্তিশালী মানুষ, এটা আমি চাইনি।

শোনা যায় শঙ্করাচার্যের একসময় এমন অবস্থা হয়েছিল যে, রানীকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসা অসাধ্য হয়ে উঠেছিল তাঁর। রানী মোহবিস্তার করে করে রাজার দেহে আটকে রাখতে চেয়েছিলেন তাঁকে। আমার নিজের অগোচরে হয়ত বা রানীর ভূমিকায় নেমে পড়েছি আমি। আমার অজান্তেই লামাকে আমি আটকে রেখেছি। নাহলে সাধনায় সিদ্ধপুরুষ একজন, তাঁর চোখে আমায় এত ধরে রাখার প্রাণপণ প্রয়াস কেন? আমার উচিত তাঁকে মুক্তি দেওয়া। আমি স্থির করলুম, সত্যি সত্যি এবার পালাব। লামার চোখকে-মনকে বড় ভয়, তবু সুযোগ খুঁজছি।

লামা এসে বললেন, তুমি সুযোগ চাইছ? খুব শীগগির-ই পাবে। তার আগে একটা পরীক্ষা তোমায় দিতে হবে। যদি উত্তীর্ণ হতে পার তাহলে তখুনি চলে যেতে পারবে। নাহলে নিজে নিজে আর কিছুদিন অভ্যেস করবে। ভয় নেই, ধ্যানেতে আমি আর আসছি না। আমার পতনের আশঙ্কা করে তোমার লক্ষ্য থেকে তুমি একচুলও নড়বে না।

লামা বলেছেন, তোমার স্বামী নকল যক্ষিণী সাজাত তোমায়। এবার যক্ষিণী-সাধনার আসল তত্ত্বটা তুমি জেনে নাও। মানুষ নিজে তৈরী হলে কারো সাধ্যি নেই যে তার মোহে আটকে পড়ে। কামনা পাগল মানুষ মেয়েদের স্ত্রীভাবেই চেয়ে বসে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। আকুল ডাকে ডেকে-ডেকে মাকে বসাতে হবে সাধিকার অন্তরের আসনে। তবেই সাধিকাকে দেখে ভার্যার বদলে মাতৃভাব জেগে উঠবে উপাসকের মনে। মহামায়ার কৃপায় কামনার মোহমেঘ কেটে যায় নিমেষে। সাধিকা প্রকৃত হয়ে ওঠে মহামায়ার অংশ, মহামায়া যক্ষিণী-মনোহারিণী।

একটু থেমে আবার উনি বললেন, লাসায় নিয়ে গেছি তোমাকে

সঙ্গে করে। দেখে এসেছ পোতলা প্রসাদ। সোনা-রূপোর স্তূপের ভেতর লামাদের স্মৃতি—হীরে জহরত মণিমুক্তো, কত কি! আশ-পাশে দেখেছ আখরোট কাঠে কি সুন্দর কারুকার্যে ভরা ছবি খোদাই করা। রূপোর-সোনার প্রদীপ জ্বলছে দিনরাত। আর যে সব দেখেছ, নিশ্চয় তোমার মনে আছে।

মনের চোখে দেখছি আমি জো-খঙ মঠ। তেরশ বছরের পুরনো হলেও যৌবনের জৌলুস এতটুকু ম্লান হয় নি। লামা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে দোতলায় উঠেছেন। তিব্বতের ইতিহাসের বিখ্যাত সম্রাট স্রোঙ্-বর্চন্-স্গম্-বো'র মূর্তি আছে এখানে। সঙ্গে চীনা আর নেপালী স্ত্রীর দু'টি মূর্তি। চীন রাজকন্যা আর চন্দনকাঠের বুদ্ধমূর্তি একই সঙ্গে নিয়ে আসেন সম্রাট। চন্দনকাঠের সুন্দর সুঠাম মূর্তি একসময় ছিল ভারতেরই, ভারত থেকে চীনে গেছল একসময়। আঙিনার ভেতর ছোটবড় মন্দিরের ইতিহাস লেখা রয়েছে উত্তর দিকের দেওয়ালে। মন্দিরের দেওয়ালে সোনার জলে আঁকা বুদ্ধের অতীত জীবন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কোন দেওয়ালে ভারতসম্রাট অশোক, কোন দেওয়ালে তিব্বতসম্রাট স্রোঙ্-বর্চন্-স্গম্-বো'র ছবি রয়েছে! ছবির মানুষের চোখ জ্বল জ্বল করছে, কাছে ডাকছে। বোবা অতীত স্মৃতির অতীত কথা কয়ে উঠছে। বলছে ধর্মের কথা। বলছে জীবনের কথা, সমাজের কথা। দেশে দেশে প্রেম-ভ্রাতৃত্বের কথা।

আমি লামাকে জানালুম, লাসার ছবি পরিষ্কার মনে আছে।

উনি বললেন, আর দিন পনেরো বাদে নববর্ষ উৎসব। ধ্যানের মধ্যে দিয়ে তোমাকে যেতে হবে লাসায়। তুমি দেখনি কোনদিন। কি দেখতে পেলে, এসে আমাকে জানাবে।

পুলকে আমার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জেগে উঠেছে। এবারে আমার মুক্তি। সাধনার সিদ্ধির নিশ্চয় স্বীকৃতি পাব লামার কাছ থেকে—আমার দৃঢ় বিশ্বাস। লামা যে পরীক্ষা চেয়েছেন, অভ্যেসের গুণে আমার কাছে খুবই সহজ।

নববর্ষের দিনে ধ্যানের মধ্যে দিয়ে সোনার আলোর ঢেউয়ে নীল

আলোর পদ্মপাতার ওপর দাঁড়িয়ে দুলতে দুলতে আমি ভেসে চলে গেছি লাসায়। কতটুকুই বা সময়! কয়েক পল বই তো নয়। দেখেছি রাস্তার সাজসজ্জা—যেন দেয়ালীর রাত্তির। আলোয় আলো। প্রদীপের মালা পড়ে আছে বাড়িঘর রাস্তা মঠ। রাস্তায় নতুন তৈরী কাঠের থামের ওপর মাখনের দেবদেবী দেখে মনে হচ্ছে পাথরে নিখুঁত খোদাই মূর্তি।

রাস্তাঘাটে লাল হলদে বসনে গা ঢাকা হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিহারে প্রার্থনা করতে চলেছেন। বিহারের ঘণ্টাধ্বনি শুনছি। বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে মঠ-বিহারের মন্ত্র-প্রার্থনার পবিত্র গম্ভীর স্বর। শিশু যুবা বৃদ্ধ—সকলের মুখে হাসির ছোঁয়া।

হাসি আর হাসি। হাসির হিল্লোলের নহর বয়ে চলেছে চতুর্দিকে।

মাঠের মধ্যে প্রবেশ করলুম আমার সূক্ষ্ম আমি।

তরজার মতো তর্কযুদ্ধ চলেছে। লামা-বিচারকেরা পর পর সাজানো চেয়ারে সভার মধ্যিখানে বসে আছেন স্থির চিত্ত হয়ে। তর্ক শুনছেন ওঁরা। ছাত্ররা ধর্মের শ্লোক নিয়ে যে যার মত প্রকাশ করছে। প্রথম পক্ষেরা তাদের মত প্রকাশ করে হাততালি দিয়ে এগোল পেছুল। হাতের জপের মালা নিয়ে ধনুকের মুদ্রা প্রদর্শন করে যে যার আসন গ্রহণ করল। বিপক্ষ এতক্ষণ শান্তমুখে চুপচাপ বসেছিল।

এবার উঠে দাঁড়াল।

তারা আগের পক্ষের মত খণ্ডন করছে। এদেরও মত প্রকাশের শেষে ওই একই ভঙ্গি, একই মুদ্রা—প্রতিপক্ষের মতো।

ওখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমেছি আমি আবার। প্রত্যেক বাড়ির রঙ ফিরেছে—তুষারশুভ্র। দরজার সামনে সাদারঙের চৌকোণা নক্সা আঁকা। জানলায় জানলায় ফুলের টব। যেন শূন্যে নন্দনকানন।

বেশ খানিকটা যাবার পর বাবলা গাছের তলায় এসে দেখি, আশপাশে ছোটবড় সামিয়ানা টাঙানো। ডানদিকে ছোট ছোট তাঁবুতে ধনী-সম্ভ্রান্তঘরের স্ত্রীপুরুষ বসে। চারকোণা সামিয়ানার নীচে মঞ্চ। পুবদিকে অন্য অতিথিদের বসার জন্যে ফরাস পাতা।

রোশন চৌকি বাজছে। বড় বীণ আর একটা লম্বা কাঠের ওপর ডমরু বাজছে।

জাতকের কাহিনীর অভিনয় হচ্ছে। ছেলেরাই মেয়ে সেজেছে। নাচে-গানে গদ্যে-পদ্যে মুখর হয়ে উঠেছে জায়গাটা। দর্শকদের কি উল্লাস! রূপোর পেয়ালায় যবের ছঙ—মদ ঢালছে আর গিলছে। চোখের কোণ লাল। বাঁশের চোঙে কেউ কেউ ভুট্টার ছাতু গরম জলে মিশিয়ে ঠোঁট দিয়ে হুস হুস করে টানছে। ছোট ছোট বাচ্চার কেউ কেউ 'চুকটু'র—কম্বলের থলির ভেতর থেকে মুখ বার করে উঁকি মেরে দেখছে। কেউ মাথা গুঁজে ঘুমোচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় মেয়েদের কানের গলার মুক্তো পলা দুলে দুলে উঠছে।
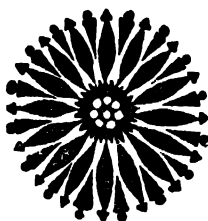
লাসার নববর্ষ উৎসব দেখে এসে লামাকে আমি সমস্ত বর্ণনা দিয়েছি এক এক করে। তবু লামা খুশি হননি। বিরক্তিতে আমার মন ভরে উঠেছে। আমি ক্লান্ত। এ লোককে বুঝি কোন কালে কেউ সন্তুষ্ট করতে পারেনি। লামা মুখ খোলার আগে আমি নিজেই বলেছি।—দোহাই, আর বকাবকি করবেন না আমাকে। আপনার চরণে আমার শত শত প্রণাম। আমি হার মানছি। আমি জানি, নিশ্চয় আপনি বলবেন, উত্তীর্ণ হতে পারিনি পরীক্ষায়। আপনাকে তো সশরীরে গিয়ে দেখে আসতে হবেনা। আপনার আর একটা সত্তা—দ্বিতীয় আপনাকে পাঠিয়ে দেখে নিন, আমি যা দেখেছি, সত্যি দেখেছি কিনা! তারপর না হয় মুখভার করে বসে থাকুন।

লামার মুখে সেই পুরনো কৌতুক আর বিদ্রূপের হাসি।—তুমি যা বলেছ, আমি তো বলিনি মিথ্যে। তবে তুমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে কেন? ওই সময় আর একটা জিনিস অত জাঁকজমক করে

রাস্তা দিয়ে চলছিল, তার ওপর তোমার লক্ষ্য পড়ল না কেন? ভালো করে ভেবে দেখ। তুমি ছিলে অন্য জায়গায়। মিছিল করে সোনার সিংহাসনে লামা আসছেন নববর্ষের উৎসবে, তোমার নজরে পড়ল না।

কথা শুনে আমি একটা ঝাঁকুনি খেলুম। মাথা নীচু করলুম। সত্যি, মিছিলের বাজনার আওয়াজ শুনেছিলুম, এইটুকু শুধু মনে আছে। তারপর আমার মন, আমার চিন্তা সব চলে গেছে অনেক দূরে—সৌরভের কাছে। পাঁচ বছরের ফেলে আসা সৌরভকে ষোল-সতের বছর বয়েসেও দেখে চেনার কোন অসুবিধে হয়নি। মুখচোখ তেমনি আছে। লামাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলুম। লামা বারণ করেছিলেন দেখতে। বলেছিলেন, ওই-ই সৌরভ। কিন্তু তুমি চিন্তায় ওর কাছে যেও না। পাঁচ বছরের মাকে নতুন করে মনে পড়বে ওর। তোমার আকর্ষণ এত প্রভাব বিস্তার করবে ওর মনে—ও নিজের অজান্তেই বেরিয়ে পড়বে পথে। কি খুঁজছে, কেন খুঁজছে, কিছু না বুঝেই। এ ক্ষতি তুমি ওর কোরো না।

লামা যে অন্যায় কিছু বলেননি, তা আমি বুঝেছি। বুঝেও কথা রাখতে পারিনি। আমার মন ধ্যানে বসলে, ফাঁক খুঁজে নিজের অগোচরেই সৌরভের কাছে গিয়ে ধন্না দিয়েছে। সময় সময় ভেবেছি, ছেলের চিন্তা করা, ছেলেকে মনে রাখা, এটা কি মায়ের অন্যায়? সব ধর্মেই তো দেখা যায় মাতৃস্নেহ শ্রেষ্ঠ। আমার বেলায় যত অপরাধ!

এই যুক্তিতেই মাঝে মাঝে লামার ওপর বিরক্তি এসেছে ক্ষোভ এসেছে, ভালোও লাগেনি ওঁকে। এঁরা বলেন, মানুষের মধ্যে ঈশ্বর, বিশ্বমাতার শক্তি। মানুষকে ভালোবাসাই ঈশ্বরকে জগজ্জননীকে ভালোবাসা, পুজো করা। এ ভালোবাসা এ পুজো উত্তম সাধনা। আমার ছেলে সৌরভের আত্মা কি ঈশ্বরের আত্মা নয়? ও কি সৃষ্টি-ছাড়া। পষ্টাপষ্টি বলে দেবো লামাকে।

মাথা উঁচু করে বলেছি আমি, হ্যাঁ, সৌরভের কাছে গেছে আমার মন। তাতে হয়েছেটা কি? আমি আগে আপনার কথা শুনে

ফেরাতে চেষ্টা করেছিলুম, ভুল করেছিলুম। মা ছেলের কাছে যাবেনা, ছেলে মায়ের কাছে আসবেনা, এ আমি বরদাস্ত করতে পারব না।

কোনদিন লামাকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে দেখিনি। তিব্বতে দীর্ঘদিন থাকার পর এই প্রথম দেখলুম, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। মুখ বিষণ্ণ। মুখে হাসি টেনে আনার চেষ্টা করে বললেন, তুমি যাবার জন্যে তৈরী হও। তোমাকে আর আটকানো ঠিক হবে না আমার।

লামার কথা কানে অদ্ভুত ঠেকল। আশা করিনি, উনি এত শীগগির আমাকে ছেড়ে দিতে রাজী হবেন। যা ভাবনায় ছিলনা, তাই বাস্তবে ফলল। কিন্তু কোথায় আমার আনন্দ হবার কথা, হলনা। অবসাদ পেয়ে বসছে। যেতে ইচ্ছে করছেনা। লামাকে বললুম, সত্যি সত্যি আপনি আমাকে বিদেয় দিচ্ছেন, না আমার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে যেতে বলছেন ?

লামার গলা খুব ক্লান্ত।—সত্যি সত্যিই বলছি। সৌরভ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এবার তুমি ধ্যান করলে বুঝতে পারবে, তোমার আর একদণ্ড দেরী করা উচিত হবে না।

অগত্যা লামার আদেশ শিরোধার্য করে আমায় তিব্বত ছাড়তে হয়েছে।

…লিপুপাশ · নির্পাণি।

নির্পাণিতে এসে সৌরভের জন্যে আমার মন খুব অস্থির হয়ে উঠেছে। কেবল মনে হয়েছে, আমি পাগল হয়ে যাব বুঝি। আমার সব কিছু শূন্য হতে বসেছে। নির্পাণিতে জল খুঁজে পাওয়া মুশকিল। গলা শুকিয়ে উঠছে। কিন্তু মনে হচ্ছে, এটা আমার গলা শুকোচ্ছেনা, সৌরভের বুক থেকে গলা শুকিয়ে কাঠ। বিচ্ছিরি, অশুভ মুহূর্ত। শরীরের সব বল হারিয়ে যাচ্ছে। সৌরভকে দেখার আগে হয়ত আমাকেই মরণের কোলে ঢলে পড়তে হবে। তা হোক, ও সুস্থ থাকুক। ও বেঁচে থাকুক।

ধ্যানের চোখে দেখছি আমি, বহুদূর থেকে আসছে সৌরভ। ওর সঙ্গে ওর বন্ধুবান্ধবেরাও হবে বা বুঝি। সাত আটটা সমবয়সী

ছেলে, সব ক'টাই প্রায় সতের আঠারোর। আমি শিউরে উঠছি। সঙ্গের ছেলেরা আর আসতে চাইছেনা, ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। ওর ধনুকভাঙা পণ—আসবেই। তারা খুব ক্লান্ত, ও-ও ক্লান্ত। তারা ফিরে যাচ্ছে, ও এগিয়ে আসছে। আমি বারণ করছি, তুমি এগিয়ে এসো না আর একা। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেনা। কেবল ওর অসহায় দৃষ্টি চারদিকে ঘুরে-ফিরে কিছু একটা খুঁজছে।

লামা বলেছেন, তোমার আকর্ষণ ওকে টেনে নিয়ে আসবে। তাই হয়েছে। আমার আকর্ষণকে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করছি, পারছিনা। তা আর হবার নয়।

আমি চলেছি। যতটা সম্ভব পা চালিয়ে চলেছি।

অনেক আশায় বুক বাঁধছি। সৌরভকে নিয়ে আমি যে সংসার করব, সে সংসার আমার সাধারণের মতো নয়। আমার পথের সংসার, মানুষ গড়ার সংসার জীবন গড়ার সংসার। সন্ন্যাসিনী মায়ের ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে নিজের জীবন নিবেদন করবে মানুষ-দেবতার মঙ্গল-উপাসনা করে।

·· মণিমহেশ···ভরমুর।

ভরমুর পেরিয়ে চলছি। দেখছি টলতে টলতে আসছে সৌরভ। উসকোখুসকো চুল। মলিন মুখ। ধপধপে রঙে নীলের আভা ফুটে উঠেছে। জিভ দিয়ে বারে বারে ঠোঁট ভেজাচ্ছে। ঠোঁট শুকিয়ে উঠছে, এবারে জিভও।

আমার চোখে ভেসে উঠল আমার আটবছরে দেখা দৃশ্য। আত্মানন্দের ওখানে—টিহিরী গাড়োয়ালে। প্রণাম করার সময় আত্মানন্দ মাথায় হাত রাখতে আমি কেমন হয়ে গেছলুম।

দেখেছিলুম, অনেক বড় হয়ে গেছি আমি। আজকের এই আমিকে দেখেছিলুম তখন। দেখেছিলুম, জলের কলসী কাঁখে নিয়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে, বাতাসে মেঘে ভেসে ভেসে চলেছি যেন।

আমি বুঝতে পারছি সৌরভের তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। ওর জলের প্রয়োজন। জল কেন, সর্বশরীরের রক্ত বুঝিবা ওর শুকিয়ে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। সারা শরীরটা নীল হয়ে উঠেছে। ঘন নীল। এত ঠাণ্ডা, এত বরফ, তবু জল নেই। একটু জল।

আমি মনে মনে ডাকছি শ্রীঅর লামাকে। আপনি আমায় আবার তিব্বতে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন। আমি ওর এ কষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। পরিষ্কার বুঝতে পারছি। এই বিপদের জন্যে অত নিষেধ করেছিলেন ওর চিন্তা করতে। আমার ভালোর জন্যেই করেছিলেন, সৌরভের ভালোর জন্যেই। ক্ষমা করুন। আমায় ক্ষমা করুন।

বাবার গুরুদেব আত্মানন্দের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি— সৌরভকে রক্ষে করুন। ওর কাছে কেউ না কেউ এসে পড়ে যেন। ওর একটু জলের বড় প্রয়োজন।

কামাখ্যার তীর্থনাথকে স্মরণ করছি, সৌরভকে বাঁচান আপনি এ বিপদ থেকে। ওকে র ক করুন, এ-যাত্রা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। নানা দেবতাদের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করছি—তোমাদের কৃপাদৃষ্টি পড়ুক ওর ওপর।

দূরে ভাঙা পাথরের ছোট্ট ঘরের দিকে হঠাৎ লক্ষ্য পড়ে গেছে আমার। শরীরের সমস্ত ক্ষমতা এক করে প্রাণপণে দৌড়ে গেছি। বসে আছে একজন শুভ্রকেশী বৃদ্ধা। জল চাইতেই জলভরা মাটির ছোট্ট কলসীটি নিয়ে যেতে ইশারা করল হাসিমুখে।

আনন্দ আর ধরে না আমার। আমি নিজের গৌরবের চুড়ো নিজের চোখেই দেখছি, আকাশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে। আমি সাধনায় সিদ্ধ। আমি যা মনে করব তাই হবে। আমি জল চেয়েছি, আশ্চর্যভাবে পেয়ে গেছি। বহুদিন বাদে সশরীরে সৌরভকে দেখতে পাচ্ছি। আর তিরিশ চল্লিশ হাত এগোতে পারলেই, ওকে নিজের

বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারব।

আমার সাধনাসিদ্ধির অহংকারের প্রসাদ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল নিমেষে। আমার বুকে আছড়ে পড়ল না সৌরভ, পড়ল ওই নির্দয় পাহাড়ি জমির বুকে। আমার পা কাঁপছে সর্বশরীর কাঁপছে, আমি এগোচ্ছি টলতে টলতে।

কাছাকাছি এসে টাল সামলাতে পারিনি। উঁচু পাথরের আড়ালে যে নির্দয় নিয়তি বসে বসে হাসছিল, চোখ খুলে আমাকে দেখতে দেয়নি, আমি জানতুম না।

ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়েছি সজোরে। মনে হয়েছে, আমার হৃৎপিণ্ড থেঁতলে পিষে মিশে গেছে মাটির সঙ্গে। জলসুদ্ধু মাটির কলসী ভেঙে খান খান। আমি শুয়ে শুয়েই নিজের দেহটাকে টেনে নিয়ে গেছি গড়ানো জলের দিকে। দু'হাতে আঁজলা করে জল ছেঁচে-ছেঁচে তুলে নিয়েছি মাটি থেকে। সেই কাদা মেশানো জল সৌরভের ঠোঁটের ভেতরে প্রবেশ করেনি। উপচে গড়িয়ে পড়েছে কষ বেয়ে। ওর শুকনো ঠাণ্ডা নীল ঠোঁটের ওপর নিজের দু'চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়েও প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারিনি।

লামার অদৃশ্য কণ্ঠস্বর কানের কাছে বেজে উঠেছে জোরে জোরে। শত শত সৌরভের মধ্যে তুমি নিজের সৌরভকে ফিরে পাবে। তুমি মা, সবার মা। তুমি সাধিকা-যক্ষিণী। তোমার হাতের অমৃত-কলসীর জলে তোমার ছেলেরা নতুন জীবন নিয়ে বেঁচে উঠবে—এই তোমার যক্ষিণী-সাধনা।

বলা শেষে একটু অস্থির হয়ে উঠল যক্ষিণী। দু'চোখের দৃষ্টি মেলে ধরল দূরে। মাটিতে নামানো জলের কলসীটা কাঁখে তুলে নিল। হেসে চলার পথে পা বাড়াল।

আমি চেয়ে আছি যক্ষিণীর—তুষারকণার চলার পথে। দূরের একটা অস্পৃষ্ট কালো বিন্দু স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আসছে যেন কে।